বাঙলা ও বাঙালী

ডঃ অতুল সুর

সাহিত্যলোক ॥ ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম মুদ্রণ ঃ
১লা বৈশাখ ১৩৫৭

প্রকাশক ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যালোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৮৭ এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ
প্রসেস সিন্ডিকেট
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই ঃ
সাহা বাইন্ডিং ওয়ার্কস
কলিকাতা-৭০০০০৯

নিবেদন

বইখানা চব্বিশটা প্রবন্ধের সমাহার। প্রবন্ধগুলি সবই বাঙলা ও বাঙালী কেন্দ্রাভিগ। কয়েকটা ছাড়া, প্রবন্ধগুলি সবই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ছাপা হয়েছিল। অন্য পত্রিকাগুলির মধ্যে আছে 'অমৃত', 'ভূমিলক্ষ্মী', 'ধনধান্যে' ও 'নহবত'। পুনর্মুদ্রণের জন্য এঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণী। কয়েকটা ছাপার ভুল নজরে পড়েছে। ২৯ পৃষ্ঠার ১৯ ছত্রে 'যোষিতানাম' হবে 'যোষিতানাম', ৩৫ পৃষ্ঠায় ২ ছত্রে 'সংখচুর' হবে 'শঙ্খচূড়' ও ৪০ পৃষ্ঠায় ১২ ছত্রে 'জাগুলী' হবে 'জাঙ্গুলী'। হয়তো আরও ভুল আছে, তবে সেগুলো নজরে পড়ে নি।

বই আকারে প্রবন্ধগুলির পুনঃ প্রকাশ সম্ভব হত না, যদি 'সাহিত্যলোক'-এর শ্রীযুত নেপালচন্দ্র ঘোষ আগ্রহী প্রকাশক হিসাবে সামনে এসে না হাজির হতেন। সেজন্য তিনি আমার ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বইখানার প্রুফ সংশোধনে আমাকে সাহায্য করেছেন। সেজন্য তিনিও আমার ধন্যবাদের পাত্র।

অতুল সুর

সূচী

বাঙলা ও বাঙালী

একশো বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, বাঙালীর ইতিহাস নেই। আজ আর সে-কথা খাটে না। নানা সুধীজনের প্রয়াসের ফলে আজ বাঙলার ও বাঙালীর এক গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছিল রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির। বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় ওই সোসাইটির পক্ষ থেকে রমাপ্রসাদ চন্দ লেখেন "গৌড়রাজমালা" ও অক্ষয়কুমার মৈত্র প্রকাশ করেন "গৌড়-লেখমালা।" তারপর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন তাঁর "বাঙলার ইতিহাস।" কিন্তু বইখানা ছিল রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, বাঙালীর জীবনচর্যার ইতিহাস নয়। তিনের দশকে বাঙলার ইতিহাসের একটা কঙ্কাল ধারাবাহিক-ভাবে উপস্থাপিত করেন বর্তমান লেখক মহাবোধি সোসাইটির মুখপত্র 'মহাবোধি'-তে। চল্লিশের দশকের গোড়াতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বের করল তাদের "হিস্ট্রি অভ্ বেঙ্গল।" এই বইটাতেই প্রথম প্রদত্ত হল বাঙালীর জীবনচর্যার বিভিন্ন বিভাগের ইতিহাস। এর দু'বছর পরে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় অসামান্য গৌরব অর্জন করলেন বাঙলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃজন তাঁর "বাঙালীর ইতিহাস—আদিপর্ব" লিখে। কিন্তু বাঙলার ইতিহাসের প্রাগৈতিহাসিক যুগটা শূন্যই থেকে গেল। ষাটের দশকে বর্তমান লেখক তাঁর "হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অভ্ বেঙ্গল" ও "প্রি-হিস্ট্রি অ্যান্ড বিগিনিংস অভ্ সিভিলিজেশন ইন বেঙ্গল" বই দুটি লিখে বাঙলার প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা ইতিহাস দেবার চেষ্টা করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি বাঙলার ইতিহাসকে টেনে আনলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময় পর্যন্ত। ওই দশকেই রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বের করলেন তাঁর "একস্-ক্যাভেসনস্ অ্যাট পাণ্ডুরাজার ঢিবি।" এর পর ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখলেন চারখণ্ডে তাঁর "বাঙলার ইতিহাস।"

এদিকে বাঙালীকে সম্যক্‌রূপে বুঝবার চেষ্টাও চলতে লাগল। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁর "ইন্ডো-আরিয়ান রেসেস্" বইয়ে বাঙালীর দৈহিক গঠনে আল্‌পীয় উপাদানের কথা বললেন। এর পনেরো বছর পরে ডঃ বিরজাশঙ্কর গুহ বাঙালীর দৈহিক গঠনে আল্‌পীয় রক্ত ছাড়া, দিনারিক রক্তের

কথাও বললেন। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও ক্ষিতিশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও এ-বিষয়ে অনুশীলন করলেন। নূতন তথ্যের ভিত্তিতে বাঙালীর প্রকৃত নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের একটা প্রয়োজন অনুভূত হল। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু মহাসভার অনুরোধে বর্তমান লেখক লিখলেন তাঁর "বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়" (জিজ্ঞাসা, পুনর্মুদ্রণ ১৯১৭ ও ১৯১৯)। অপর দিকে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে কাজ চালালেন প্রবোধচন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ।

অনেক আগেই বাঙালী সংস্কৃতির সাত-পাঁচের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় অবদান ছিল নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি রাজ্য পরিভ্রমণ করে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন অবহট্ট ভাষায় 'সন্ধ্যা'-রীতিতে রচিত লুইপাদের "চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়," সরোজ বজ্রের "দোহাকোষ," ও কাহ্নুপাদের "দোহাকোষ" ও "ডাকার্ণব", এই চারখানা বই আবিস্কার করা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আরও অনেকে অনুশীলন করলেন, যথা রামগতি ন্যায়রত্ন, দীনেশচন্দ্র সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন চক্রবর্তী, আশুতোষ ভট্টাচার্য, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, তমোনাশ দাসগুপ্ত, সজনীকান্ত দাস ও আরও অনেকে। তাঁদের সকলের অনুশীলনের ফলে, আজ আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হয়েছি বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ, ও বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে।

॥ দুই ॥

বাঙলা অতি প্রাচীন দেশ। ভূতাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়ে বাঙলাদেশ গঠিত হয়ে গিয়েছিল প্লাওসিন যুগে (প্রায় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে)। পৃথিবীতে নরাকার জীবেরও বিবর্তন ঘটে এই প্লাওসিন যুগে। এর পরের যুগকে বলা হয় প্লাইস্টোসিন যুগ। এই যুগেই মানুষের আবির্ভাব ঘটে।

যদিও প্লাইস্টোসিন যুগের মানুষের কোনও নরকঙ্কাল আমরা ভারতে পাই নি, তবুও তার আগের যুগের নরাকার জীবের কঙ্কাল আমরা এশিয়ার তিন জায়গা থেকে পেয়েছি। জায়গাগুলো হচ্ছে ভারতের উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রস্থ শিবালিক গিরিমালা, জাভা ও চীনদেশের চুংকিঙ। এই তিনটি বিন্দু সরলরেখা দ্বারা সংবদ্ধ করলে যে ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়, বাঙলাদেশ তার কেন্দ্রস্থলে পড়ে। সুতরাং এরূপ জীবসমূহ যে সে-যুগে বাঙলাদেশের ওপর দিয়েও যাতায়াত

করত, সেরূপ অনুমান করা যেতে পারে। (লেখকের "বাঙলার সামাজিক ইতিহাস," জিজ্ঞাসা, দ্রষ্টব্য)। সাম্প্রতিক কালে মেদিনীপুর জেলার রামগড় সিজুয়ায় যে মানুষের অশ্মীভূত চোয়াল পাওয়া গিয়েছে, তা বৈজ্ঞানিক মহলে যদি চূড়ান্তরূপে প্লাইস্টোসিন যুগের বলে স্বীকৃত হয়, তবে এটাই হবে এশিয়ায় প্রাপ্ত প্রাচীন প্রকৃত মানবের একমাত্র নিদর্শন।

সিজুয়ায় প্রাপ্ত চোয়ালের অনুশীলন সাপেক্ষে, বলা যেতে পারে যে, প্লাইস্টোসিন যুগের মানুষের কঙ্কাল আমরা এদেশে পাইনি। কিন্তু তা সত্বেও সেই প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষ যে বাঙলাদেশে বাস করে এসেছে, তার প্রমাণ আমরা পাই বাঙলাদেশে পাওয়া তার ব্যবহৃত আয়ুধ সমূহ থেকে। এই আয়ুধ সমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে প্লাইস্টোসিন যুগের পাথরের তৈরি হাতিয়ার, যা দিয়ে সে-যুগের মানুষ পশু শিকার করত তার মাংস আহারের জন্য। এগুলো পাওয়া গিয়েছে বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার নানা স্থান থেকে। এগুলোকে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের আয়ুধ বলা হয়। প্রত্নপলীয় যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে। তারপর সূচনা হয় নব প্রস্তর বা নবপলীয় যুগের। নবপলীয় যুগের প্রাদুর্ভাবের পর, অভ্যুদয় হয় তাম্রাশ্ম যুগের। তাম্রাশ্ম যুগেই সভ্যতার সূচনা হয়। বাঙলায় তাম্রাশ্ম যুগের ব্যাপক বিস্তৃতি ছিল মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায়। এই যুগের সভ্যতার প্রতীক হচ্ছে সিন্ধুসভ্যতা। বাঙলায় এই সভ্যতার নিদর্শন হচ্ছে পাণ্ডু রাজার ঢিবি। (পরের নিবন্ধ 'বাঙলা কি সভ্যতার জন্মভূমি ?' দ্রষ্টব্য)।

॥ তিন ॥

বাঙলার আদিম অধিবাসীরা ছিল অস্ট্রিক ভাষাভাষী গোষ্ঠীর লোক। নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের প্রাক্-দ্রাবিড় বা আদিঅস্ত্রাল বলা হয়। প্রাচীন সাহিত্যে এদের 'নিষাদ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাঙলার আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, লোধা প্রভৃতি উপজাতিসমূহ এই গোষ্ঠীর লোক। এছাড়া, হিন্দুসমাজের তথাকথিত 'অন্ত্যজ' জাতি সমূহও এই গোষ্ঠীরই বংশধর। বাঙলায় প্রথম অনুপ্রবেশ করে দ্রাবিড়রা। এরা দ্রাবিড় ভাষার লোক ছিল। বৈদিক সাহিত্যে এদের 'দস্যু' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এদের অনুসরণে আসে আর্য-ভাষাভাষী আলপীয়রা। মনে হয়, এদের একদল এশিয়া মাইনর বা বেলুচিস্তান থেকে পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে, ক্রমশঃ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়,

গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাদ ও তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌঁছায় এবং আর একদল পূর্ব উপকূল ধরে বাঙলা ও ওড়িষায় আসে। এরাই মনে হয়, বৈদিক ও বেদোত্তর সাহিত্যে বর্ণিত 'অসুর' জাতি। আরও মনে হয়, এদের সকলেরই সামাজিক সংগঠন কৌমভিত্তিক ছিল, এবং এই সকল কৌমগোষ্ঠীর নামেই এক একটা জনপদের সৃষ্টি হয়।

বৈদিক আর্যরা বাঙলাদেশের অন্ততঃ দুটি কৌমগোষ্ঠীর নামের সংগে পরিচিত ছিল। একটি হচ্ছে 'বংগ,' যাদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'বয়াংসি' বা পক্ষী জাতীয় বলা হয়েছে। মনে হয় পক্ষী বিশেষ তাদের 'টটেম' ছিল। বৈদিক সাহিত্যে দ্বিতীয় যে নামটি আমরা পাই, সেটি হচ্ছে 'পুণ্ড্র'। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাদের 'দস্যু' বলে অভিহিত করা হয়েছে। মনে হয়, তাদের বংশধররা হচ্ছে বর্তমান 'পোদ' জাতি।

বৈদিক আর্যরা বাঙলাদেশের লোকদের বিদ্বেষপূর্ণ ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। এটার কারণ—দুই বিপরীত সংস্কৃতির সংঘাত। বাঙলায় আর্যদের অনুপ্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত, তাদের মনে এই বিদ্বেষ ছিল। ('বাঙলার লৌকিক জীবন' নিবন্ধ দেখুন)।

॥ চার ॥

মহাভারতীয় যুগে আমরা বংগ, কর্বট, সুহ্ম, প্রভৃতি জনপদের নাম পাই। মহাভারতে আরও বলা হয়েছে যে অসুররাজা বলির ক্ষেত্রজ সন্তানসমূহ থেকেই অংগ, বংগ, কলিংগ, পৌন্ড্র, ও সুহ্ম জাতিসমূহ উদ্ভূত হয়েছে।

বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থ সমূহ থেকে আমরা বাঙলার দুটি রাষ্ট্রের নাম পাই। একটি হচ্ছে শিবি রাজ্য ও অপরটি হচ্ছে চেত রাজ্য। এ দুটি রাষ্ট্র বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাবের পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। বর্ধমান জেলার অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে শিবি রাজ্য গঠিত ছিল। তার রাজধানী ছিল জেতুত্তর নগরে (বর্তমান মংগলকোটের নিকটে ও টলেমী উল্লিখিত সিব্রিয়াম বা শিবপুরী)। এরই দক্ষিণে ছিল চেত রাজ্য। তার রাজধানী ছিল চেতনগরীতে (বর্তমান ঘাটাল মহকুমার অন্তর্ভুক্ত চেতুয়া পরগণা)। এই উভয় রাজ্যেরই সীমান্ত কলিংগ রাজ্যের সীমানার সংগে এক ছিল। কলিংগ রাজ্য তখন বর্তমান মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সিংহল দেশের 'দীপবংশ' ও 'মহাবংশ' নামে দুটি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে আমরা

জানতে পারি যে বঙ্গদেশের বঙ্গ নগরে এক রাজার বিজয়সিংহ নামে এক পুত্র দুর্বিনীত আচারের জন্য সাত শত অনুচর সহ বাঙলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে সিংহলে যায়, এবং সিংহল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

আলেকজাণ্ডারের (৩২৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) ভারত আক্রমণের সময় বাঙলায় গঙ্গারাঢ় নামে এক স্বাধীন রাজ্য ছিল। গঙ্গারাঢ়দের শৌর্যবীর্যের কথা শুনেই আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদীর তীর থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

এর অনতিকাল পরেই বাঙলা তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। কেননা, মহাস্থানগড়ের এক শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে, উত্তর বাঙলা মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, কারণ মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত পুণ্ড্রবর্ধন নগরে এক কর্মচারীকে অধিষ্ঠিত করেছিল। মনে হয় এই সময় থেকেই আর্যসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বাঙলা দেশে ঘটেছিল। 'মনুসংহিতা' রচনাকালে (২০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে) বাঙলাদেশ আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হত। কুষাণ সম্রাটগণের মুদ্রাও বাঙলার নানা জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে বাঙলাদেশ গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙলাদেশ আবার স্বাধীনতা লাভ করে। এই সময় গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামে তিনজন স্বাধীনরাজা 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। গোপচন্দ্র ওড়িষারও এক অংশ অধিকার করেন। এর অনতিকাল পরে বাঙলাদেশের রাজা শশাঙ্ক (৬০৬-৬৩৭ খ্রীস্টাব্দ) পশ্চিমে কান্যকুব্জ ও দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। এরপর বাঙলাদেশে কিছুকাল অরাজকতা দেখা দেয়। এই অরাজকতার হাত থেকে বাঙলাদেশকে রক্ষা করেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল (৭৫০-৭৭০ খ্রীস্টাব্দ)।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গোপালের সময় থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে গোবিন্দপালের সময় পর্যন্ত পালবংশই বাঙলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। একই রাজবংশের ক্রমাগত চারশো বছর (৭৫০-১১৯৯ খ্রীস্টাব্দ) রাজত্ব করা ভারতের ইতিহাসে এক অসাধারণ ঘটনা। গোপালের পৌত্র দেবপাল নিজের রাজ্য বিস্তার করেছিলেন দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত। দেবপালের পিতা ধর্মপাল দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে গান্ধার পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত জয় করেছিলেন। বস্তুতঃ পালরাজগণের রাজত্বকালই বাঙলার ইতিহাসের গৌরবময় যুগ।

পালবংশের পতনের পর বাঙলায় সেনবংশ রাজত্ব করে। এরাও প্রতাপশালী

রাজা ছিলেন। সেনবংশের তৃতীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলেই বাঙলা মুসলমানদের হাতে চলে যায়। এ ঘটনা ঘটেছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর (১২০৪ খ্রীস্টাব্দে) শুরুতেই। তখন থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত বাঙলাদেশ স্বাধীন সুলতানদের শাসনাধীনে ছিল। পরের পঞ্চাশ (১৫৩৯-১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দ) বছর বাঙলা পাঠানদের অধীনে যায়। তারপর ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে সম্রাট আকবরের (১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দে) আমলে বাঙলা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর অপরাহ্নে বাঙলা মোগলদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে চলে যায়।

॥ পাঁচ ॥

বাঙলার ধর্মীয় সাধনার ও লৌকিক জীবনের আচার-ব্যবহারের একটা চিত্র পাঠক পাবেন 'পশ্চিম বাঙলার লৌকিক জীবন' ও 'ধর্মীয় চেতনার যাদুঘর' নিবন্ধদ্বয়ে। এখানে কেবল বাঙলার সমাজবিন্যাস ও প্রথাসমূহের একটা রূপরেখা টানবার চেষ্টা করব। আগেই বলেছি যে, বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম খুব বিলম্বে প্রবেশ করেছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে বাঙলায় চাতুর্বর্ণ সমাজবিন্যাস ছিল না। প্রথম ছিল কৌমগোষ্ঠিক সমাজ। তারপর যে-সমাজের উদ্ভব হয়েছিল, তাতে জাতিভেদ ছিল না, ছিল পদাধিকারঘটিত বৃত্তিভেদ। এটা আমরা জানতে পারি 'প্রথম কায়স্থ', 'জ্যেষ্ঠ কায়স্থ', 'প্রতিবেশী,' 'কুটুম্ব' প্রভৃতি নাম থেকে। এ সব নাম আমরা পাই সমকালীন তাম্রপট্ট লিপি থেকে। তারপর পাই বৃত্তিধারী গোষ্ঠীর নাম, যথা 'নগরশ্রেষ্ঠী', 'সার্থবাহ,' 'ক্ষেত্রকার', 'ব্যাপারী' ইত্যাদি। পরে পালযুগে যখন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ঘটে, তখন বাঙলায় বৃত্তিধারী গোষ্ঠীগুলি আর বৈবাহিক আদান-প্রদানের সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত হয় না। তখনই বাঙলার জাতিসমূহ সঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পালরাজগণের পর সেনরাজগণের আমলে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে তখন বাঙলার সকল জাতিই সঙ্করত্ব দোষে দুষ্ট। সেজন্য বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এ ব্রাহ্মণ ছাড়া, বাঙলার আর সকল জাতিকেই সঙ্কর জাতি বলে অভিহিত করা হয়েছিল ও তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল—১) উত্তম সঙ্কর, (২) মধ্যম সঙ্কর ও (৩) অন্ত্যজ। এরপর আর একটা শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল—'নবশাখ' বিভাগ। নবশাখ মানে যাদের হাতে ব্রাহ্মণরা জল

গ্রহণ করত। বিবাহের অন্তর্গোষ্ঠী (endogamous) হিসাবে মধ্যযুগে যে সকল জাতি বিদ্যমান ছিল, তাদের নাম আমরা মঙ্গলকাব্যসমূহে পাই। এ সকল জাত আজও বিদ্যমান আছে। ময়ূরভট্টের 'ধর্মপুরাণ'-এ যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তা নীচে উদ্ধৃত করা হল :

"সদ্‌গোপ কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বুলি।
উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলি॥
যোগী ও আশ্বিন তাঁতি মালী মালাকর।
নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর॥
হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি।
মাজি ও বাগদী মেটে নাহি ভেদজাতি॥
স্বর্ণকার সুবর্ণবণিক্‌ কর্মকার।
সূত্রধর গন্ধবেনে ধীবর পোদ্দার॥
ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা।
পরিল তাম্রের বালা কায়স্থ কেওরা॥"

(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণ, পৃ. ৮২)

মধ্যযুগের সমাজ জীবনকে কলুষিত করেছিল তিনটি অপপ্রথা—(১) কৌলিন্য, (২) সহমরণ ও (৩) দাসদাসীর হাট। এ সবের বিশদ বিবরণ আমি দিয়েছি আমার "বাঙলার সামাজিক ইতিহাস"-এ। সুতরাং এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করলাম না। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এ সকল প্রথা বাঙালীসমাজে প্রচলিত ছিল। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজ-সংস্কারকের প্রচেষ্টার ফলে ইংরেজ সরকার কর্তৃক এগুলি নিবারিত হয়। তারপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবা-বিবাহ আইন-সিদ্ধ হয়। পরে অসবর্ণ বিবাহের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন হয়। আরও পরে বিবাহের ন্যূনতম বয়সও বর্ধিত করা হয়।

বাঙলা কি সভ্যতার জন্মভূমি?

পণ্ডিতমহল ধরে নিয়েছেন যে, সিন্ধুসভ্যতার অপমৃত্যু ঘটেছিল। এর জন্য তাঁরা নানারকম কারণও দর্শান। যথা বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প, বহিরাক্রমণ ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা স্যর জন মারশালের নির্দেশে ১৯২৮-৩১ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন এ-সম্বন্ধে অনুশীলন করেছিলাম, তখনই প্রমাণ করেছিলাম যে সিন্ধুসভ্যতার বিলুপ্তি ঘটেনি। বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প ও বৈদিক বিরোধিতা সত্ত্বেও সিন্ধুসভ্যতা পরবর্তীকালে জীবিত ছিল হিন্দুসভ্যতার মধ্যে। ('ক্যালকাটা রিভিউ,' এপ্রিল-মে ১৯৩১ দ্রষ্টব্য)। তখনই আমি বলেছিলাম যে, রীতিমত খনন-কার্য চালালে দেখা যাবে যে সিন্ধুসভ্যতা গংগা উপত্যকার সুদূর প্রত্যন্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীকালের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও আবিষ্কার আমার সে উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করেছে।

বাঙালীরা আজও সিন্ধুসভ্যতাকে আঁকড়ে ধরে আছে। চলুন না একবার ঠাকুর ঘরের দিকে যাই। ঠাকুর ঘরে ব্যবহৃত বাসন-কোষণগুলি সবই তাম্রাশ্মযুগের। পাথরের থালা, তামার কোষাকুষি প্রভৃতি তার নিদর্শন। (তাম্রাশ্মযুগের কোষাকুষি সম্প্রতি মহিষাদলে পাওয়া গিয়েছে)। নিরবচ্ছিন্নভাবে বাঙালী এগুলো তাম্রাশ্মযুগ থেকেই ব্যবহার করে আসছে।

তাম্রাশ্মযুগের সভ্যতার অভ্যুদয়ে তামাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মিশর বলুন, সুমের বলুন, সিন্ধু উপত্যকা বলুন সর্বত্রই আমরা সভ্যতার প্রথম প্রভাতে তামার ব্যবহার দেখি। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ এমন কোন জায়গায় হয়েছিল, যেখানে তামা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এখানে সেখানে অবশ্য তামা সামান্য কিছু কিছু পাওয়া যেত, কিন্তু তা নগণ্য। বাঙলাই ছিল সে-যুগের তামার প্রধান আড়ত। তামার সবচেয়ে বৃহত্তম খনি ছিল বাঙলাদেশে। বাঙলার বণিকরাই 'সাত সমুদ্দুর তের নদী' পার হয়ে, ওই তামা নিয়ে যেত সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে বিপণনের জন্য। এজন্যই বাঙলার সবচেয়ে বড় বন্দর-নগরের নাম ছিল তাম্রলিপ্ত। এই তামা সংগৃহীত হত ধলভূমে অবস্থিত তৎকালীন ভারতের বৃহত্তম তাম্রখনি হতে।

সিন্ধু সভ্যতার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাতৃদেবীর পূজা। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় মাতৃদেবীর পূজার প্রাবল্য বাঙলাদেশেই সবচেয়ে বেশি। এটা মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার যুগ থেকে চলে এসেছে। মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা প্রভৃতি নগরে আমরা মাতৃদেবীর পূজার নিদর্শন হিসাবে পেয়েছি মাতৃকাদেবীর বহু মৃন্ময়ী ক্ষুদ্রকায়া মূর্তি। অনুরূপ মূর্তি বাঙলাদেশেও বর্তমান কাল পর্যন্ত তৈরি হয়ে আসছে। তবে এগুলি সাধারণতঃ বাচ্চাদের খেলার পুতুল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এরূপ পুতুলগুলিকে 'কুমারী পুতুল' বলা হয়। এ নামটা খুব অর্থপূর্ণ। কেননা মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও সমসাময়িক সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে মাতৃদেবী 'কুমারী' (virgin goddess) হিসাবে পূজিতা হতেন। মহাষ্টমীর দিন বাঙালী সধবা মেয়েদের 'কুমারী পূজা' তার স্মৃতি-নিদর্শন। যদিও তাম্রাশ্ম যুগে মাতৃদেবী কুমারী হিসাবে পরিকল্পিত হতেন, তথাপি তাঁর ভর্তা ছিল। এই ভর্তার প্রতিকৃতি আমরা মহেঞ্জোদারোতে পেয়েছি। তাঁকে পশুপতি শিবের আদিরূপ বলা হয়েছে। শিব যে প্রাকার্য দেবতা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ-সম্পর্কে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে, বাঙলায় শৈবধর্মের প্রাধান্য। বস্তুতঃ বাঙলায় যত শিবমন্দির দেখতে পাওয়া যায়, তত আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং শিব ও শক্তিপূজা যে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার কাল থেকেই চলে এসেছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

॥ দুই ॥

সিন্ধুসভ্যতার অনুরূপ সভ্যতা সুমেরেও পাওয়া গিয়েছে। সুমেরের কিংবদন্তী অনুযায়ী সুমেরের লোকেরা পূর্বদিকের কোন পার্বত্য অঞ্চল থেকে এসেছিল। সে জায়গাটা কোথায় ? নিকট প্রাচীর বিখ্যাত ইতিহাসকার হল সাহেব বলেছিলেন যে সুমেরের লোকেরা ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে "যোগিনীতন্ত্রে" উল্লিখিত "সৌমার" দেশের সঙ্গে "সুমের"-এর বেশ শব্দগত সাদৃশ্য ও সঙ্গতি আছে। "সৌমার" দেশ সম্বন্ধে "যোগিনীতন্ত্রে" বলা হয়েছে—"পূর্বে স্বর্ণনদী যাবৎ করতোয়া চ পশ্চিমে/দক্ষিণে মন্দশৈলশ্চ উত্তরে বিহগাচল/অষ্টকোণম চ সৌমারম যত্র দিক্করবাসিনী।" দিক্করবাসিনীর আবাসস্থল 'সৌমার' অষ্টকোণাকৃতি দেশ, যার সীমারেখা হচ্ছে পূর্বে স্বর্ণ নদী (শোনকুশি), পশ্চিমে করতোয়া নদী, দক্ষিণে মন্দ-পর্বতসমূহ (গারো ও

খাসিয়া পর্বতমালা) ও উত্তরে বিহগাচল (হিমালয়)। সুমেরের লোকেরা যে প্রাচ্যভারত থেকে গিয়েছিল এবং তাদের নূতন উপনিবেশের নাম আগত দেশের নাম অনুযায়ী করেছিল (এরূপ নামকরণ-পদ্ধতি অতি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত আছে), মাতৃ-পূজাই তার প্রমাণ।

বাঙলার ও সুমেরের মাতৃদেবীর কল্পনার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—(১) উভয় দেশেই মাতৃদেবী 'কুমারী' হিসাবে কল্পিত হতেন, অথচ তাঁর ভর্তা ছিল, (২) উভয় দেশেই মাতৃদেবীর বাহন সিংহ ও তাঁর ভর্তার বাহন বৃষ, (৩) উভয় দেশেই মাতৃদেবী তাঁর নারীসুলভ কার্যাদি ছাড়া, পুরুষোচিত কর্ম (যেমন যুদ্ধাদি) করতে সক্ষম হতেন। সুমেরের লিপিসমূহে পুনঃ পুনঃ তাঁকে "যুদ্ধবাহিনীর নেত্রী" বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ভারতেও "মার্কণ্ডেয় পুরাণ"-এর 'দেবী মাহাত্ম্য' অংশে বর্ণিত হয়েছে যে, দেবতারা অসুরগণ-কর্তৃক পরাহত হয়ে মাতৃদেবীর শরণাপন্ন হন, এবং তাঁর সাহায্যেই অসুরাধিপতি মহিষাসুরকে নিহত করেন। (৪) সুমেরে মাতৃদেবীর সহিত পর্বতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। তাঁকে পুনঃ পুনঃ "পর্বতের দেবী" বলা হয়েছে। ভারতেও মাতৃদেবীর পার্বতী, হৈমবতী, বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি নাম সে-কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। (৫) উভয় দেশেই ধর্মীয় আচরণ হিসাবে মেয়েরা সাময়িকভাবে তাদের সতীত্ব বিসর্জন দিত। এ সম্পর্কে ভারতে কুল পূজায় অনুরূপ আচরণ লক্ষণীয়। "গুপ্ত সংহিতা"য় স্পষ্টই বলা হয়েছে— "কুল-শক্তিম্‌ বিনা দেবী যো যপেৎ স তু পামর।" আবার "নিরুত্তরতন্ত্রে" বলা হয়েছে—"বিবাহিতা পতিত্যাগে দূষণম ন কুলার্চনে।" এসব ছাড়া, আরও সাদৃশ্যের কথা ১৯২৮-৩১ খ্রীস্টাব্দে আমি আমার অনুশীলনের প্রতিবেদনে বলেছিলাম। ('ক্যালকাটা রিভিউ', এপ্রিল-মে ১৯৩১ দ্রষ্টব্য)।

॥ তিন ॥

বাঙালীরা যে মাত্র মধ্য-প্রাচীতেই শক্তিপূজার বীজবপন করেছিল, তা নয়। তারা শক্তিপূজা ভূমধ্যসাগরের সুদূর ক্রীট দ্বীপ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। কেননা, ক্রীট দেশেও মাতৃদেবীর বাহন ছিল সিংহ। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের "হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকার পূজা সংখ্যায় আমি এক প্রবন্ধে ক্রীট দেশে প্রচলিত লিপি ও বাঙলার পাঞ্চমার্কযুক্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপি পাশাপাশি রেখে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়েছিলাম। তা ছাড়া, ক্রীট দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েরা

মনে হয়। তার মধ্যে ছিল চাউল ও মৎস্য ধরবার বড়শি। চাউল ও মৎস্য— এ দুই-ই বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। ধান্যের চাষ যে বঙ্গোপসাগরের আশপাশের কোন জায়গায় হয়েছিল, এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। কারলো চিপোলো তাঁর "দি ইকনমিক হিস্ট্রি অভ্ ওয়ারলড্ পপুলেশন" পুস্তকে এই মত প্রকাশ করেছেন। শ্রীপরেশ দাশগুপ্ত তাঁর "এক্সক্যাভেশনস অ্যাট পান্ডুরাজার ঢিবি" বইতেও বলেছেন যে ধান্যের চাষ বাঙলাতেই শুরু হয়েছিল, এবং বাঙলা থেকে তা' চীন দেশে গিয়েছিল।

পশুপালন ও চাষবাস মানুষকে বাধ্য করেছিল স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে। এর ফলেই গ্রাম্য-সভ্যতার পত্তন ঘটে। এটা নবপলীয় যুগেই প্রথম আরম্ভ হয়। কেননা, প্রত্নপলীয় যুগের লোকেরা যাযাবরের জীবন যাপন করত। সুতরাং সভ্যতার সূচনা কোথায় হয়েছিল, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হলে, আমাদের প্রথমে নির্ণয় করতে হবে, নবপলীয় সভ্যতার উৎপত্তিকেন্দ্র কোথায় ছিল। কিছুদিন আগে পর্যন্ত পণ্ডিতমহলে (অবশ্য এখনও অনেক পন্ডিত এই ভ্রান্ত মত পোষণ করেন) যে মত প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, তা হচ্ছে আজ থেকে প্রায় আট-নয় হাজার বছর আগে মধ্য-প্রাচীর জারমো, জেরিকো ও কাটাল হুয়ুক নামক স্থান সমূহেই নবপলীয় সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে, এবং তা বিকশিত হয়ে ক্রমশঃ ইরাণীয় অধিত্যকা ও মধ্য এশিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু আরও পরেকার আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়েছে যে, তার চেয়েও আরও আগে নবপলীয় সভ্যতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল থাইল্যান্ডে। এ সভ্যতার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন রোনালড্ শিলার। সি. ও. সয়ার তাঁর "এগ্রিকালচারাল অরিজিনস্ অ্যান্ড ডিসপারসাল" নামক গ্রন্থেও বলেছেন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই নবপলীয় বিপ্লবের সবচেয়ে প্রাচীন লীলাভূমি ছিল বলে মনে হয়।

॥ পাঁচ ॥

নবপলীয় সভ্যতার পরের যুগেই তাম্রাশ্ম-সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে। হরপ্পা নগরীতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে, আমরা নবপলীয় যুগ থেকে শুরু করে পরিণত তাম্রাশ্ম-সভ্যতার বিকাশের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করি। মধ্যপ্রাচীতে এবং থাইল্যান্ডে যেমন স্বতন্ত্রভাবে নবপলীয় সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল, সেরূপ ভারতেও নবপলীয় সভ্যতা স্বতন্ত্রভাবেই উদ্ভূত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, প্রত্নপলীয় যুগ থেকে নবপলীয় যুগ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতা

আমরা ভারতেও লক্ষ্য করি। এ ধারাবাহিকতা আমরা বাঙলাদেশেও লক্ষ্য করি। প্রত্নপলীয় যুগের আয়ুধসমূহ আমরা বাঙলার নানাস্থান থেকে পেয়েছি। সেই সকল স্থানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে—মেদিনীপুর জেলার অরগণ্ডা, সিলদা, অন্টজুরি, শহারি, ভগবন্ধ, কুকরাধুপি, গিডনি ও চিকলিগড়; বাঁকুড়া জেলার কাল্লা লালবাজার, মনোহর, বন অসুরিয়া, শহরজোরা, কাঁকরাদাড়া, বাউরিডাংগা, ঝাড়গ্রাম, কাচিণ্ডা, শুশুনিয়া ও শিলাবতী নদীর প্রশাখা জয়পাণ্ডা নদীর অববাহিকা; বর্ধমান জেলার গোপালপুর, সাতখনিয়া, বিলগভা, সাগরডাংগা, আরা ও খুরুপির জংগল। শুশুনিয়া থেকে আমরা যে সকল জীবের অশ্মীভূত কঙ্কালাস্থি পেয়েছি, তার গুরুত্ব এ-সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি। এগুলি প্লাইস্টোসীন যুগের, তার মানে যে-যুগে পৃথিবীতে প্রথম মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। আগের নিবন্ধেই বলেছি যে মানুষের বিবর্তন ঘটেছিল পূর্বগামী নরাকার জীব থেকে। এরূপ নরাকার জীবের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন আমরা পেয়েছি এশিয়ার তিন জায়গা থেকে। এই জায়গাগুলি হচ্ছে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত শিবালিক গিরিমালা, ইন্দোনেশিয়ার জাভা ও চীনদেশের চুংকিঙ। এই তিনটি বিন্দু সরলরেখার দ্বারা সংবদ্ধ করলে যে ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়, বাঙলাদেশ তার কেন্দ্রস্থলে পড়ে। সুতরাং এরূপ জীবসমূহ যে বাঙলাদেশেও ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। এই সকল জীব থেকেই প্রকৃত মানবের (homo sapiens) বিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং বাঙলাদেশেও প্রকৃত মানবের যে বিবর্তন ঘটেছিল, সে অনুমান আমি অনেক আগেই করেছিলাম। সম্প্রতি আমার এই অনুমান সমর্থিত হয়েছে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক যুগান্তকারী আবিস্কারের দ্বারা। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দের জানুআরি মাসে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মেদিনীপুর জেলার রামগড়ের অদূরে কংসাবতী নদীর বামতটে অবস্থিত সিজুয়া নামক স্থান থেকে এক মানব চোয়ালের অশ্মীভূত ভগ্নাংশ পায়। আজ পর্যন্ত এশিয়ায় প্রাচীন প্রকৃত মানবের অশ্মীভুত যত নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে প্রাচীন। সুতরাং হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর অনেক পূর্ব থেকে বাঙলাদেশে যে প্রকৃত মানব বাস করত এবং তারা প্রত্নপলীয় যুগের কৃষ্টির ধারক ছিল, তা প্রমাণিত হচ্ছে।

আগেই বলেছি যে, প্রত্নপলীয় যুগ ও নবপলীয় যুগের মধ্যকালীন যুগের কৃষ্টিকে মেসোলিথিক (mesolithic) কালচার বলা হয়। মেসোলিথিক কৃষ্টির প্রচুর নিদর্শন ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৫৪-৫৭ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান

জেলার বীরভনপুর থেকে আবিষ্কার করেছিল।

মেসোলিথিক যুগের পরেই নবপলীয় যুগের উদ্ভব হয়েছিল। এই যুগেই মানুষ প্রথম কৃষি, পশুপালন, বয়ন, মৃৎপাত্র নির্মাণ ও স্থায়ী বসবাস শুরু করেছিল। নবপলীয় যুগের বৈশিষ্ট্যমূলক আয়ুধ ছিল মসৃণ পরশু। এরূপ পরশু আমরা পেয়েছি বাঁকুড়া জেলার বন অসুরিয়া, কাচিণ্ডা ও জয়পাণ্ডায়; মেদিনীপুর জেলার অরগণ্ডা, কুকরুধুপি, তারাফেনি ও দুলুঙ নদীর মোহানায়; ও কংসাবতী নদীর অববাহিকায় কাঁকরাদাড়া থেকে। নবপলীয় যুগের পরশু আমরা উত্তরে দার্জিলিঙ জেলার কালিমপঙ থেকেও প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি। সুতরাং প্রত্নপলীয় যুগ থেকে নবপলীয় যুগের বিবর্তন যে বাঙলাদেশে স্বাভাবিক-ভাবেই ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

নবপলীয় যুগের গ্রামীণ সভ্যতাই পরবর্তীকালে তাম্রাশ্মযুগের নগর-সভ্যতায় বিকশিত হয়েছিল। যেহেতু তামার সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার বাঙলাদেশেই ছিল, তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, এই বিবর্তন বাঙলাদেশেই ঘটেছিল, এবং বাঙলার বণিকরাই অন্যত্র তামা সরবরাহ করে সে-সব জায়গায় তাম্রাশ্মযুগের নগরসভ্যতা গঠনে সাহায্য করেছিল। এটা মেদিনীপুরের লোকেদের দ্বারাই সাধিত হয়েছিল। মেদিনীপুরের লোকেরা যে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ওই জেলার পান্না গ্রাম থেকে। ওই গ্রামে এক পুষ্করিণী খননকালে, ৪৫ ফুট গভীর তল থেকে পাওয়া গিয়েছে সমুদ্রগামী এক নৌকার কঙ্কালাবশেষ।

॥ ছয় ॥

বাঙলায় যে এক বিশাল তাম্রাশ্ম-সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল, তা আমরা খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে জানতে পারি। ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার আগাইবানিতে ৪০ ফুট গভীর মাটির তলা থেকে আমরা পেয়েছিলাম তামার একখানা সম্পূর্ণ পরশু ও অপর একখানা প্রমাণ সাইজের পরশুর ভাঙা মাথা, ছোট সাইজের আধভাঙা আর একখানা পরশু, এগারোখানা তামার বালা এবং খানকতক ক্ষুদ্রকায় তামার চাঙারি। পুরাতাত্ত্বিক দেবকুমার চক্রবর্তীর মতে এগুলি হরপ্পার পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কোন মানব-গোষ্ঠীর। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুরের বিনপুর থানার অন্তর্গত তামাজুরি গ্রামেও তাম্র-প্রস্তর যুগের অনুরূপ নিদর্শনসমূহ পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে

ওই জেলারই এগরা থানার চাতলা গ্রামে আরও ওই ধরনের কিছু নিদর্শন মেলে। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে পার্শ্ববর্তী জেলা পুরুলিয়ার কুলগড়া থানার হাড়া গ্রামেও কিছু কিছু ওই ধরনের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনুরূপ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলার প্যাণ্ডিগাঁয়ে পাওয়া গিয়েছিল। তার অন্তর্ভুক্ত ছিল ঠিক আগাইবনির ধরনের ৪৭টি তামার বালা ও পাঁচটি পরশু। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তাম্রাশ্ম-সভ্যতার পরিযান (migration) পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে ঘটেছিল।

বাঙলার তাম্রাশ্ম-সভ্যতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে বর্ধমান জেলার অজয় নদের তীরে অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে। অজয়, কুনুর ও কোপাই নদীর উপত্যকার অন্যত্রও আমরা এই সভ্যতার পরিচয় পাই। পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় যুগের লোকেরাই তাম্রাশ্ম-সভ্যতার বাহক ছিল। তারা সুপরিকল্পিত নগর ও রাস্তাঘাট তৈরি করত। তারা গৃহ ও দুর্গ—এই উভয়ই নির্মাণ করতে জানত। তারা তামার ব্যবহার জানত। কৃষি ও বৈদেশিক বাণিজ্য তাদের অর্থনীতির প্রধান সহায়ক ছিল। তারা ধান্য ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন করত এবং পশুপালন ও কুম্ভকারের কাজও জানত। পূর্ব-পশ্চিম দিকে শয়ন করিয়ে তারা মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করত এবং মাতৃকাদেবীর পূজা করত।

এসব নিদর্শন থেকে বুঝতে পারা যায় যে, সুদূর অতীতে পুরুলিয়া-মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-বর্ধমান অঞ্চল জুড়ে এক সমৃদ্ধশালী তাম্রাশ্ম-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে আমরা সেই লুপ্ত সভ্যতার মাত্র সামান্য কিছু আভাস পাই। আজ যদি আমরা হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল, কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানের ন্যায় প্রণালীবদ্ধভাবে রীতিমত খননকার্য চালাই, তা হলে আমরা নিশ্চয়ই জানতে পারব যে, তাম্রাশ্ম-সভ্যতার উন্মেষ বাঙলাদেশেই ঘটেছিল ও বাঙলাই সভ্যতার জন্মভূমি ছিল।

পশ্চিম বাঙলার লৌকিক জীবন

বৈদিক সাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, আর্যরা প্রথমে পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করে। তারপর তারা ক্রমশ পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু তাদের এই অগ্রগতি বিদেহ বা মিথিলা পর্যন্ত এসে থেমে যায়। সেখানে তারা প্রতিহত হয়েছিল প্রাচ্যদেশের লোকদের কাছে। প্রাচ্যদেশের লোকদের তারা ঘৃণার চোখে দেখত, ও তাদের 'ব্রাত্য' বলে অভিহিত করত। ব্রাত্যদের আচার-ব্যবহার ও পূজা-পদ্ধতি আর্যদের আচার-ব্যবহার ও পূজা-পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। তার কারণ, ব্রাত্যরা, তথা বাঙলা দেশের আদিম অধিবাসিগণ, বৈদিক আর্যগণ থেকে ভিন্ন নরগোষ্ঠীর লোক ছিল। বৈদিক আর্যরা ছিল নর্ডিক নরগোষ্ঠীর লোক। আর বাঙলার আদিম অধিবাসিরা ছিল অস্ট্রিক ভাষাভাষী প্রাক্-দ্রাবিড়, দ্রাবির ভাষাভাষী দ্রাবিড়,ও আর্য ভাষাভাষী আলপীয়-দিনারিক নরগোষ্ঠীর লোক। বাংলা ভাষার বহু শব্দই এই সকল নরগোষ্ঠীর শব্দ। (লেখকের "বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয়" ১৯৪২ ; জিজ্ঞাসা ১৯৭৫ ও ১৯৭৯ দ্রষ্টব্য)।

যদিও মৌর্যযুগ থেকেই বাঙলায় ব্রাহ্মণদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তা হলেও ব্যাপকভাবে ব্রাহ্মণরা বাঙলায় আসতে শুরু করে গুপ্তযুগে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে বাঙলাদেশে বাঙলার আদিম অধিবাসীদের ধর্মই অনুসৃত হত। মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি, প্রকৃতির সৃজনশক্তিকে মাতৃরূপে পূজা, লিঙ্গ পূজা কুমারী পূজা, 'টটেম'-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, এবং গ্রাম, নদী, বৃক্ষ, অরণ্য, পর্বত ও ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, মানুষের ব্যাধি ও দুর্ঘটনা সমূহ দুষ্ট শক্তি বা ভুত-প্রেত দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস ও বিবিধ নিষেধাজ্ঞা-জ্ঞাপক অনুশাসন ইত্যাদি নিয়েই বাঙলার আদিম অধিবাসীদের ধর্ম গঠিত ছিল। কালের বিবর্তনে এই সকল বিশ্বাস ও আরাধনা-পদ্ধতি ক্রমশ বৈদিক আর্যগণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল, এবং সেগুলি হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মে পরিণত হয়েছিল। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনেক কিছু পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠান, যেমন দুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট নবপত্রিকার পূজা ও শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, ঘেঁটু-

পূজা, চড়ক, গাজন প্রভৃতি এবং আনুষ্ঠানিক কর্মে চাউল, কলা, কলাগাছ, নারিকেল, সুপারি, পান, সিঁদুর, ঘট, আলপনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোময় এবং পঞ্চগব্যের ব্যবহার ইত্যাদি সবই আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে আরও নেওয়া হয়েছিল আটকৌড়ে, শুভচনী পূজা, শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠী পূজা, বিবাহে গাত্রহরিদ্রা, পানখিলি, গুটিখেলা. স্ত্রী-আচার, লাজ বা খই ছড়ানো, দধিমঙ্গল, লক্ষ্মী পূজার সময় লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপন, অলক্ষ্মীর পূজা ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠান যা বর্তমান কালেও বাঙালী হিন্দু পালন করে থাকে। এ সবই প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির অবদান। এ ছাড়া, নানারূপ গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা, ধ্বজা পূজা, বৃক্ষের পূজা, বৃষকাষ্ঠ, যাত্রাজাতীয় পর্বাদি যেমন স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা. দোলযাত্রা প্রভৃতি এবং ধর্মঠাকুর, চণ্ডী, মনসা, শীতলা, জাঙ্গুলী, পর্ণশবরী প্রভৃতির পূজা ও অম্বুবাচী, অরন্ধন ইত্যাদি সমস্তই আমাদের প্রাক্-আর্যজাতি সমূহের কাছ থেকে নেওয়া। (লেখকের "হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অভ্ বেঙ্গল", ১৯৬৩ ও "বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস", জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬ দ্রষ্টব্য)।

॥ দুই ॥

এই সকল উপাদানের ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছিল বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতি। দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন মায়া জাতির ন্যায় বাঙলার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ছিল লৌকিক জীবনচর্যার ওপর জ্যোতিষের প্রভাব। সে প্রভাব বাঙালী আজও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সামাজিক জীবনে বিবাহই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আনুষ্ঠানিক সংস্কার। বাঙালী পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় কোষ্ঠী-ঠিকুজিতে সপ্তম ঘরে কোন গ্রহ বা সপ্তমাধিপতি কোন ঘরে আছে, তার বিচার করে। যদি সপ্তম ঘরে কোন পাপগ্রহ থাকে, তবে সে বিবাহ বর্জন করে। তারপর গণের মিল ও অমিলও দেখে। আবার সব মাসেও বাঙালীর বিবাহ হয় না। বারো মাসের মধ্যে মাত্র সাত মাসে বিবাহ হয়। তারপর জ্যৈষ্ঠ মাসে বাঙালী জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেয় না। বিবাহের পর আসে দ্বিরাগমনের ব্যাপার। বাঙালী পঞ্জিকা দেখে দ্বিরাগমনের দিন স্থির করে। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে কালবেলা, বারবেলা, কালরাত্রি ইত্যাদি পরিহার করে। বাঙালী বিবাহিতা মেয়েদের জীবনে আরও অনেক অনুষ্ঠান ছিল, যথা গর্ভাধান বা প্রথম রজোদর্শন, পুংসবন, পঞ্চামৃত, সাধ, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদি।

এই সব অনুষ্ঠানের জন্যও পঞ্জিকা দেখে দিন স্থির করা হয়।

উপনয়নের ক্ষেত্রেও, বিবাহের মত পঞ্জিকার নির্দেশ অনুসৃত হয়। এ-ছাড়া আছে নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, বিদ্যারম্ভ, দীক্ষা ইত্যাদি অনুষ্ঠান। এ সবও পঞ্জিকা অনুমোদিত দিনে অনুষ্ঠিত হয়।

বাঙালীর বৈষয়িক ও ধর্মীয় জীবনেও জ্যোতিষের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, নববস্ত্র পরিধান, রত্নধারণ, দেবগৃহারম্ভ, জলাশয়ারম্ভ, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, দেবতাগঠন, দেবতা প্রতিষ্ঠা, শিব প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা, নৌকাগঠন, নৌকাচালন, নৌকাযাত্রা, ক্রয়বাণিজ্য, বিক্রয়বাণিজ্য, বিপণ্যারম্ভ, রাজদর্শন, ঔষধকরণ, ঔষধসেবন, গ্রহপূজা, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, আরোগ্য স্নান, হল প্রবাহ, বীজবপণ, বৃক্ষাদিরোপণ, ধান্যরোপণ, ধান্যছেদন, ধান্যস্থাপন, ধান্য-নিষ্ক্রমণ, নাট্যারম্ভ, নবান্ন, ঋণদান, ঋণগ্রহণ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও আজকাল এ-সকল ব্যাপারে বাঙালী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর দিন-ক্ষণ দেখে না, তথাপি যারা মানে তাদের হিতার্থে পঞ্জিকায় এ-সকল ব্যাপারের প্রশস্ত দিন দেখানো থাকে। এ-সকল দিন যে-পঞ্জিকায় দেখানো থাকে, তা থেকে পরিস্কার বুঝতে পারা যায় যে, এক সময় বাঙালীর লৌকিক জীবনে দিন-ক্ষণ দেখেই এ-সকল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হত।

বাঙালীর লৌকিক জীবনে জ্যোতিষিক প্রভাবের শেষ এখানেই নয়। খাদ্যা-খাদ্য ও উপবাস সম্বন্ধেও বাঙালীকে অনেক জ্যোতিষিক অনুশাসন মানতে হত, এবং এখনও হয়। উপবাস সম্বন্ধে যে বচন অনুসরণ করা হত, তা হচ্ছে—"শোয়া ওঠা পাশ মোড়া। তার অর্ধেক ভীমে ছোড়া॥ ক্ষ্যাপার চৌদ্দ, ক্ষ্যাপীর আট। এ নিয়েই কাল কাট॥" তার মানে শয়ন একাদশী (আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী), পার্শ্বপরিবর্তন (ভাদ্র বা আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী), ভীম একাদশী (মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী), উত্থান একাদশী (কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী), শিবরাত্রি (ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী) ও দুর্গাষ্টমী (আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী)—এই গুলিই হচ্ছে উপবাসের বিশিষ্ট দিন। প্রসঙ্গত এখানে বলা যেতে পারে এই সব জ্যোতিষিক অনুশাসন বা তথ্যসমূহ, এরূপ ছড়ার আকারেই বাঙালীর লৌকিক সমাজে প্রচলিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ খনা ও ডাকের বচনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যুগে যুগে এগুলোর ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু এগুলো এসেছে অতি প্রাচীনকাল থেকে।

বাঙালীর লৌকিক জীবনে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে আরও বিধিনিষেধ আছে। অরণ্যষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠীর দিন সধবা স্ত্রীলোকেরা মাছ খায় না। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার জয়মঙ্গলবার হিসাবে গণ্য হয়। ওদিনও মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার ইতুপুজার দিন। ওই সকল দিনেও মেয়েরা মাছ খায় না। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীপঞ্চমীর দিনও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে হিন্দুরা মাছ খায় না। দশহরার দিন ফলার আহার করবার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া, কোন কোন দিনে ঠাণ্ডা খাদ্য খাবার নিয়ম আছে। তার মধ্যে পড়ে ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে অরন্ধন। ওই দিন তপ্ত খাদ্য খাওয়া নিষিদ্ধ। মাত্র পূর্বদিনের রান্না করা জিনিসই খাওয়া চলে। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী 'শীতল ষষ্ঠী' নামে আখ্যাত। ওই দিনও ঠাণ্ডা খাওয়া হয়। এ ছাড়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে লাউ খাওয়া নিষিদ্ধ। মাঘ মাসে মুলা খাওয়া নিষিদ্ধ। এগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলিই বাঙালী হিন্দু আজ পর্যন্ত পালন করে আসছে। তবে পঞ্জিকায় যে-সকল খাদ্য বা কর্ম বিভিন্ন তিথিতে নিষিদ্ধ বলে চিহ্নিত করা আছে, তার সবগুলি বাঙালী হিন্দু আজ আর মানে না। সে-সকল নিষিদ্ধ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে প্রতিপদে কুমড়া, দ্বিতীয়ায় ছোট বেগুন, তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থীতে মুলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমি শাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁই শাক, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দশীতে মাষকলাই। এগুলি থেকে বাঙালীর খাদ্যে তরিতরকারির একটা হদিশ পাওয়া যায়। লক্ষণীয় এর মধ্যে আলু বা কপি নেই। তার কারণ, এগুলো বিদেশী তরিতরকারি, মাত্র দু-তিন শো বছর আগে আমাদের দেশে আমদানি হয়েছে। এ-ছাড়া, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে স্ত্রী, তৈল, মৎস্য-মাংসাদি সম্ভোগও নিষিদ্ধ।

॥ তিন ॥

আদিম সমাজসমূহের সংস্কৃতির গঠনে মেয়েদের প্রভাবই বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। বাঙালীর লৌকিক সংস্কৃতিতেও আমরা সেই প্রভাবই লক্ষ্য করি। বাঙালী মেয়েদের জীবন শুরু হত কতকগুলি ব্রতপালন নিয়ে। যেমন, পাঁচ বছর থেকে আট বছর পর্যন্ত কুমারী মেয়েরা বৈশাখ মাসে শিবপুজা ও পুণ্যিপুকুর, কার্তিক মাসে কুলকুলতি, পোষ মাসে সোদর, মাঘ মাসে

মাঘমণ্ডল ইত্যাদি ব্রত করত। আর সধবা মেয়েদের তো সারা বছর ধরেই কোন-না-কোন ব্রত লেগে থাকত। এ ছাড়া, বৈশাখ মাসে বিধবাদের ছিল কলসী উৎসর্গ।

সামাজিক জীবনে, মেয়েদের শাস্ত্রবহির্ভূত কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান আছে। এ বিষয়ে বাঙালী মেয়েরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় বিবাহ সম্পর্কিত স্ত্রী-আচার সমূহের ওপর। (বাঙলা দেশের বিভিন্ন অংশে বিবাহের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি এক হলেও, স্ত্রী-আচার সমূহের আঞ্চলিক পার্থক্য দেখা যায়)। এই সকল লৌকিক আচারের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আইবুড়োভাত, দধি-মঙ্গল, গায়েহলুদ, কলাতলায় স্নান করানো ও বরণ করা, হাই-আমলা, ছাদনাতলার অনুষ্ঠান-সমূহ, গাঁটছড়া বাঁধা, দুধ-আলতা অনুষ্ঠান, কড়ি বা গুটিখেলা, কালরাত্রি পালন করা, ফুলশয্যা ইত্যাদি। এ-ছাড়া, বিয়ের কয়েক দিন বরের পক্ষে জাঁতি ও মেয়ের পক্ষে কাজললতা বহন করার বিধি আছে। এগুলো সবই প্রাক্-আর্য কালের মেয়েলী লৌকিক সংস্কৃতি। (বাঙালী বিবাহে স্ত্রী-আচার সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য আমার "ভারতে বিবাহের ইতিহাস", শঙ্খ প্রকাশন, ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর "স্ত্রী-আচার", বিশ্বভারতী, বই দুটি দ্রষ্টব্য)।

আজকালকার দিনে মেয়েদের বেশি বয়সে বিয়ে হয়। সে জন্য প্রথম রজোদর্শনের উৎসব আর হয় না। কিন্তু আগেকার দিনে যখন মেয়েদের আট-দশ বছর বয়সে বিয়ে হত, তখন মেয়েরা খুব ধুমধাম করে প্রথম রজোদর্শনের উৎসব পালন করত। শুধু তাই নয়, মেয়েটিকে কয়েকদিন ধরে ঘরের নিভৃত কোণে লুকিয়ে থেকে নিয়মনিষ্ঠ আহারাদি ও একটি পোঁটলার মধ্যে নানারকম ফল ও একটি প্রস্তরখণ্ডকে সন্তান কল্পনা করে প্রসবের অভিনয় করতে হত।

আগেকার দিনে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হত বলে, মেয়েরা কিছুকাল বাপের বাড়িতেই থাকত। তারপর যখন দ্বিতীয়বার স্বামীগৃহে ফিরে আসত, তাকে 'দ্বিরাগমন' বলা হত। এটা বিহারের 'গৌনা' অনুষ্ঠানের সামিল। এখনও ধুমধাম করে বিহারে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। যদিও শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুযায়ী বারো বছরের পর মেয়ের বিয়ে হলে, দ্বিরাগমনের আর কোন প্রয়োজন নেই, তা হলেও লৌকিক আচার অনুযায়ী এখনও বিয়ের অব্যবহিত পরেই দ্বিরাগমন পালিত হয়। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের অভাব সত্ত্বেও দ্বিরাগমন পালন, লৌকিক সংস্কৃতির ওপর 'ট্রাডিশন' বা পরম্পরার প্রভাব জ্ঞাপন

করে। তেমনই, যদিও আগেকার দিনে সধবা স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক পালিত শাস্ত্রীয় অনেক আচার-অনুষ্ঠান লুপ্ত হয়ে গেছে, তা হলেও লৌকিক অনুষ্ঠান-সমূহ এখনও প্রচলিত আছে। প্রচলিত লৌকিক ব্রতগুলি মেয়েরাই পালন করে, পুরুষরা নয়। এ সমস্ত ব্রতে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এগুলি বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্ব হতেই পালিত হয়ে আসছে। পৌষ, চৈত্র ও ভাদ্র মাসে যে লক্ষ্মীপূজা-পুরোহিতের সাহায্যে করা হয়, তাকে আগেকার দিনে (বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত) 'খন্দ' পূজা বলা হত। বোধ হয় গ্রামাঞ্চলে এখনও বলা হয়। 'খন্দ' শব্দটা খুবই অর্থবাচক শব্দ এবং আদিম 'খন্দ' জাতির সংগে এর সম্পর্কের ইঙ্গিত করে। তবে লক্ষ্মী পূজা যে আদিম সমাজ থেকে গৃহীত, তা লক্ষ্মীর ঝাঁপির উপকরণসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায়। এ সম্পর্কে আরও লক্ষণীয় যে, আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা, দেওয়ালীর দিনের লক্ষ্মী পূজা, ও পৌষ, চৈত্র ও ভাদ্র মাসে পুরোহিতের সাহায্যে লক্ষ্মী পূজা করা সত্বেও, মেয়েরা নিজে নিজে প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী পূজা করে ও লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ে। অনুরূপভাবে মেয়েরা মংগলচণ্ডীর পূজা করে ও পাঁচালী পাঠ করে। নানা অঞ্চলে নানা নামে মংগলচণ্ডীর পূজা হয়, যথা হরিষ মংগল-চণ্ডী, নাটাই মংগলচণ্ডী, সঙ্কট মংগলচণ্ডী, ভাওতা মংগলচণ্ডী, ভাদাই মংগলচণ্ডী ইত্যাদি। দেবীভাগবতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, মংগলচণ্ডী নারীগণ কর্তৃক পূজিতা দেবতা—'যোষিতানাম ইষ্টদেবতাম্', এবং চণ্ডী সম্বন্ধে মূর্তিনির্মাণ সম্পর্কিত কতকগুলি গ্রন্থে বলা হয়েছে—'গোধাসনে ভবেদ্ গৌরী লীলয়া হংসবদনা,' 'অক্ষসূত্রম্ তথা পদ্মম্ অভয়ং চ বরং তথা। গোধাসনাশ্রিতা মূর্তি গৃহে পূজ্য-স্ত্রীয় সদা'। (আমার "বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস", জিজ্ঞাসা, দ্রষ্টব্য)।

ষষ্ঠীর পূজার সংগেও মেয়েদের সম্পর্ক দেখা যায়। সন্তানের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠীদেবী মাতৃজাতির একান্ত আরাধ্যা। সন্তানের মঙ্গল কামনায় নানা সময়ে এঁর পূজা করা হয়। সন্তান জন্মের ছয়দিনে সন্ধ্যায় ষেঠেরা পূজা করা হয়। একুশ বা ত্রিশ দিনে ষষ্ঠীপূজা করার প্রথা প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। অন্নপ্রাশন প্রভৃতি শুভকাজে, সকল কাজের আগে ষষ্ঠীর পূজা করা হয়। তাছাড়া, বছরের বিভিন্ন মাসে নানা নামে ষষ্ঠী ঠাকরুনের পূজা করা হয়। যেমন, বৈশাখ মাসে চান্দনী ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠ মাসে অরণ্য ষষ্ঠী, আষাঢ় মাসে কার্দমী

ষষ্ঠী, শ্রাবণ মাসে নোটন ষষ্ঠী, ভাদ্র মাসে চাপড়া ষষ্ঠী, আশ্বিন মাসে দুর্গা ষষ্ঠী, কার্তিক মাসে নাড়ি ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণ মাসে মূলা ষষ্ঠী, পৌষ মাসে অন্ন ষষ্ঠী, মাঘ মাসে শীতলা ষষ্ঠী, ফাল্গুন মাসে গো ষষ্ঠী ও চৈত্র মাসে অশোক ষষ্ঠী। ষষ্ঠী তিথি ছাড়া অন্য কোন দিনও ষষ্ঠী পূজার প্রচলন আছে। যেমন, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল প্রতিপদে হরি ষষ্ঠী, চৈত্র মাসে সংক্রান্তির পূর্বদিনে নীল ষষ্ঠী। নদীয়া জেলায় হরি ষষ্ঠীতে কাঁচাঘট পূজা করা হয়। নীল ষষ্ঠীতে মেয়েরা উপবাস করে ও সন্ধ্যায় শিবের পূজা দিয়ে উপবাস ভংগ করে। মেয়েরা মনে করে যে নীলের দিনেই, শিবের বিবাহ হয়েছিল। অনুরূপভাবে তারা শ্রাবণ মাসের যে কোন সোমবারে শিবের উপবাস করে, কেননা শ্রাবণ মাস হচ্ছে শিবের জন্মমাস। অরণ্য ষষ্ঠী যে এক সময় অরণ্যেই পূজিত হতেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে যে উপাখ্যান আছে, তা থেকেও তাই প্রমাণ হয়। বাঙলার দুটি জনপ্রিয় লৌকিক উৎসব হচ্ছে জামাই ষষ্ঠী ও ভাইফোঁটা। অরণ্য ষষ্ঠীর দিনই জামাই ষষ্ঠী। ওই দিন জামাইকে নিমন্ত্রণ করে শ্বশুরবাড়ি আনা হয় ও শ্বাশুড়ী ঠাকরুন জামাইকে 'বাটা' প্রদান করেন। এছাড়া, জামাইকে বিশেষ যত্ন করে আপ্যায়ন করা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই যেমন নিমন্ত্রিত হয়ে শ্বশুরবাড়ি আসেন, কার্তিক মাসে তেমনই জামাই নিমন্ত্রণ করে শ্যালক-সম্বন্ধীদের তাঁর বাড়ি নিয়ে যান, ও তাদের আদর-আপ্যায়ন করে খাওয়ান। বোন ওই দিন ভাইদের কপালে ফোঁটা দিয়ে বলেন—"ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে যেন পড়ে কাঁটা।" জামাই ষষ্ঠীতে জামাইকে 'বাটা' দান ও ভাইফোঁটার দিন ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেওয়া সব বারে হয় না। কতকগুলো বার বর্জন করা হয়। বলা বাহুল্য, এই দুই অনুষ্ঠানেই পুরোহিতের কোন ভূমিকা নেই। মেয়েরাই এতে অংশ গ্রহণ করে।

অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবারে মেয়েরা যে ইতুপূজা করে, তাও পুরোহিত ব্যতিরেকে মেয়েরাই করে থাকে। এটাও যে আদিম সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছে, তা ইতুপূজা সম্পর্কে যে উপাখ্যান আছে, তাতে উমনো-ঝুমনো, এই নাম দুটি থেকেই প্রকাশ পায়।

বাঙালী হিন্দু বিধবার পক্ষে অবশ্য-পালনীয় একটা ব্রত হচ্ছে অম্বুবাচী। আষাঢ় মাসের সাত তারিখ থেকে তিন দিন অম্বুবাচীর কাল ধরা হয়। ওই তিন দিন কোন বিধবা রন্ধন করেন না ও অগ্নিপক্ক কোন খাদ্য গ্রহণ করেন না।

অম্বুবাচী মানে বর্ষার সূচনা। নববর্ষকে অভিনন্দিত করবার জন্য ওই তিন দিন চাষবাসও বন্ধ রাখা হয়। ওই তিনদিন পৃথিবী রজস্বলা হন।

॥ চার ॥

বাঙলা নদীবহুল দেশ। সেজন্য বাঙলার লৌকিক জীবনে নদীর প্রভাব খুব বেশি। নদীর দেশে বাস করে বলেই বাঙালী মাছ খায় ও সধবা মেয়েরা হাতে শাঁখা পরে। নদীই বাঙালীকে প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ নাবিকে পরিণত করেছিল ও বাঙালীকে সাত সমুদ্দুর তের নদী অতিক্রম করে বাণিজ্য করতে সক্ষম করেছিল। আবার নদীই বাঙলাকে শস্যশ্যামলা করে তুলেছিল।

যখন আমরা চিন্তা করি যে, বাঙলা নদীবহুল ও পলিমাটির দেশ, তখন বাঙলার অর্থনীতিতে কৃষির প্রাধান্য আমরা সহজেই বুঝতে পারি। এ জন্য বাঙলা দেশের সকল জাতির (ব্রাহ্মণ পর্যন্ত) লোকই কৃষিকর্মে লিপ্ত থাকত। বাঙলার কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধানই শীর্ষস্থান অধিকার করত। বস্তুতঃ ধানের চাষ অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত জাতিসমূহের দান। ধান-চাল যে বাঙালী নিজেই খায় (ভাত, মুড়ি, খই, চিড়ে ইত্যাদি রূপে) তা নয়। তার দেবতাকেও সে নিবেদন করে। চাল-কলা না হলে ঠাকুরের নৈবেদ্যই হয় না। নবান্ন, পৌষ পার্বণ ইত্যাদি বাঙালীর পাল-পার্বণও চালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আবার এই চালের পিটুলি তৈরি করে, তা দিয়ে বাঙালী প্রকাশ করে তার নান্দনিক মননশীলতা আলপনা রেখাচিত্রে।

কদলী বা কলাও অস্ট্রিক যুগ থেকে বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। সেজন্য বাঙালী কলা নিবেদন করে তার দেবতাকে। আখের চাষ ও গুড়ের উদ্ভবও বাঙলা দেশেই হয়েছিল। পুন্ড্রবর্ধনে এক বিশেষ জাতের আখ জন্মাত ; যার নাম ছিল 'পৌন্ড্রক'। এই জাতের আখ এখন ভারতের অন্যত্রও উৎপন্ন হয়, এবং তার মৌলিক নাম অনুযায়ী তাকে 'পৌড়িয়া', 'পুড়ি' ও 'পৌড়া' নামে অভিহিত করা হয়। 'গুড়' শব্দটাও 'গৌড়' শব্দ থেকে উদ্ভূত। পাণিনী বলেছেন—"গুড়স্য অয়ং দেশঃ গৌড়"।

এটা সহজেই অনুমেয় যে, কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে কৃষির উপযোগী নানারূপ যন্ত্রাদি তৈরি করা হত। তাম্রাশ্মযুগে এ সব যন্ত্রপাতি তামা বা পাথর দিয়ে তৈরি করা হত। পরে এগুলি লৌহনির্মিত হতে থাকে। রাঢ়দেশের অরণ্য অঞ্চলে লৌহ উৎপাদন হত। এ সকল অঞ্চলে বহু লোহার খনি ছিল

এবং এই সকল অঞ্চলের লোকেরা লৌহ উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে সম্যক্‌ভাবে পরিচিত ছিল। বস্তুতঃ বীরভুম ও বর্ধমান জেলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত দেশজ প্রণালীতে লৌহ উৎপাদন হত। তা দিয়ে মোগল ও ইংরেজ আমলে কামান তৈরি করা হত। বিষ্ণুপুরের 'দলমাদল' কামান তার নিদর্শন। বস্তুতঃ ধাতুশিল্পে বাঙালীর দক্ষতা ছিল অসামান্য। তার প্রমাণ আমরা পাই ঢোকরাদের ধাতুশিল্পের নিখুঁত নৈপুণ্যে, ও স্বর্ণকারদের সোনা ও রূপার অলঙ্কার নির্মাণে। এ ছাড়া, ধাতুশিল্পীরা তৈরি করত বাসন-কোষন ও গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় অনেক কিছু জিনিস।

বাঙালীর আরও অনেক লৌকিক শিল্প ছিল। তার মধ্যে হচ্ছে কার্পাস ও রেশম জাতীয় বস্ত্রাদি যা বহন করত বাঙালী মনীষার গৌরবময় ঐতিহ্যের স্বাক্ষর। প্রতি ঘরে ঘরে সুতা কাটা হত। মাটির দেশ বাঙলায় মাটি দিয়ে তৈরি করা হত পুতুল, যার মধ্যে প্রকাশ পেত অসামান্য সজীবতা। এই শিল্পেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বাঙালীর প্রাণের দেবতাগণের প্রতিমা গঠন, ও পোড়ামাটির মন্দিরসজ্জা যাতে রূপায়িত হয়ে আছে নানা পৌরাণিক কাহিনী ও সামাজিক দৃশ্য। পটচিত্রও বাঙলার লৌকিক শিল্পের আর এক অবদান। পটে চিত্রিত করা হত নানারূপ পৌরাণিক কাহিনী, দেবদেবীর মূর্তি, পাপ পুণ্যের পরিণাম ও নানারূপ নৈসর্গিক বিষয়বস্তু। এর সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল লক্ষ্মী সরা তৈরি, যা দিয়ে বাঙালী তার শ্রী-সমৃদ্ধি-সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে পূজা করত। ছউনাচের মুখোশ ও দশাবতার তাস-ও বাঙালীর লোকসংস্কৃতির আর এক নিদর্শন। বাঙালীর নান্দনিক মননশীলতা আরও প্রকাশ পেত শাঁখের ও হাতির দাঁতের অলঙ্কারে, শোলার কাজে, কাঠখোদাইয়ের কাজে, গালার কাজে, ও আরও কত কি শিল্পে যা তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সার্থক করে তুলত। মেয়েদের অনুশীলিত আলপনা, কেশবিন্যাস ও নক্‌শী কাঁথা ইত্যাদিও বহন করত তাদের সৌন্দর্যবোধের স্বাক্ষর। বস্তুতঃ বাঙালীর লৌকিক শিল্পসমূহে অনুরণিত হত তাদের প্রাণের স্পন্দন ও আনন্দময় জীবনচর্যা। (লেখকের "ফোক্‌ এলিমেন্টস্‌ ইন বেঙ্গলী লাইফ" দ্রষ্টব্য)।

॥ পাঁচ ॥

অস্ট্রিক যুগ থেকেই বাঙালীর লৌকিক জীবনে স্থান পেয়েছিল নানারূপ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া। এখনও বাঙালী যদি দেখে রাস্তার তেমাথায় কেউ রেখে

গেছে সরায় করে জবা ফুল ইত্যাদি, তা হলে সে তা অতিক্রম করে না বা তার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। শনি-মঙ্গলবারে রাত্রিকালে বাঙালী মেয়েরা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বা ছেলে কোলে করে কখনও নিমগাছ বা বেলগাছের তলা দিয়ে যায় না। তাদের বিশ্বাস অপদেবতার দৃষ্টি লাগবে। গ্রামের লোক এখনও বিশ্বাস করে 'নিশিডাক'-এ। সেজন্য রাত্রিকালে কেউ কারুর নাম ধরে তিনবারের বেশি না ডাকলে কখনও উত্তর দেয় না। বাঙালী বিশ্বাস করে যে 'বাদুলে' (বৃষ্টির দিনে যার জন্ম) ছেলে-মেয়ের বিয়ের দিনে নিশ্চয় বৃষ্টি হবে। সেজন্য পাছে বিয়ের আনন্দ নষ্ট হয়, সেজন্য বৃষ্টি এড়াবার জন্য মেয়েরা হয় বাটনাবাটার শিল উলটে উঠানে স্থাপন করে, আর তা নয় তো কারুর বাড়ি থেকে একটা তৈজসপত্র না বলে নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখে। তাদের বিশ্বাস এরূপ করলে আর বৃষ্টি হবে না। বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দুধ তুললে গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা বিশ্বাস করে যে, কারুর নজর লেগেছে এবং তার জন্য জলপড়া খাওয়ায়। এ ছাড়া, গ্রামাঞ্চলের লোকের মনে ভুতপ্রেতের ভয়ও বিলক্ষণ। রাত্রিকালে আলগা জায়গায় কখনও ছেলেদের জামা-কাঁথা ইত্যাদি টাঙিয়ে রাখে না; পাছে অপদেবতার নজর লাগে। তা ছাড়া, 'ভূতে পাওয়া' ব্যাপারও আছে। ভূতে পেলে 'রোজা' ডাকা হয়। 'রোজা' ভূত ছাড়িয়ে দেয়। বাঙালীর লৌকিক জীবনে 'রোজা', 'গুনিন' ইত্যাদির ভূমিকা এক সময় খুব বেশি ছিল। যাঁরা প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" পড়েছেন, তাঁরা জানেন ঠক-চাচা এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

সাপে কামড়ালেও 'রোজা' ডাকা হয়। 'রোজা'র ক্ষমতা আছে সাপের বিষ ঝাড়াবার। শুনেছি, যে সাপ লোকটাকে কামড়েছে, সেই সাপটা নাকি রোজার সামনে এসে হাজির হয়। এছাড়া, কিছু চুরি গেলে বাঙালী বাটি-চালা, চালপড়া, নখদর্পণ ইত্যাদির আশ্রয় নেয়। বাটিচালায় বাটি নাকি অপরাধীর কাছে গিয়ে হাজির হয়। চালপড়াতে যে চুরি করেছে তার থুতুর সংগে রক্ত দেখা দেয়। নখদর্পণে কালি-লাগানো বুড়ো আঙুলের মধ্যে অপরাধীকে দেখা যায়।

এছাড়া বাঙালীর লৌকিক জীবনে স্থান পেত, বা এখনও গ্রামাঞ্চলে পায়, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, মারণ ইত্যাদিতে বিশ্বাস। এসবের প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি বিশদরূপে বর্ণনা করা আছে আমার "ফোক এলিমেন্টস্ ইন বেংগলী লাইফ" বইয়ে (ইন্ডিয়ান পাবলিকেশনস্, ১৯৭৪)। এ

সব মন্ত্রাদি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে এগুলো সবই প্রাক-আর্যকালের।

আর্যপুরোহিতরাও কোন কোন ক্ষেত্রে, আদিম যুগের এ-সব প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করেছিল। সেটা 'অথর্ববেদ' পড়লে বুঝতে পারা যায়। তা ছাড়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি সেই আদিম যুগের পদ্ধতিরই ফলশ্রুতি। এছাড়া, বিরুদ্ধ গ্রহের প্রশমনের জন্য কয়েকটি গাছের মূল, ধাতু ও রত্নও ব্যবহার করা হয়। কতকগুলি বীজমন্ত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক বার প্রতিদিন জপ করার ব্যবস্থাও আছে। এগুলির কোনটাই মৌলিক আর্যসংস্কৃতির অবদান নয়।

বলা বাহুল্য, বাঙালীর লৌকিক জীবনে এই সকল ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি, আদিম সমাজ কর্তৃক অনুসৃত 'সদৃশ-বিধানী' ও 'সংস্পর্শ-বিধানী' ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আদিম সমাজে 'সদৃশ-বিধানী' ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া বলতে বুঝায় সদৃশ প্রক্রিয়ার দ্বারা সদৃশ উদ্দেশ্য সাধন করা। যেমন কারুকে মারতে হলে, তার একটা মৃন্ময় পুত্তলিকা তৈরি করে তার বুকে একটা কাঁটা ফুটিয়ে দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস এর ফলে শত্রু বিনষ্ট হবে। আর 'সংস্পর্শ-বিধানী' ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় অপরের ব্যবহৃত কোন জিনিস (যেমন শাড়ির একটা কোণ বা ছেলের কাঁথার একটা অংশ) এনে, তার ওপর ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করলে, তার অনিষ্ট হবে।

॥ ছয় ॥

বাঙালীর লৌকিক জীবনে তুলসীর প্রভাব খুব বেশি। বাঙালীর কাছে তুলসী গাছ অত্যন্ত পবিত্র। বাঙালীরা মনে করে তুলসী যেখানে থাকে, হরিও সেখানে থাকে। সেজন্য বাঙালী বাড়িতে তুলসীমঞ্চ তৈরি করে। তুলসী পাতা না হলে নারায়ণের পূজা হয় না। শ্রাদ্ধাদি কাজও হয় না। আবার তুলসীপাতা না হলে 'মৃতে দোষপ্রাপ্তি' কাটানো যায় না। শপথ করতে গেলেও তামা ও তুলসীর দরকার হয়। মুমূর্ষুকে তুলসীতলায় শোয়ানো হয়। বৈষ্ণবেরা আবার তুলসীকাঠের কণ্ঠী ব্যবহার করে। তুলসীর এই মাহাত্ম্যের জন্য তুলসীতলা পরিষ্কার রাখা হয় ও সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দেওয়া হয়। কিন্তু সধবা মেয়েরা তুলসীপাতা তোলে না। কেন? উত্তর ঠিক জানি না। তবে মনে হয়, পৌরাণিক উপাখ্যানে তুলসীর সতীত্বনাশের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। উপাখ্যানটা কিন্তু বিভিন্ন পুরাণে

বিভিন্ন রকম দেওয়া আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুযায়ী নারায়ণ তুলসীর স্বামী সংখচূড়ের রূপ ধারণ করে তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করেছিলেন। আবার পদ্মপুরাণ অনুযায়ী বিষ্ণু বৃন্দারূপী তুলসীর স্বামী জলন্ধরের রূপ ধারণ করে এই অপকর্ম করেছিলেন।

ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথিকে নষ্টচন্দ্র বলা হয়। ওই দিন চাঁদ দেখা নিষিদ্ধ, কেননা পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী ওই দিন চন্দ্র গুরুপত্নীকে ধর্ষণ করেছিলেন। ওই দিন গৃহস্থের বাড়ি থেকে ফলমূল চুরি করার প্রথা আছে। কেউ এটা দোষ মনে করে না।

আগে কার্তিক মাসে আকাশ-প্রদীপ দেওয়ার রীতি ছিল। এখন শহরে এটা উঠে গেছে। গ্রামে কোন কোন জায়গায় আছে।

সবশেষে কয়েকটা লৌকিক দেবতার কথা বলব। এদের মধ্যে আছে বারামুণ্ড কালুরায়, গাজী, বনবিবি, ক্ষেত্রপাল, বাস্তুঠাকুর, দক্ষিণরায় প্রভৃতি। বারা ধড়হীন মনুষ্যমূর্তি; আর দক্ষিণরায় বাঘ বা ঘোড়ায় চাপা দিব্য দেবতামূর্তি।

বারার পূজা হয় চব্বিশ পরগনায় পৌষসংক্রান্তি বা পয়লা মাঘ—বনে বা নদীর ধারে বা গাছতলায় বা ক্ষেতের আলে। অনেক জায়গায় এক পুরুষ-বারার পাশে, এক জলঘটকে স্ত্রীবারার প্রতীক হিসাবে রাখা হয়। আবার অন্যত্র স্ত্রী-পুরুষ যুগ্মমূর্তি স্থাপন করা হয়। এটা যে জাদুবিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত লৌকিক উর্বরতা বা সুফলন বর্ধক পূজা সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

॥ সাত ॥

বাঙালীর লৌকিক জীবনকে আনন্দময় করে রেখেছিল তার নিজস্ব খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ। ঘরের বাইরের খেলার মধ্যে ছিল কাবাডি, কুস্তি, লাঠিখেলা, সাঁতার, নৌকার বাইচ ইত্যাদি। আর ঘরের ভিতরের খেলার মধ্যে ছিল দাবা, পাশা, গুটিখেলা, দশ পঁচিশ, কড়ি খেলা ও তাসের বিন্তি ও রঙের খেলা। এ ছাড়া, ছেলেমেয়েরা খেলত লুকোচুরি, কানামাছি, এক্কা-দুক্কা ইত্যাদি।

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে লৌকিক জীবনে স্থান পেত যাত্রা, পুতুল নাচ, ভোজবাজী ইত্যাদি। এ ছাড়া ছিল নানা রকমের সংগীত অনুষ্ঠান। বাঙালীর

সমস্ত লৌকিক জীবনটাই ছিল গানে ভরা। ছেলে হলে মেয়েরা গান গাইত। গান গেয়ে মায়েরা ছেলেদের ঘুম পাড়াতো। বিয়ে বা অন্য শুভানুষ্ঠানেও মেয়েরা গান গাইত। মরে গেলেও লোককে শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাওয়া হত সংকীর্তন গান গেয়ে। তারপর তার শ্রাদ্ধের সময়ও নামকীর্তন করা হত।

মধ্যযুগে বাঙালীর লৌকিক জীবনে পালাগান খুব জনপ্রিয় ছিল। এ সকল পালাগান গাওয়া হত মনসা, ধর্মঠাকুর, গম্ভীরা, শীতলা, চণ্ডী, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিকে আশ্রয় করে। রাতের পর রাত এ সকল পালাগান গ্রামবাসীদের মুগ্ধ করে রাখত। পালাগান ছাড়া, পাঁচালী গানও খুব জনপ্রিয় ছিল। পাঁচালী গানে মূল গায়েন পায়ে নূপুর পরে ও এক হাতে চামর ও অপর হাতে মন্দিরা নিয়ে, নাচতে নাচতে গান করে যেত। পাঁচালী গানের নিজস্ব ছন্দ ও রচনাশৈলী ছিল। এ ছাড়া গ্রাম্যজীবনে ছিল কথকতা। কথক ঠাকুর নিজ আসনে বসে পৌরাণিক কাহিনীসমূহ বিবৃত করতেন, আর মাঝে মাঝে গান গাইতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলায় কবিগানও খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কবিগানের উৎপত্তি সম্বন্ধে একাধিক মত আছে। এক মত অনুযায়ী এগুলো বৈষ্ণব পদাবলী থেকে উদ্ভুত হয়েছিল। অন্য মত অনুযায়ী সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ঝুমুর ও ধামালী গান থেকে উদ্ভুত। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিওয়ালাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল গোঁজলা গুঁই, লালু নন্দলাল, রামজী, রঘুনাথ দাস, কেষ্ট মুচি, রাসু, নৃসিংহ, হারুঠাকুর, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, এন্টনী ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা, ভবানী বণিক প্রমুখ। কবিগান ছিল গানের লড়াই। এতে দুই পক্ষ যোগদান করত।

কবিগানের সাধারণতঃ চারটে অংশ থাকত—ভবানী-বিষয়, সখী-সংবাদ, বিরহ ও খেউড়। খেউড়ের মধ্যে আদি-রসাত্মক অনেক গান থাকত। এক পক্ষ অনেক সময় গানের মাধ্যমে অপর পক্ষকে গালি-গালাজও করত। কবিগান মুখে মুখে রচনা করা হত। এর জন্য একজন বাঁধনদার থাকত। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ হাফ-আখড়াই গানের অভ্যুদয়ের পর কবিগানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়।

বাঙালীর লৌকিক জীবনে তরজা গানেরও জনপ্রিয়তা ছিল। তরজাও গানের লড়াই। এতে এক পক্ষ প্রশ্ন করত, অপর পক্ষ তার উত্তর দিত—সবই গানের মাধ্যমে।

যাত্রাভিনয়ও খুব জনপ্রিয় ছিল। যাত্রাভিনয়ের মধ্যে থাকত কথোপথন ও গান। এর জন্য কোন মঞ্চ তৈরি করা হত না। মাটির ওপরই কাপড় বিছিয়ে আসর তৈরি করা হত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত কলকাতার লোকের কাছে যাত্রাভিনয় বেশ আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিল। তারপর থিয়েটারের চাপে যাত্রাভিনয় গ্রামের আস্তানার মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে পড়ে। গ্রামের জমিদাররাই এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু জমিদারী বিলোপের পর যাত্রাগানের জনপ্রিয়তা গ্রামে কমে গিয়েছে। এখন যাত্রাভিনয়কে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। আগে পুরুষরাই মেয়ে সেজে মেয়েদের ভূমিকা অভিনয় করত। এখন মেয়েরাই মেয়েদের ভূমিকা গ্রহণ করে।

ধর্মীয় চেতনার 'যাদুঘর'

বর্ধমান জেলার উত্তরে ত্রিভুজাকার যে ভূখণ্ড আজ বীরভূম নামে পরিচিত, তাকে আমরা বাঙলার ধর্মীয় সাধনার 'যাদুঘর' বলে অভিহিত করতে পারি। বহু ধর্মেরই এখানে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং বীরভূমের বিচিত্র ভূপ্রকৃতি তার সহায়ক হয়েছে। পশ্চিমে বিন্ধ্যপর্বতের পাদমূল থেকে যে তরঙ্গায়িত মালভূমি পূর্বদিকে ভাগীরথী-স্নাত পলিমাটির দেশের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, তা বীরভূমকে বিভক্ত করে দিয়েছে দুই ভাগে—পশ্চিমে বনজঙ্গল পরিবৃত রূক্ষ ও কর্কশ অঞ্চল, ও পূর্বে কোমল রসাল সমতলভূমি। বীরভূমের বনজঙ্গলের মধ্যেই ছিল বহু মুনিঋষির তপোবন। যেমন ভাণ্ডীরবনে ছিল বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম, শিয়ানে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির, শীর্তল গ্রামে সন্দীপন ঋষির, গর্গমুনির ও দুর্বাশা মুনির। বনজঙ্গলের শাশ্বত নির্জনতা বীরভূমকে গড়ে তুলেছিল ধর্মীয় সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্ররূপে। এ জন্যই শাক্তধর্মের লীলাকেন্দ্র হিসাবে বীরভূমের প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ শাক্তধর্মের লীলাকেন্দ্র হিসাবে বীরভূমের (এড়ু মিশ্রের উক্তি অনুযায়ী এর নাম ছিল কামকোটি) তুলনা আর কোথাও নেই। তন্ত্রবর্ণিত মহাপীঠসমূহের মধ্যে বীরভুমে যত মহাপীঠ আছে, তত মহাপীঠ বাঙলার তো দূরের কথা, ভারতের আর কোথাও নেই। বীরভুমের প্রায় প্রত্যেক শহরের কাছেই সতীর দেহাংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি করে শাক্তপীঠ আছে। যথা বক্রেশ্বর, কঙ্কালীতলা, লভপুর, ফুলবেড়িয়া, নলহাটি, বৈদ্যনাথধাম (১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে বীরভুমের অন্তর্ভুক্ত ছিল), তারাপীঠ ইত্যাদি। এদের মধ্যে তারাপীঠের সিদ্ধপীঠই প্রসিদ্ধ।

আবার বীরভূমের কোমল অঞ্চল সমূহে গড়ে উঠেছিল মধুর বৈষ্ণবধর্মের পুণ্যস্থান সমূহ। যথা জয়দেবের কেঁদুলী, চণ্ডীদাসের নানুর, একচক্রাপুরে নিত্যানন্দ প্রভুর সাধনক্ষেত্র।

বীরভূমের গ্রামাঞ্চল সমূহে গ্রামদেবতা ধর্মরাজের পূজারও বহুল প্রচলন আছে। এ ছাড়া, মনসাদেবীর পূজার উদ্ভব বীরভূমেই হয়েছিল বলে মনে হয়। বাউল সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাবও বীরভূমে খুব বেশি।

জৈনধর্মের উত্থানও বীরভূমের আশপাশেই ঘটেছিল, কেননা, মহাবীরের পূর্বগামী ২০ জন তীর্থঙ্করকে সমেতশিখর বা পরেশনাথ পাহাড়ে সমাধিস্থ

করা হয়েছিল। পরেশনাথ পাহাড় বীরভূমের সীমান্তরেখা থেকে মাত্র ৭০ মাইলের মধ্যে। সুতরাং এ সকল তীর্থঙ্কর যে বীরভূমের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হয়তো, মহাবীরের মত তাঁরাও বীরভূমে এসেছিলেন। মহাবীর যখন বীরভূমে এসেছিলেন, তখন এর নাম ছিল বজ্জভূমি। বোধ হয়, মাটির কঠিনতার জন্যই একে বজ্জভূমি (বা বজ্রভূমি) বলা হত।

বীরভূমের নানাজায়গা থেকে পওয়া গিয়েছে বৌদ্ধ বজ্রযান (বা কালযান) দেবদেবীর মূর্তি। এ থেকে বীরভূমে বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবও বুঝা যায়। বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাব বিশেষ করে ঘটেছিল পালরাজগণের সময়। সেটা খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীর ব্যাপার। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বীরভূমের সম্পর্ক, একেবারে বুদ্ধের জীবনকাল থেকে। কেননা, বৌদ্ধগ্রন্থ 'দিব্যাবদান' থেকে আমরা জানতে পারি যে, গোতম বুদ্ধ বীরভূম অতিক্রম করেই পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত গিয়েছিলেন। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বীরভূম যে মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, তারনাথ তাঁর 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন যে কিংবদন্তী অনুযায়ী সম্রাট অশোকের পিতা বিন্দুসারের জন্ম হয়েছিল গোড়দেশে। এ ছাড়া, মহাস্থানের এক লিপি থেকেও আমরা জানতে পারি যে, পুণ্ড্রবর্ধন তখন মৌর্য সাম্রাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ বীরভূম অঞ্চলে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখে গেছেন যে, সে সময় বীরভূমে বহু বৌদ্ধবিহার ছিল। বস্তুতঃ বাঙলা-দেশ মুসলমান কর্তৃক বিজিত হওয়ার সময় পর্যন্ত, বীরভূমে এই সকল বৌদ্ধ-বিহারের অস্তিত্ব ছিল। বাঙলা বিজয়ের সময় মুসলমানগণ রাজমহলের পথ দিয়ে বীরভূমের ওপরই প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারা বৌদ্ধদের মঠ, বিহার ও মূর্তিসমূহ ধ্বংস করায়, বৌদ্ধরা তিব্বত ও নেপালে পালিয়ে যায়। তখন থেকেই বীরভূমের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ছেদ ঘটে।

॥ দুই ॥

আমরা আগেই বলেছি যে, বীরভূম হচ্ছে তন্ত্রধর্মের লীলাকেন্দ্র। তন্ত্রধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানামত প্রচলিত আছে। হিন্দুরা বলেন যে, তন্ত্রধর্মের বীজ বৈদিক ধর্মের মধ্যেই নিহিত ছিল। আর বৌদ্ধরা দাবি করেন যে, তন্ত্রের মূল ধারণাগুলি ভগবান বুদ্ধ যে সকল মুদ্রা, মন্ত্র, মণ্ডল, ধারণা,

যোগ প্রভৃতির প্রবর্তন করেছিলেন, তা থেকেই উদ্ভূত। এ দুটির কোনটাই ঠিক নয়। তন্ত্রধর্ম প্রাগার্য বা অনার্য ধর্ম। মনে হয় তন্ত্রধর্মের আসল উৎপত্তি সম্বন্ধে 'সূত্রকৃতঙ্গ' নামে এক প্রাচীন জৈনগ্রন্থ বিশেষ আলোকপাত করে। এটা সকলেরই জানা আছে যে, তন্ত্রের আচার, অনুষ্ঠান ও পদ্ধতি অত্যন্ত গূঢ় এবং উক্ত প্রাচীন জৈনগ্রন্থ অনুযায়ী গূঢ় সাধন-পদ্ধতি শবর, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ ও গৌড়দেশবাসীদের এবং গন্ধর্বদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। মনে হয় এই জৈন গ্রন্থের কথাই ঠিক, কেননা, তান্ত্রিক সাধন-সদৃশ ধর্মপদ্ধতি পূর্বভারতের প্রাক বৈদিক জনগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, এবং উহাই 'ব্রাত্যধর্ম' বা তৎসদৃশ কোন ধর্ম হবে। পরে বৌদ্ধ ও হিন্দুরা যখন উহা গ্রহণ করেছিল, তখন তারা দার্শনিক আবরণে তাকে মণ্ডিত করেছিল। বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের ওপর অনার্য-সম্প্রদায় যে এক গভীর ছাপ রেখে গেছে, তা আমরা পর্ণশবরী, জাগুলী, চৌরী, বেতালী, ঘস্মরী, পুক্কসী, শবরী, চণ্ডালী, ডোম্বী ইত্যাদি বজ্রযান মণ্ডলের দেবীগণের নাম থেকেই বুঝতে পারি। এ সম্বন্ধে বক্রেশ্বরের বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধু অঘোরীবাবা যা বলেছিলেন, তা-ও এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন—"বেদের উৎপত্তির বহু শতাব্দী পূর্বে তন্ত্রের উৎপত্তি। তন্ত্র মন্ত্রমূলক নয়, ক্রিয়ামূলক। অনার্য বলে আর্যরা যাদের ঘৃণা করতেন, সেই অনার্যদের ভাষাতেই তন্ত্রের যা কিছু ব্যবহার ছিল। পুথিপুস্তক তো ছিলই না, বেদের মতই লোকপরম্পরায় মুখে মুখে তার প্রচার ছিল। সাধকদের স্মৃতির ভিতরেই তা বদ্ধ ছিল। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতির নাম-গন্ধও ছিল না। কারণ, তন্ত্রের ব্যবহার যে-সব মানুষকে নিয়ে, তার মধ্যে জাত কোথায়? সাধারণ মানুষের ধর্মকর্ম নিয়েই তো তন্ত্রের সাধন, তন্ত্রের জগতে বা অধিকারে ঘৃণার বস্তু বলে কিছু নেই। শবসাধন, পঞ্চমুণ্ডি-আসন, মদ্য-মৎস্য-মাংসের ব্যবহার—এ সবই তো তন্ত্রের, আর্য-ব্রাহ্মণদের ধারণায় ভ্রষ্টাচার। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণরা যতদিন বাঙলায় আসেন নি, ততদিন তাঁদের এ ভাবের যে একটি ধর্মসাধন আছে, আর সেই ধর্মের সাধন-প্রকরণ তাঁদেরই একদল গ্রহণ করে ভবিষ্যতে আর একটি ধর্ম গড়ে তুলবেন, একথা কল্পনায়ও আনতে পারেন নি। তারপর তন্ত্রের ধর্মগ্রহণ করে ক্রমে ক্রমে তাঁরা অনার্যই হয়ে পড়লেন—তাঁদের বৈদিক ধর্মের গুমোর আর কি রইল?"

॥ তিন ॥

দেবীর দেহাংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ বক্রেশ্বর। শাক্ত পীঠস্থানসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে 'পীঠনির্ণয়'-তন্ত্রে যে বর্ণনা আছে, সেই বর্ণনা অনুযায়ী এখানে দেবীর ভ্রূমধ্য পতিত হয়েছিল। কিন্তু 'শিবচরিত' অনুযায়ী এখানে পড়েছিল দেবীর দক্ষিণ বাহু। অষ্টাবক্র মুনি এখানেই তাঁর সাধনা লাভ করেছিলেন। তাঁর সাধনায় প্রীত হয়ে শিব তাঁকে বর দিয়েছিলেন—'আজ থেকে আমার ভক্তগণ এখানে আমার পূজা করবে এবং তোমার নাম অনুযায়ী এর নাম হবে বক্রেশ্বর।'

বক্রেশ্বরের সঙ্গে অষ্টাবক্র মুনির সম্পর্ক সম্বন্ধে দুটি প্রবাদ-কাহিনী প্রচলিত আছে। একটি কাহিনী অনুযায়ী সত্যযুগে বিষ্ণু নরসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হন, এবং তাঁর হস্তপদযুগে ভীষণ জ্বালা উপস্থিত হয়। অষ্টাবক্রমুনি বিষ্ণুর এই জ্বালা নিজ মস্তকে ধারণ করলে, তিনি এই জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মুনিকে বক্রেশ্বর শিবের মস্তক স্পর্শ করতে বলেন, এবং ভারতের সকল তীর্থের তীর্থবারিকে সুড়ঙ্গপথে প্রবাহিত হয়ে তাঁর মস্তকে পতিত হতে নির্দেশ দেন। এই স্রোতধারাই 'পাপহরা' নামে প্রসিদ্ধ।

অপর কাহিনী অনুযায়ী একদা লক্ষ্মীর স্বয়ংবর সভায় সুবিবত ও লোমশ নামে দুই ঋষি নিমন্ত্রিত হন। স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হলে, নিমন্ত্রণ-কর্তা ও দেবরাজ পুরন্দর সর্বাগ্রে লোমশ ঋষিকে বিশেষ সমাদরে গ্রহণ ও আপ্যায়ন করেন। এই দেখে তাঁর সহচর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে সভাগৃহ ত্যাগ করেন। তিনি এমন ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হন যে, তাঁর দেহের আট জায়গা বক্রতা লাভ করে। এর ফলে সকলে তাঁকে অষ্টাবক্র নামে অভিহিত করতে থাকে। মনের ক্ষোভে ও অশান্ত হৃদয়ে অষ্টাবক্র নানা জায়গায় পরিভ্রমণ করে অবশেষে কাশী বা বারাণসীতে এসে পৌঁছান। শিবকে তুষ্ট করে তিনি তাঁর দেহের বক্রতা দূর করবার সিদ্ধান্ত নেন। শিব তাঁকে বলেন যে তাঁর প্রার্থনার কোন ফল পাওয়া যাবে না, যতক্ষণ না তিনি পূর্বদিকে গিয়ে গৌড়দেশে গুপ্তকাশীতে শিবের কাছে তাঁর প্রার্থনা জানাচ্ছেন। তখন তিনি বক্রেশ্বরে এসে শিবের উপাসনা ও তপস্যা করেন। ভক্তের অনন্যসাধারণ সাধনায় তুষ্ট হয়ে, শিব অষ্টাবক্রের বক্রতা দূর করেন, এবং বলেন এখন থেকে যারা এখানে এসে আমার পূজা করবে, তাদের প্রথমেই অষ্টাবক্রের অর্চনা করতে হবে।

সিদ্ধপীঠ হিসাবে বক্রেশ্বর-এর প্রসিদ্ধি। কঠিন কঠিন তান্ত্রিক সাধনের জন্য এক সময় উত্তর ভারতের নানা স্থান থেকে সাধকেরা এখানে আসতেন। বহু সাধকের যে এখানে সমাবেশ হত, তার নিদর্শন রয়েছে এক বিশালকায় শমীবৃক্ষের তলে এক উচ্চ প্রকাণ্ড গোলাকার বেদী। ওই বেদীতে বহু সাধক যে একসঙ্গে বসে সাধনা করতে পারতেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তান্ত্রিক সাধনভজনের জন্য যে বহু সাধক-সাধিকা একসময় এখানে বাস করতেন, তারও নিদর্শন রয়েছে মন্দিরের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ইষ্টক-নির্মিত আবাসগৃহ সমূহের ধ্বংসাবশেষ। তা থেকে মনে হয় যে, বক্রেশ্বর একসময় বীরভূমের খুব জনবহুল ও জনপ্রিয় মহাতীর্থ ছিল।

॥ চার ॥

যদিও উভয় পীঠস্থানই দেবীর দেহাংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা হলেও বক্রেশ্বরের ভৈরব যেমন প্রসিদ্ধ, তারাপীঠের ভৈরবী তারাদেবী তেমনই প্রসিদ্ধা। তা ছাড়া, বামাক্ষ্যাপার সাধনক্ষেত্র হিসাবে তারাপীঠ সিদ্ধপীঠ হিসাবে পরিচিত।

প্রথম যখন তারাপীঠ যাই, তখন যে জিনিসটা আমাকে প্রথম আকৃষ্ট করেছিল, সেটা হচ্ছে যে তারাদেবীর মন্দিরে যেতে হলে, রাস্তা থেকে অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে তবে মন্দিরের প্রাঙ্গণে উঠতে হয়। তারপর মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে, আবার সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরের চাতালে উঠতে হয়। এই দেখে আমার ধারণা হয়েছিল যে তারাদেবীর মন্দির এক সময় কোন ছোট পাহাড়ের ওপর স্থাপিত ছিল। স্থানীয় লোকের কাছে এ জিনিসটা অজ্ঞাত, কেননা অনেককেই প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু এ-বিষয়ে কেউই আমাকে কোন তথ্য সরবরাহ করতে পারে নি। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে পুরাতন রেকর্ডসমূহ অন্বেষণ করতে করতে জানতে পারি যে আমার অনুমানই ঠিক। পুরানো রেকর্ডে পরিষ্কার লেখা আছে যে তারাদেবীর মন্দির একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের (hillock) ওপর অবস্থিত। তবে ওটা সত্যই কোন ক্ষুদ্র পাহাড় কি, কোন প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ তা বলা কঠিন। কারণ, প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষ বক্রেশ্বরেও বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি। মনে হয়, সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে তারাপীঠ তারা-সাধনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। আগেকার দিনে মহাশ্মশানগুলিই তান্ত্রিক সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র ছিল, এবং তারাপীঠ মহাশ্মশানের মধ্যেই অবস্থিত।

তারাপীঠ স্থানটি বহুদিন অপ্রচারিত ছিল। কথিত আছে যে, জয়দত্ত নামে গন্ধবণিক সমাজভুক্ত এক সদাগর দ্বারকানদী দিয়ে বাণিজ্যে যাচ্ছিলেন। সংগে তাঁর একটি পুত্র ছিল। পুত্রটি পথিমধ্যে মারা যায়। পরে জীবকুণ্ডের জল স্পর্শ করালে, ছেলেটি আবার জীবিত হয়। এর কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে, তিনি তারা-মায়ের মূর্তি দেখেন। তখন তাঁরা বিশেষ উপচারে তারা-মায়ের পুজা করেন। পরে সদাগর পীঠস্থানের সংস্কার করেন। সেই থেকেই তারাপীঠের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়। তবে তারাপীঠের বর্তমান মন্দির নাটোরের মহারানী কর্তৃক নির্মিত হয়। পরে ব্রজবাসী কৈলাসপতি, বামাক্ষ্যাপা ও নাটোরের মহারাজার সাধনক্ষেত্র হিসাবে তারাপীঠের মাহাত্ম্য আরও প্রচারিত হয়।

অনেকেরই বোধ হয় জানা নেই যে, তারাপীঠে গিয়ে তাঁরা তারা-মায়ের যে মূর্তি দেখেন সেটা মায়ের আসল মূর্তি নয়। আসল মূর্তিটি পাথরের তৈরি। তার গঠন-শৈলী দেখে মনে হয় যে, মূর্তিটি খ্রীস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিল। এই পাথরের মূর্তিটিকে ঢাকা দেওয়া আছে, বর্তমান মূর্তির আবরণ দ্বারা। পাথরের মূর্তির রূপও অন্যরূপ। এই পাথরের মূর্তিটি দেখবার সুযোগ সকলের ঘটে না। বাহ্যিক মূর্তিটি উন্মোচন করা হয়, মাত্র দেবীকে স্নান করাবার সময়। সেই সময় পাথরের মূর্তিটিকেই স্নান করান হয়। সে সময় মাত্র দু-একজন বিশিষ্ট যাত্রীকে মায়ের আসল মূর্তিটি দর্শন করবার সুযোগ পাণ্ডারা দেয়। পাথরের মূর্তিটি মুণ্ডহীন। মুসলমান আমলে হিন্দুদ্বেষী মুসলমানরা মুণ্ড ভেঙে দিয়েছিল। দেবী একটি শায়িত মূর্তির ওপর উপবিষ্টা।

তারার প্রথম প্রকাশ পায়, দক্ষযজ্ঞের পূর্বে দেবী যখন দশমহাবিদ্যা রূপ ধারণ করেন। তারপর বিষ্ণুচক্র দ্বারা ছিন্ন হবার পর দেবীর আটটি দেহাংশ পড়ে বীরভূমে। দেবীর নয়নতারা পড়েছিল চীনদেশে। বশিষ্ঠমুনি ওই নয়নতারা চীনদেশ থেকে এনে তারাপীঠে স্থাপন করেন, এবং সেখানে তাঁর ধ্যান-জপ করে সিদ্ধিলাভ করেন।

তারার উপাসনা মহাচীন থেকে আনা হয়েছিল বলে বৌদ্ধ বজ্রযান দেবীকুলে তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল মহাচীনতারা। উগ্রতারা নামেও তাঁকে অভিহিত করা হত।

মনে হয়, বজ্রযান (অপর নাম কালযান বা সহজযান) বীরভূমেই উদ্ভূত হয়েছিল। এ অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রধর্মের

বিকাশ বীরভূমে সমানভাবেই হয়েছিল। সুতরাং তারার ধ্যান-কল্পনায় যে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান ঘটেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

॥ পাঁচ ॥

বীরভূমের ন্যায় এত বেশি শাক্তপীঠ আর কোথাও নেই। বক্রেশ্বর ও তারাপীঠে দেবীর দুই দেহাংশ পড়েছিল। বক্রেশ্বরের অদূরে ফুলবেড়িয়ায় পড়েছিল দেবীর দাঁত। সেজন্য ফুলবেড়িয়ায় আছে দেবী দন্তেশ্বরী। ওখানে তাঁর ভৈরব হচ্ছে মহাদেব ফুলেশ্বর। পূর্বদিকে চলে আসুন বোলপুরে। বোলপুরের চার মাইল উত্তর-পূর্বে হচ্ছে কঙ্কালীতলা। এখানে পড়েছিল দেবীর কংকাল, এখানে আছে দেবী কঙ্কালীর মূর্তি। এখানে তাঁর ভৈরব হচ্ছেন রুরু। কঙ্কালীতলার উত্তরে চলে আসুন লাভপুরে। তার পূর্বপ্রান্তে আছে ফুল্লরা মহাপীঠ। তন্ত্রে তার নাম দেওয়া হয়েছে অট্টহাস। এখানে আছেন দেবী ফুল্লরা ও তাঁর ভৈরব বিশ্বনাথ। কিন্তু প্রাণতোষিণীতন্ত্র মতে দেবী চামুণ্ডা ও তাঁর ভৈরব মহানন্দ। এখানে অন্যান্য উপকরণের মধ্যে, সুরা না দিলে দেবীর ভোগ হয় না।

বোলপুর থেকে পূবে চলে যান চণ্ডীদাস নানুরে। এটাও একটা শাক্তপীঠ। সেখানে আছেন দেবী বিশালাক্ষী। শায়িত মহাদেবের নাভিদেশ থেকে উদ্গত কমলে দেবী ললিতাসনে আসীনা।

এবারে উত্তরে আসুন তারাপীঠের কাছে রামপুরহাটে। রামপুরহাট থেকে উত্তরে চলে যান নলহাটীতে। নলহাটীতে পড়েছিল দেবীর কণ্ঠের নলী। এখানে আছেন দেবী ললাটেশ্বরী ও তাঁর ভৈরব মহাদেব।

বস্তুতঃ আমরা বীরভূমের নানা জায়গায় দেখতে পাই দেবীর বিভিন্ন মূর্তি। বক্রেশ্বরে আছেন দেবী মহিষমর্দিনী, ফুলবেড়িয়ায় দন্তেশ্বরী, কঙ্কালীতলায় কঙ্কালীদেবী, লাভপুরে ফুল্লরা, নানুরে বিশালাক্ষী, তারাপীঠে তারাদেবী, ও নলহাটীতে ললাটেশ্বরী। বাঙলার অন্যান্য জেলাতেও আমরা দেখতে পাই দেবীর অনেক পীঠস্থান, কিন্তু বীরভূমের মত দেবীর দেহাংশের দ্বারা পূত এতগুলো পীঠস্থান আর কোথাও পাই না। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে ভারতে তান্ত্রিক ধর্মবিকাশের ইতিহাসে বীরভূমের এক সময় খুব অর্থবহ ভূমিকা ছিল। তান্ত্রিক সাধনার জন্য একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে নির্জনতা। বীরভূমের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আছে সেই

নির্জনতা। বীরভূমের এই নির্জনতাই আকৃষ্ট করেছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্রহ্মোপাসনার জন্য তাঁর আশ্রম স্থাপন করতে বোলপুরে।

বীরভুমে যে মাত্র দেবীর পীঠস্থানেরই ছড়াছড়ি তা নয়, বীরভূম হচ্ছে শিবের দেশ। বীরভুমের মাঠে ঘাটে, শহরের সন্নিকটে ও শ্মশানে আছে অসংখ্য শিবমন্দির বা শিবস্থান। দক্ষিণ-পশ্চিমে বক্রেশ্বর ও ফুলেশ্বর ছাড়া, আর অনেক জায়গাতেই শিবঠাকুর দেখতে পাওয়া যায়। দুবরাজপুরে, অর্থাৎ যেখান দিয়ে বক্রেশ্বর ও ফুলেশ্বরে যেতে হয়, তারই অনতিদূরে পাহাড়ের পাদমূলে দেখতে পাওয়া যায় এক শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ। এখানে মহাদেবকে বলা হয় পাহাড়েশ্বর বা পাহাড়ের অধিপতি। এখানে এক খণ্ড শিলা-ই পূজিত হন দেবতার প্রতীকরূপে। কথিত আছে যে, এই শিলাখণ্ড এক সময় পাহাড়ের শীর্ষদেশে ছিল, এবং ভক্তদের পূজা করতে হত পাহাড়ের পদতলে, পাহাড়ের শীর্ষদেশস্থ দেবতার দিকে ঊর্ধ্বনয়নে তাকিয়ে। একদিন এক প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের দিনে শীর্ষদেশস্থ ওই প্রস্তরখণ্ড পড়ল মূল পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে। তাতে একজন ভক্ত পুরোহিতের প্রাণনাশ ঘটল। এই ঘটনাকে নির্দেশ করে লোকে বলল, মহাদেবের ইচ্ছা পাহাড়ের কোলেই তাঁর এক মন্দির নির্মিত হোক, যাতে ভক্তদের তাঁকে আরাধনা করার জন্য ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আর ঘাড় ব্যথা করতে না হয়। কথাটা গিয়ে পৌঁছাল দুবরাজপুরের রাজা শঙ্কররাজের কানে। তিনিই ওই ভূপতিত শিলাখণ্ডের ওপর নির্মাণ করে দিলেন এক মন্দির। সেই থেকে শিবরূপেই তিনি পূজিত হতে লাগলেন। এ সম্বন্ধে আর এক কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, শিলাখণ্ড যখন পাহাড়ের শীর্ষদেশে ছিল, তখন এক ভক্তকে প্রতিদিনই পাহাড়ের উপরে উঠে পূজা করতে যেতে হত। যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর পক্ষে পাহাড়ের ওপরে ওঠা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল, তখন শিবই একদিন ভূপতিত হয়ে নিজেই নেমে এলেন নীচে ভক্তের পূজা গ্রহণ করবার জন্য। সেই রাত্রিতেই তিনি স্বপ্নে আবির্ভূত হলেন ভক্তের সামনে। তিনি বললেন—"তুই বুড়ো হয়ে পড়েছিস, ওপরে উঠতে তোর কষ্ট হচ্ছে, সেজন্য আমি নীচে অবতরণ করেছি, তুই শিগ্গির আমার এক মন্দির তৈরি করে দে।"

এই যে প্রস্তরখণ্ডসমূহ যাকে আমরা পাহাড় বলছি, তার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি হচ্ছে এই যে, সেতুবন্ধের জন্য রামচন্দ্র যখন হিমালয় থেকে প্রস্তরখণ্ড আনছিলেন, তখন নাড়া পেয়ে কিছু

পাথর দুবরাজপুরে পড়েছিল, সেই পাথরগুলো থেকেই এই পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে।

দুবরাজপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হচ্ছে ভীমগড়। ভীমগড় অজয় নদের উত্তর তীরে অবস্থিত। বহু প্রাচীনকাল থেকে লোক দেখে এসেছে এখানে এক পুরাতন দুর্গের নিদর্শন। কথিত আছে পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের অজ্ঞাতবাসের সময় কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন এখানে। তাঁরাই স্থাপন করেছিলেন ভীমেশ্বর শিব। অজয়ের দক্ষিণ তীরেও তাঁরা কয়েকটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের নাম অনুসারেই জায়গাটার নাম হয়েছে পাণ্ডবেশ্বর।

ভীমগড় থেকে পূর্বদিকে চলে আসুন কেন্দুলী গ্রামে। এখানে আছে কুলেশ্বরের শিবমন্দির। কথিত আছে যে বৈষ্ণব ধর্মগ্রহণ করবার আগে জয়দেব ছিলেন শাক্ত এবং এই কুলেশ্বরের মন্দিরেই তিনি নিত্য পূজা করতেন শিবের।

উত্তরে চলে যান ময়ূরেশ্বরী নদীর তীরে। সিউড়ী শহর থেকে ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে ময়ূরেশ্বরীর দক্ষিণ তীরে পাবেন ভাণ্ডীরবন। ভাণ্ডীরবনে আছে ভাণ্ডেশ্বর মহাদেবের এক মস্ত বড় মন্দির।

আবার চলে আসুন বোলপুরে। বোলপুরের সন্নিকটেই অবস্থিত সুপুর। সুপুর ছিল সুরথ রাজার রাজধানী। সুপুরে আছে মহাদেব সুরথেশ্বরের মন্দির। কথিত আছে যে, সুরথেশ্বরের মন্দিরেই রাজা সুরথ প্রত্যহ অর্চনা করতেন লিঙ্গরূপী মহাদেবের। আর তাঁর ছিল এক প্রসিদ্ধ কালীমন্দির। ওই কালীর কাছেই রাজা সুরথ এক লক্ষ বলি দিয়েছিলেন। যে জায়গাটায় বলি দেওয়া হয়েছিল, সে জায়গাটার নাম হচ্ছে বলিপুর। তাই পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়েছে বোলপুরে।

এ ছাড়া, আদিত্যপুরে আছে কাণ্ডীশ্বর শিব, কোটাসুরে মদনেশ্বর শিব, খরবোনায় শৈলেশ্বর শিব, জুবুটিয়ায় জপেশ্বর শিব, ডাবুকে ডাবুকেশ্বর শিব, নারায়ণপুরে মল্লেশ্বর শিব, পাইকোড়ে বুড়োশিব, ময়ূরেশ্বরে ময়ূরেশ্বর শিব, মহুলায় মহুলেশ্বর শিব, মুলুকে রামেশ্বর শিব, রসায় আদিনাথ শিব, সাঁইথিয়ায় নন্দিকেশ্বর শিব ও হালিসোটে খগেশ্বর শিব। আরও বহুস্থানে শিবমন্দির আছে, যেমন আঙ্গোরায়, গোহালী আড়ায়, চারকলগ্রামে, জলন্দীতে, তেজহাটিতে, দাসকলগ্রামে, বালিগুনিতে, শেরাচণ্ডীতে ও সুরুলে। আবার অনেক জায়গায় বহুসংখ্যক শিবমন্দির এক সঙ্গে আছে, যেমন গণপুরে আছে

৩৭টা, চণ্ডীদাস-নানুরে ১৪টা, দুবরাজপুরে পাঁচটা, পারশুণ্ডীতে সাতটা ও মেহগ্রামে তিনটা।

দেবীর দেহাংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে-সব শাক্তপীঠের কথা আগে বলেছি, তা ছাড়াও বীরভূমে আরও শাক্তপীঠ আছে। বক্রেশ্বরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত নগর বা রাজনগর। নগর ছিল হিন্দু আমলে বীররাজাদের রাজধানী। বীররাজাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন কালী। দেবীর অবস্থান এখানে ছিল কোন মন্দিরে নয়। কালীদহ নামে এক হ্রদে। জনশ্রুতি যে, দেবী মাঝে মাঝে নিজেকে প্রকাশ করতেন জলের ওপর তাঁর হস্তদ্বয় ও মস্তক প্রদর্শন করে। খুব জাগ্রতা বলে দেবীর প্রসিদ্ধি ছিল। নগরের হিন্দুরাজারা যখন পরাভূত হলেন এবং নগর যখন মুসলমানদের করাধীনে গেল, তখন একদিন এক ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোক গোমাংসের রক্তে রঞ্জিত এক ছুরিকা কালীদহের জলে ধৌত করবার জন্য নিয়ে আসে। এতে কালীদহের জল কলুষিত হয়। হ্রদের উত্তর দিকটা খসে পড়ল ও জল স্রোতস্বিনী হয়ে খুসকর্ণী নদীতে গিয়ে পড়ল। স্রোতের সঙ্গে ভেসে মা-ও চললেন। মা-কে পাওয়া গেল বীরসিংহপুরে। বীরসিংহপুর হচ্ছে সিউড়ির ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে ঃ ভাণ্ডীরবন থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে। মাকে লোক বীরসিংহপুরে স্থাপন করলেন এক মন্দির নির্মাণ করে। এইভাবে উদ্ভব হল বীরসিংহপুরের কালীমন্দিরে মায়ের প্রস্তরমূর্তি।

বীরভূমের মানচিত্রের অনেকবার পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান আকারের চেয়ে এক সময় বীরভুমের আকার বিশালকায় ছিল। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সাঁওতাল পরগনা বীরভুমেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুর্শিদাবাদের কিছু অংশও বীরভুমের মধ্যে ছিল। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে বলা হয়েছে যে এই অংশের দুই প্রধান তীর্থ ছিল বৈদ্যনাথধাম ও বক্রেশ্বর। বৈদ্যনাথধামও (দেওঘর) এক শাক্তপীঠ। এখানে পড়েছিল দেবীর হৃদয়। দেবী এখানে জয়দুর্গা ও ভৈরব বৈদ্যনাথ।

॥ ছয় ॥

মনে হয় শিবকে ব্যাপকভাবে স্বীকার করে নেবার আগে, আর্যসমাজে ভাগবত-ধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। ভাগবত-ধর্মের উপাস্য দেবতা হচ্ছেন বিষ্ণু। যাঁরা বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাঁদের বৈষ্ণব বলা হয়। 'বৈষ্ণব' শব্দটি

প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে মহাভারতের একেবারে শেষের দিকে (১৮।৬।৯৭—১০৩)। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের মূলতত্ত্ব আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের (৭।১০০।২) এক মন্ত্রে বলা হয়েছে—"হে, প্রাপ্তকাম বিষ্ণু, তুমি তোমার সর্বজন হিতকারী দোষ-বিরহিত অনুগ্রহ-বুদ্ধি আমাদিগকে দাও।" বৈষ্ণব ধর্ম ভগবৎ-প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।৭) বলা হয়েছে—"ভগবান প্রেম স্বরূপ, তাঁকে পেলে লোকে আনন্দ লাভ করে।" মুণ্ডক উপনিষদে (৩।২।৩) আছে—"যে যাকে বরণ করে, সেই তাকে লাভ করে।" গীতায় বলা হয়েছে—"ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত তাঁকে পাওয়া যায় না।" এই সব মূলতত্ত্বের ওপরই বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত।

বুদ্ধের অনেক আগেই ভাগবত-ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কেননা পাণিনি বাসুদেব ভক্তদের সম্বন্ধে এক জায়গায় (৪।৩।৯৮) ইঙ্গিত করেছেন। পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলীও বাসুদেবের পূজকগোষ্ঠীর কথা বলেছেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় গ্রীক-রাজদূত মেগাস্থিনিস শৌরসেন জাতির (যাঁদের দেশের মধ্যে মথুরা নগরী অবস্থিত ছিল) মধ্যে হেরাক্লিস দেবতার আরাধনার কথা বলেছেন। 'হেরাক্লিস' শব্দ মনে হয় 'হরেকৃষ্ণ' শব্দের গ্রীক রূপান্তর। পঞ্চম সুঙ্গরাজ ভাগভদ্রের সভায় তক্ষশীলার অধিবাসী হেলিওদোরাস নামক গ্রীকদূত এসে আনুমানিক ১১৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দে মধ্যপ্রদেশের বেসনগরে এক বিরাট গরুড়ধ্বজ স্থাপন করেন এবং নিজেকে ভাগবত-সম্প্রদায়ের লোক বলে পরিচয় দেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, সে সময় ভাগবত ধর্ম তক্ষশীলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকের দিকে বৈষ্ণব ধর্ম রাজপুতানাতেও প্রভাব বিস্তার করে। ওই সময় মহারাষ্ট্রেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যেই বৈষ্ণব ধর্ম পূর্বভারতে বিস্তার লাভ করে। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে মহারাজ চন্দ্রবর্মন চক্রস্বামী বিষ্ণুর পূজার জন্য গুহা ও চক্রচিহ্ন নির্মাণ করে দেন। পঞ্চম শতকে ত্রৈকূটক রাজ দর্ভসেন নিজেকে 'পরমবৈষ্ণব' বলে অভিহিত করেন। ওই সময় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিজেকে 'পরম ভাগবত' বলে বর্ণিত করেন। কৃষ্ণের উপাসনা ও কৃষ্ণ-সম্পর্কিত যে সকল উপাখ্যান আছে, সেগুলি যে বাঙলা দেশে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ আমরা পাই উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত এক দেবায়তনে। এই দেবায়তনে ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

পালবংশীয় রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ, এবং বৌদ্ধ ধর্মেরই তাঁরা পরিপুষ্টি সাধন করেছিলেন। পালরাজবংশের অবনতির পর বাঙলায় রাজত্ব করেন সেনবংশীয় রাজারা। তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মী। সেনবংশের রাজত্বকাল খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেনবংশের তৃতীয় রাজা ছিলেন লক্ষ্মণসেন। লক্ষ্মণসেন 'পরম বৈষ্ণব', 'পরমনারসিংহ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর সময় বৈষ্ণব ধর্মের আবার প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। এই লক্ষ্মণসেনেরই রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন "গীতগোবিন্দ"-এর কবি জয়দেব। (পরের নিবন্ধ "অমর কবি জয়দেব" দ্রষ্টব্য)।

জয়দেবের জন্মস্থান হিসাবে কেন্দুলী বৈষ্ণবদের একটা তীর্থস্থান। জয়দেব এখানে রাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং একটা মন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন। তবে কেন্দুলিতে এখন যে মন্দির রয়েছে, তা নির্মিত হয়েছে জয়দেবের অনেক পরে ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে, বর্ধমানের রাজমাতা নৈরানী দেবী কর্তৃক। শ্যামারুপার গড় (সেনপাহাড়ী) থেকে রাধাবিনোদের বিগ্রহ এনে তিনি এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির এখন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত মোহন্তদের হাতে। নিম্বার্করা সমন্বয়বাদী।

প্রতিবৎসর মকর-সংক্রান্তিতে কেন্দুলীতে একটা মেলা বসে। নানান জায়গার বাউলরা এসে এই মেলায় সমবেত হয়। বাউলদের গানই এই মেলার একমাত্র আকর্ষণ।

কেন্দুলীর মাইলখানেক পশ্চিমে ছিল সেকালের বেলুরিয়া গ্রাম। অনেকেই মনে করেন এই বেলুরিয়া গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের রচয়িতা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর। কিন্তু শ্রীভক্তমালগ্রন্থ অনুযায়ী বিল্বমঙ্গলের আবাসস্থল ছিল দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবেন্বা নদীতীরে।

কেন্দুলী ছেড়ে চলে আসুন পূর্বদিকে বোলপুরে। বোলপুর ভেদ করে আরও পূবে প্রায় মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তে অবস্থিত নানুর গ্রাম। কেন্দুলী যেমন ধন্য হয়েছে জয়দেবের স্মৃতিবহন করে, নানুর তেমনই ধন্য হয়েছে সাধক চণ্ডীদাসকে স্মরণ করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার যে পন্থাকে বলা হয় রাগাত্মিক বা সখী অনুগত অথবা পরকীয়া এবং যা পরে রসসাধনা পদ্ধতি বলে পরিচিত, তারই কবি ছিলেন চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস প্রাক্-চৈতন্য যুগের লোক ছিলেন। রসিক কবি হিসাবে তাঁর রচিত পদাবলী বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ সমাদৃত।

এবার উত্তরে চলে আসুন একচক্রাপুরে। বৈষ্ণবদের কাছে এটাও একটা পীঠস্থান। এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন চৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভু। নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান হিসাবে একচক্রাপুর বৈষ্ণবদের কাছে পুণ্যস্থান।

বীরভূমে বৈষ্ণবদের আরও কয়েকটি পুণ্যস্থান আছে। ভাণ্ডীরবনে আছে গোপালের বিগ্রহ ও মন্দির। এই বিগ্রহ সম্বন্ধে এইরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে যে, একজন সাধক নানাতীর্থ ভ্রমণ করে ভাণ্ডীরবনে এসে পৌঁছান। তাঁর কাছে ছিল গোপালের এক বিগ্রহ। তিনি বিশ্রাম করবার জন্য গোপালটিকে নামিয়ে রাখেন, কিন্তু ওঠবার সময় দেখেন গোপালটিকে আর নাড়ানো যাচ্ছে না। সেই থেকে গোপালটি ভাণ্ডীরবনে থেকে গিয়েছে।

বীরচন্দ্রপুরে বৈষ্ণবদের দুটি মেলা বসে—একটা কার্তিক মাসে, আরেকটা ফাল্গুন মাসে। এখানে আছে বাঁকারায়ের মন্দির। বীরচন্দ্রপুরের উপকণ্ঠে যমুনার ওপারে হচ্ছে গর্ভবাস। এ জায়গাটা মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জন্মস্থান বলে চিহ্নিত। এর পাশেই হচ্ছে ভদ্রপুর। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে নানা কাহিনী এখানে প্রচলিত আছে।

চৈতন্য-উত্তরকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বীরভূমে যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব লাভ করেছিল। এর প্রমাণ আমরা পাই বীরভুমের নানাস্থানে অবস্থিত বৈষ্ণব মন্দিরে। এছাড়া, বৈষ্ণব সাধকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পুণ্যস্থানও আছে।

খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বীরভূমে চলেছিল এক ঘোরতর দ্বন্দ্ব—বৈষ্ণব ও শাক্তদের মধ্যে। সে জন্যই বোধ হয় আমরা বীরভূমের কয়েকটি মন্দিরে বিগ্রহের অভাব দেখি। মনে হয় যে প্রতিপক্ষ সম্প্রদায়ের লোকেরা সেগুলি সরিয়ে ফেলেছিল। এরূপ শূন্য মন্দিরের অন্যতম হচ্ছে ইলামবাজার ও কবিলাসপুরের মন্দিরদ্বয়। দুই ধর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্যই ঠাকুর রামকানাই একদিকে চৈতন্য মহাপ্রভু ও রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ও অপরদিকে বানেশ্বর শিব ও অপরাজিতা দেবীর মূর্তি স্থাপন করে, বৈষ্ণব ও শাক্ত আরাধনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

॥ সাত ॥

বীরভূমে গ্রাম্যদেবতারও খুব প্রচলন আছে। বীরভূমের গ্রাম্যদেবতাদের মধ্যে ধর্মঠাকুরের পূজাই সবচেয়ে বড় পূজা। নিম্নশ্রেণীর জাতিসমূহের

মধ্যে, বিশেষ করে বাউরী, বাগদি, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি জাতিসমূহের মধ্যেই এই পূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্বারা এই ধর্ম যদিও প্রভাবান্বিত হয়েছে, তথাপি ডোম জাতির লোকই শিলারূপী ধর্মঠাকুরের পুরোহিত। তবে রাজারাজড়াও যে এক সময় এই পূজা করতেন, তা 'ধর্মপুরাণ' সমূহ থেকে জানতে পারা যায়।

যে গ্রামে ধর্মঠাকুরের স্থায়ী মন্দির আছে, সেখানে প্রতিদিনই তাঁর পূজা হয়। সে পূজা সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীন। তবে যদি কারুর 'মানসিক' থাকে, তাহলে সেদিন পাঁঠা বা কবুতর বলি দেওয়া হয়। আবার কোন কোন অঞ্চলে উচ্চবর্ণের হিন্দুর বাড়িতেও শালগ্রাম শিলার পরিবর্তে ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। তবে ধর্মঠাকুরের সবচেয়ে বড় পূজা যেটা, সেটা হচ্ছে বাৎসরিক পূজা। এটা সাধারণতঃ বৈশাখী পূর্ণিমায় হয়। তবে কোন কোন জায়গায় চৈত্রী পূর্ণিমা বা জ্যৈষ্ঠী বা আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেও বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপ পূজাকে ধর্মের গাজন বলা হয়, এবং যাঁরা এই পূজায় সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যা হন, তাঁরা শিবের গাজনের ন্যায় নানারকম আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। ধর্মশিলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করানো, এই পূজার এক প্রধান অঙ্গ। এটা বারো দিনে সমাপ্ত হয় বলে, একে বলা হয় বারোমতী গাজন। বারো দিন ধরে নানা আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই গাজন পূজা সম্পন্ন হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে ধর্মঠাকুর শিলারূপে পূজিত হন। সুতরাং ধর্মঠাকুরের ধ্যান কি? তাঁর কল্পিত মূর্তি কি? ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহে ধর্মঠাকুরের যে বর্ণনা আছে, তা থেকে জানতে পারা যায় যে ধর্মঠাকুর নিরাকার ও নিরঞ্জন। তিনি আকারহীন শূন্যময় দেবতা। নিরাকাররূপে কল্পিত হলেও তাঁর বর্ণ হচ্ছে শ্বেত এবং তিনি শ্বেতবর্ণ সিংহাসন বা পর্যঙ্কের উপর আসীন।

এই ধর্মঠাকুর কে? এবং এঁর প্রকৃত পরিচয় কি? এ সম্বন্ধে পণ্ডিত-মহলে যথেষ্ঠ মতভেদ আছে। নানাজনে নানারকম ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ এঁকে বুদ্ধ, কেউ কচ্ছপ, কেউ যম, কেউ সূর্য, কেউ বিষ্ণু, কেউ বরুণ ইত্যাদি নানা আখ্যা দিয়েছেন। তবে দেখতে পাওয়া যায় যে, এঁর পূজার প্রাদুর্ভাব নিম্নশ্রেণীর জাতিগণের মধ্যেই আছে। তাছাড়া, এই পূজায় পৌরোহিত্য করবার অধিকার একমাত্র ডোম জাতিরই আছে। বাউরী, বাগদি, হাড়ি, ডোম

ইত্যাদি নিম্নজাতির হিন্দুরা যে বাঙলার আদিমবাসী সম্ভূত, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বীরভূমে এক সময় বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, সে সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নেই। সেজন্য মনে হয়, আজ যেমন এই সকল জাতি পারিপার্শ্বিক হিন্দুধর্মের চাপে পড়ে হিন্দু হয়েছে, তেমনই বৌদ্ধধর্মের প্রচলনের সময় এরা সকলে বৌদ্ধ হয়েছিল। প্রাচীন বৌদ্ধচর্যাপদসমূহে পুনঃপুনঃ ডোম-ডোমনীর উল্লেখ তার সাক্ষ্য দেয়। আদিবাসী সমাজে গোড়া থেকেই কোন-না-কোন সৃজন-উদ্দীপক ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল পরবর্তীকালের শিব প্রভৃতি দেবতা। সুতরাং মনে হয়, বাউরী, বাগদি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতি বৌদ্ধ হয়ে গেলেও তারা তাদের প্রাচীন দেবতাকে পরিহার করে নি। একসঙ্গেই তারা বুদ্ধ ও সেই আদিম দেবতার আরাধনা করত। সুতরাং বাউরী, বাগদি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতিসমূহ যখন বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন তারা নিরাকার বুদ্ধের সাধনা করত, এবং যেহেতু বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই তিনই এক, তারা বুদ্ধকেই ধর্মরাজ বলত। তারপর যখন বৌদ্ধ ধর্মের পতন ঘটল, তখন তারা আবার হিন্দু হয়ে গেল এবং ধর্মরাজকেই হিন্দুসমাজের মধ্যে টেনে নিয়ে এল। নিরাকার ধর্মরাজ, নিরাকারই রয়ে গেলেন। বৈশাখী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের কাছে অতি পুণ্য তিথি। বুদ্ধের জন্ম ও পরিনির্বাণ ওই তিথিতেই ঘটেছিল। সেজন্য ওই তিথিটাই ধর্মঠাকুরের গাজনের প্রশস্ত দিন। আবার যেখানে আদিম শৈবধর্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল, সেখানে ধর্মরাজের গাজন বৈশাখী পূর্ণিমার পরিবর্তে শিবের গাজনের সময় চৈত্র মাসেই হয়।

গ্রাম্যদেবতা হিসাবে ধর্মঠাকুরের পূজা বীরভূম জেলায় খুব ব্যাপক। বীরভূমের প্রায় প্রতি গ্রামেই ধর্মঠাকুর পূজিত হন। সেজন্য মনে হয় যে ধর্মঠাকুরের পূজার উদ্ভব বীরভূম জেলাতেই হয়েছিল এবং সেখান থেকে এর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশে। এখনও এসব জেলায় ধর্মপূজার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব আছে।

আবার অনেক জায়গায় ধর্মঠাকুর, শিবঠাকুরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

॥ আট ॥

বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের মত বীরভূমেও গ্রামদেবতা হিসাবে পূজিত হন মনসাদেবী। মনসা সর্পের দেবতা। সর্পদংশনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার

জন্যই মনসা দেবীর পূজা করা হয়। 'সর্পপূজা' অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। গৃহ্যসূত্রে এঁর উল্লেখ আছে। মহেঞ্জোদারো সভ্যতা এবং ভারহুতের যুগ হতে ভারতের সর্বত্র নাগ-নাগিনী মূর্তি দেখা যায়। নাগমুকুট ও ঘটমণ্ডিত দেবীমূর্তিও সাতনা, খিচিং, দিনাজপুর, রাজশাহী এবং অন্যত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, চৈতন্যের আবির্ভাবকালে লোকে নানা পুতুল গড়িয়ে ঘটা করে মনসার পূজা করত। আষাঢ়ের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে ঘটে অথবা সিজবৃক্ষে দুধকলা দিয়ে দেবীর পূজার প্রচলন বঙ্গের নানাস্থানে আছে। পল্লী অঞ্চলে পূজার পর আটদিন ধরে মনসার ভাসান বা অষ্টমঙ্গলা গীত হয়।

বজ্রযান বৌদ্ধসমাজেও জাঙ্গুলী নামে এক সর্পদেবীর পূজা, সাধনা, মন্ত্রাদি বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। সর্পদংশন হতে রক্ষা করতে এবং সর্পদংশন করলে তার বিষ নষ্ট করতে জাঙ্গুলী ছিল অদ্বিতীয়। জাঙ্গুলীর নাম শুনলে সাপ পালিয়ে যায়, এ বিশ্বাস সেকালের বৌদ্ধদের ছিল। তাঁর নাম করলে সাপের বিষ শরীরে সঞ্চারিত হয় না বলেও তাদের বিশ্বাস ছিল। জাঙ্গুলীর মূর্তি কল্পনা নানারূপে করা হয়েছিল। তাঁর রঙ কখনও শাদা, কখনও হরিৎ, আবার কখনও পীত হত। বৌদ্ধদের মন্ত্র থেকে বুঝতে পারা যায় যে, জাঙ্গুলির উপাসনা আদিবাসী সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছিল। কেননা, নিম্নস্তরের সমাজে সাপের 'রোজা'রা যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করে, এ মন্ত্র তারই অনুরূপ।

লৌকিক পূজা হিসাবে এঁর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য বাঙলাদেশে যে মঙ্গলকাব্যসমূহ রচিত হয়েছিল, তা থেকেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে-মনসাপূজা আদিবাসী সমাজ থেকেই গৃহীত হয়েছিল। কেননা, মনসামঙ্গল কাহিনীতে লখীন্দরের জন্য যে বাসগৃহ নির্মিত হয়েছিল, তা সান্তালী পাহাড়ের ওপর। এর দ্বারা বীরভূমের পশ্চিম অঞ্চলে সাঁওতাল পরগনাই সূচিত হচ্ছে। এছাড়া, মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাদেবীর জন্ম সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে, তার সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর বৈপরীত্যও তাই সূচিত করে। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী ইনি জরৎকারু মুনির স্ত্রী ও আস্তিকের মাতা এবং বাসুকির ভগিনী। ব্রহ্মার উপদেশে কশ্যপ সর্পমন্ত্রের সৃষ্টি করে তপোবলে মন দ্বারা এঁকে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে উৎপাদন করেন। সেজন্য এঁকে মনসা বা কশ্যপের মানসী কন্যা বলা হয়। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)। কিন্তু মনসামঙ্গল

কাব্যে ইনি শিবকন্যা। কালিদহে পদ্মপত্রের ওপর এঁর জন্ম। সেজন্য মনসার অপর নাম পদ্মাবতী। শিব ছিলেন আদিবাসী সমাজের দেবতা। সেই হেতু আদিবাসী সমাজে মনসার সঙ্গে শিবের সম্পর্ক।

মনসামঙ্গল কাব্যের দ্বারাই হিন্দুসমাজে মনসা পূজা প্রচলিত হয়। চাঁদ সদাগর কর্তৃক এই পূজা প্রবর্তিত হয়েছিল। বীরভূমে গন্ধবণিক সমাজে মনসাপূজা বিশেষভাবে সমাদৃত। তবে সকল সম্প্রদায়ের লোকরাই মনসা পূজা করে। মনসাপূজার সময় মনসাগাছকে মনসার প্রতীক হিসাবে ধরে নেওয়া হয়, আর তা নয়তো চালির পিছনে অঙ্কিত মনসাদেবীর পূজা করা হয়। বীরভূমের অনেক গ্রামে সর্পাসীনা প্রস্তরমূর্তি বা সিন্দুর লেপিত প্রস্তরখণ্ডও মনসাপূজায় ব্যবহৃত হয়। এই প্রস্তরনির্মিত মনসামূর্তি বা সিন্দুরলেপিত প্রস্তরখণ্ড সাধারণতঃ অশ্বত্থ বা অন্য কোন বৃক্ষমূলে স্থাপিত হয়। কখনও কখনও কোন কুটিরেও এইরূপ মনসামূর্তি পূজিত হয়। কোন কোন জায়গায় মনসার জন্য ছোট দেউল নির্মিত আছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বীরভূমের মুরারই থানার অন্তর্গত ভাদীশ্বর গ্রামে একটি প্রস্তর নির্মিত সুন্দর মনসামূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে। কোন কোন জায়গায় মন্দির অলঙ্করণের মধ্যেও মনসার প্রতিকৃতি লক্ষিত হয়। ঘুরিষার (শ্রীপুরে) রঘুনাথ জিউর মন্দিরে ও তারাপীঠের মন্দিরের স্তম্ভগাত্রেও মনসার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে।

॥ নয় ॥

বীরভুমের ধর্মীয় চেতনা ও নান্দনিক অনুভূতি বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় মন্দিরগাত্রের অলঙ্করণে। বীরভূমের অনেকগুলি মন্দিরের অলঙ্করণে আমরা রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের দৃশ্যাবলী ও অনেক দেবদেবীর মূর্তির রূপায়ন দেখতে পাই। এগুলি হয় মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির কাজ দ্বারা, আর তা নয়তো মন্দিরের প্রবেশপথের মাথায় স্থাপিত প্রস্তরের ওপর উৎকীর্ণ। এ ছাড়া, কয়েকটি মন্দিরের প্রবেশপথের নিকট অবস্থিত স্তম্ভের ওপরও অঙ্কিত আছে এই সব দৃশ্য। নান্দুর থানার অন্তর্গত আগোরার শিবমন্দিরের প্রবেশপথের মাথার ওপর আমরা দেখতে পাই বৃষবাহন শিব ও ষড়ভুজ কৃষ্ণকে; বোলপুর থানার অন্তর্গত আদিত্যপুরের দেউলের প্রবেশপথের উপর এক মৃৎফলকে আমরা দেখি লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান ও গণেশকে;

বোলপুর থানার অন্তর্গত ইটাণ্ডায় প্রবেশপথের কাছে এক স্তম্ভগাত্রে আমরা দেখি শুম্ভ-নিশুম্ভদলনী চণ্ডী, কালভৈরব, মহিষাসুরমর্দিনী ও কালীকে ; ওই থানারই অন্তর্গত ইলাম বাজারের হাটতলার মন্দিরগাত্রে দেখি দশমহাবিদ্যা, দশাবতার, রাসমণ্ডল ; বামুন পাড়ার লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরের খিলানের উপর দেখি গিরিগোবর্ধন, গোষ্ঠলীলা, রামরাবণের যুদ্ধ, ও রামসীতা ও নিকটস্থ অন্য একটি মন্দিরে দেখি অনন্তশায়ী বিষ্ণুকে ; নানুর থানার অন্তর্গত উচকরণে সরখেলদের মন্দিরগাত্রে দেখি কৃষ্ণলীলা, গোপিনী সহ কৃষ্ণ, বৃষোপরি শিব-পার্বতী, জটায়ুবধ, সুর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন, মহিষাসুরমর্দিনী ও দশ-মহাবিদ্যা ; মহম্মদবাজার থানার অন্তর্গত গণপুরের কালীতলার মন্দিরের খিলানের উপর দেখি রামরাবণের যুদ্ধ, মহিষমর্দিনী, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, কার্তিক, গণেশ, রাসমণ্ডল, কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণের জন্ম ও অন্যান্য দেবদেবী ও কিছুদূরে অন্য একটি মন্দিরে দেখি দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও কৃষ্ণ কর্তৃক দ্রৌপদীকে রক্ষা, সমুদ্রমন্থন, দেবাসুরের মধ্যে মোহিনী কর্তৃক অমৃত বিতরণ, ও গোপিনীগণসহ কৃষ্ণ ; বোলপুর থানার অন্তর্গত ঘুরিয়ায় (শ্রীপুর) রঘুনাথজিউর মন্দিরের দরজার উপরে দেখি বৃষারূঢ় শিব, কালী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা, রাম-রাবণের যুদ্ধ, সরস্বতী লক্ষ্মী, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, ত্রিবিক্রম, বলরাম, মনসা, বৃষোপরি শিব-পার্বতী, মহালক্ষ্মী, দুর্গা মহিষমর্দিনী, বস্ত্রহরণ, নবনারীকুঞ্জর, রাসমণ্ডল, গজেন্দ্রমোক্ষ, দুর্গা, বিষ্ণু অনন্তশায়ী, কালীয়দমন ও গোচারণে কৃষ্ণ, নানুর থানার অন্তর্গত চণ্ডীদাস—নানুরে কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি ; বোলপুর থানার অন্তর্গত সুপুর গ্রাম সংলগ্ন চন্দনপুরে রামসীতা, কল্কী, জগন্নাথ, বলরাম, পরশুরাম, ত্রিবিক্রম ও দশমহাবিদ্যা ইত্যাদি ; অজয় নদীর তীরে ইলামবাজার থানার অন্তর্গত জয়দেব-কেন্দুলীতে রাধাবিনোদ মন্দিরের মৃৎফলকের উপর দেখি শিব, বিষ্ণু, বায়ু, যম, ইন্দ্র প্রভৃতি দিক্‌পাল, দশাবতার, জটায়ু কর্তৃক সীতার উদ্ধার, কৃষ্ণলীলার ঘটনাবলী ইত্যাদি ; দ্বারকা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত রামপুরহাট থানার অন্তর্গত তারাপীঠের মন্দিরের খিলানের উপর দেখি মহিষমর্দিনী, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঘটনাবলী, ভীষ্মের শরশয্যা, অশ্বত্থামা হত ইতি গজ কাহিনী, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণের ঘটনাবলী, গজলক্ষ্মী ও মনসা ; নানুর থানার অন্তর্গত বীরভূমের প্রায় পূবসীমানায় অবস্থিত দাসকলগ্রামের শিবমন্দিরের গায়ে দেখি গরুড়বাহনের উপর বিষ্ণু ; দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত

দুবরাজপুরের শিবমন্দিরের প্রবেশ-পথের খিলানের উপর শিবের কৈলাস আক্রমণের ঘটনাবলী ও অন্যান্য পৌরাণিক দৃশ্যাবলী ও দেবদেবীসমূহ ; ময়রা পাড়ার মন্দিরগাত্রে দেখি দশাবতার, অন্নপূর্ণা, শিব, রাম সীতা, কৃষ্ণলীলা, শিব বিবাহ ও ওঝাপাড়ার শিবমন্দিরের দুই পার্শ্বের মৃৎফলকের উপর রামায়ণের ঘটনাবলী, নরসিংহ অবতার, নারদ ও নৌকাবিহার, খয়রাশোল থানার অন্তর্গত পাথরকুচিতের চারবালা মন্দিরের পাশে দেখি দশাবতার, গণেশ ইত্যাদি ; নানুর থানার অন্তর্গত বালিগুনিতে মন্দিরের প্রবেশপথের খিলানের উপর রামরাবণের যুদ্ধের দৃশ্য, গরুড়-বাহনারূঢ় বিষ্ণুর সহিত বৃষারূঢ় পঞ্চানন শিবের সংঘর্ষ ; ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত মল্লারপুরে কৃষ্ণলীলা, দুর্গা, শিব ইত্যাদি, সিউড়ী থানার অন্তর্গত মহুলায় কৃষ্ণের গাভীদোহন ; নলহাটী থানার অন্তর্গত মেহগ্রামে রামরাবণের যুদ্ধের দৃশ্যাবলী, দশাবতার, গৌর-নিতাইয়ের প্রতিকৃতি, দুর্গা ও কালী ; সিউড়ী থানার অন্তর্গত রাইপুরের এক আটচালা মন্দিরের গায়ে বৃষোপরি নন্দীভৃংগীসহ শিব ; বোলপুর থানার অন্তর্গত শেরাণ্ডীতে রাধাকৃষ্ণ ও শিবের প্রতিকৃতি ; সিউড়ীতে মাকড়া পাথরের তৈরি 'ঘুনসা' মন্দিরের দরজার খিলানের উপর কালীয়দমন, নৃত্যরত শ্রীকৃষ্ণ, রাসমণ্ডল, বস্ত্রহরণ, রাধাকৃষ্ণ, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, বাহনোপরি ব্রহ্মা, বায়ু, ইন্দ্র, কার্তিক, গণেশ ইত্যাদি ; বোলপুর থানার অন্তর্গত সুপুরে 'শ্যামসায়রে'র দক্ষিণে অবস্থিত মন্দিরে দশাবতার ও কৃষ্ণলীলা, গৌরাংগ-নিত্যানন্দের প্রতিকৃতি ও ওই থানারই অন্তর্গত সুরুলের লক্ষ্মী-জনার্দন মন্দিরের গায়ে দেখি রামায়ণের ঘটনাবলী, রামরাবণের যুদ্ধ, অশোকবনে চেড়ী পরিবৃতা সীতা, মহিষাসুর-মর্দিনী, ভগীরথ কর্তৃক গংগা আনয়ন, পার্বতী ও গণেশ, রামসীতা ইত্যাদি ; দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত হেতমপুরের চন্দ্রনাথ মন্দিরের গায়ে গণেশজননী, জগদ্ধাত্রী, গজলক্ষ্মী, ও দেওয়ানজী শিবমন্দিরের উপর রামসীতা, গোপিনীগণসহ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা ও অন্যান্য পৌরাণিক দৃশ্যাবলী। এছাড়া, অনেক মন্দিরের গায়ে তৎকালীন সামাজিক ও সাধারণ জীবনযাত্রার চিত্রও রূপায়িত আছে।

জয়দেব ছিলেন ভারতের শেষ শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি। তাঁর রচিত "গীতগোবিন্দ" সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে এক অনবদ্য অবদান। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কেন্দুলীর এক সুপ্রাচীন গোস্বামী-বংশে জয়দেবের জন্ম। পিতা ভোজদেব ও মাতা বামাদেবী দুজনেই ছিলেন পরম ধার্মিক। বহুদিন তাঁদের ছেলেপুলে হয় নি। তারপর দেবতার কাছে সন্তান প্রার্থনা করায়, দেবতা তাঁদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। এক শ্রীপঞ্চমীর পুণ্যতিথিতে জয়দেবের জন্ম হয়।

শৈশবেই জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। যথাসময়ে জয়দেবের উপনয়ন হয়। উপনয়নের পর জয়দেবের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। একদিন গৃহত্যাগ করে তিনি জগন্নাথক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করেন। শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছে দেবাদিদেব জগন্নাথের চরণে নিজেকে নিবেদিত করেন ও তাঁরই ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকেন। এখানে তিনি মাধবাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাধবাচার্য তাঁকে ব্যাকরণ, ছন্দ ও শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন। তারপর জয়দেব আশ্রয় নেন, মন্দিরের বাইরে এক গাছতলায়। সকাল-সন্ধ্যায় সমুদ্রে স্নান করে এসে ইষ্টদেবতার আরাধনা করেন, আর তাঁর সামনে নিজের রচিত বন্দনা-গীতি গান। বৈষ্ণবের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, তাতেই সুখে দিন কাটাতে থাকেন। তাঁর অনেক শিষ্য জুটে যায়, তার মধ্যে ছিল সুগায়ক পরাশর।

তখন তাঁর ষোল বছর বয়স। একদিন সন্ধ্যা-আরতির সময় মন্দিরে এসে উপস্থিত হন এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর রূপসী কন্যা। মেয়েটি এসেছে নববধূবেশে ফুলের মালা হাতে করে, নিজেকে জগন্নাথের সেবায় সমর্পণ করবার জন্য। আগন্তুক ব্রাহ্মণ বাঙালী, নাম বসুদেব ভট্টাচার্য, নিবাস নদীয়ার নবগ্রামে। বহুদিন নিঃসন্তান ছিলেন। জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে যদি তাঁর সন্তান হয়, তাকে সমর্পণ করবেন জগন্নাথের সেবায়। সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই আজ তিনি এসেছেন জগন্নাথের মন্দিরে।

মেয়েটির নাম পদ্মাবতী। ঠাকুরের সামনে গিয়ে পিতা বসুদেব ও কন্যা পদ্মাবতী দাঁড়িয়েছেন। ঠাকুরকে প্রণাম করছেন। পিতা বসুদেব প্রত্যাদেশ শুনলেন—"আমি আমার মানসকন্যা পদ্মাবতীকে গ্রহণ করলাম। কিন্তু

তুমি একে নিয়ে মন্দিরের বাইরে যাও। সেখানে আমার পরম ভক্ত জয়দেব আমার ধ্যানে বিভোর হয়ে আছে। তার হাতে তুমি তোমার কন্যাকে সমর্পণ কর।”

বাইরে এসে গরুড়ধ্বজের সামনে দেখতে পেলেন দিব্যকান্তি জয়দেবকে। ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন। ধ্যান ভগ্ন হলে, বসুদেব জয়দেবকে বললেন ঠাকুরের প্রত্যাদেশের কথা। জয়দেব বললেন, আমি ঠাকুরের এ আদেশ রক্ষা করতে পারব না। ব্রাহ্মণ যখন জয়দেবকে এ-বিষয়ে অচল অটল দেখলেন, তখন তিনি পদ্মাবতীকে তাঁর সামনে রেখে সরে পড়লেন। জয়দেব সংজ্ঞা হারালেন।

গভীর রাত্রে যখন তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এল, জয়দেব তখন দেখলেন যে পদ্মাবতী যুক্তকরে তাঁর সামনে বসে আছে। জয়দেব তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—“তুমি গেলে না যে!” মেয়েটি উত্তরে বলল—“আমার বাবা যে আপনার হাতে আমাকে সম্প্রদান করে গেলেন। দেবতার আদেশ ও পিতার নির্দেশ অবহেলা করে, আমি তো আপনাকে ত্যাগ করতে পারব না।”

জয়দেব অগত্যা বাধ্য হলেন পদ্মাবতীকে গ্রহণ করতে। সেই থেকে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে তাঁদের ভক্তি ও প্রেম দিয়ে জগন্নাথের আরাধনায় নিজেদের নিযুক্ত রাখলেন। পুরীর রাজা আনন্দদেব মাঝে মাঝে মন্দিরে এসে জয়দেবের গান শুনতেন ও পদ্মাবতীর আরতি দেখতেন।

এরপর পিতামাতার জন্য জয়দেবের মন উতলা হয়ে ওঠে। কেন্দুলীতে তিনি আবার ফিরে আসেন। সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন রাধামাধবের বিগ্রহ। তাঁর চরণে নিবেদন করেন জয়দেব নিজেকে ও পদ্মাবতীকে। জয়দেবের গানে ও পদ্মাবতীর নৃত্যে মুখরিত হয় কেন্দুলীর আকাশ-বাতাস। তাঁর কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য মুগ্ধ করে সমগ্র জগতকে। রাজা লক্ষ্মণসেন সাদরে নিয়ে গেলেন তাঁকে নিজের রাজসভায় সভাকবি হিসাবে।

জয়দেব রচনা করতে লাগলেন, তাঁর অমর গীতিকাব্য “গীতগোবিন্দ”। যেদিন যে সংগীতটি রচিত হয়, স্বামী-স্ত্রীতে সুধাময় কণ্ঠের সুর-তান-লয়ে ও হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তির সংগে ইষ্টদেবতা শ্রীরাধামাধবের চরণতলে সমর্পণ করে তবে সাধারণে প্রকাশ করেন।

একদিন কবি লিখছেন—“ওগো প্রিয়ে, তোমার কুরুকুম্ভের উপরে যে মণিহার দুলছে, তার দীপ্তিতে তোমার বুক আলোকিত হয়ে উঠুক। তোমার সঘন-জঘনের মেখলা রতিরণে মুখরিত হয়ে মন্মথের জয়বার্তা ঘোষণা করুক।

স্থল-কমল-গঞ্জন আমার হৃদয়রঞ্জন ওগো প্রিয়ে, তুমি আদেশ কর রতিরঙ্গে সুশোভিত তোমার ওই রক্তচরণখানি আমি অলক্তক রাগে রঞ্জিত করি। মদনের দহন জ্বালায় আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। অতএব হে প্রিয়ে—'স্মরগরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্'।" কবি থেমে গেলেন, আর লিখতে পারলেন না। পরম প্রকৃতি রাধিকার পদযুগলকে তিনি শিরোভূষণ করতে চান। কিন্তু বিশ্ব যাঁর চরণাশ্রিত সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজে কি করে শিরে রাধিকার চরণ স্থাপন করবেন? চিন্তিত মনে জয়দেব গঙ্গাস্নানে বেরিয়ে গেলেন। পুঁথি খোলা পড়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে জয়দেব আবার ফিরে এলেন। পদ্মাবতীকে বললেন—"আজ আর গঙ্গায় গেলাম না, অজয়ের জলেই স্নানটা সেরে ফেললাম। এই কথা বলে তিনি ঘরে ঢুকে পুঁথিটায় কি লিখলেন। তারপর আহার শেষ করলেন। পদ্মাবতী পদসেবা করে তাঁর ভুক্তাবশেষ অন্নভোজনে নিযুক্ত হল। এমন সময় স্নান সেরে জয়দেব বাড়ি ফিরলেন। জয়দেব আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, যে পদ্মাবতী তাঁর ভুক্তাবশেষ ছাড়া খায় না, সে আজ তাঁর আগেই খেতে বসেছে। এদিকে, পদ্মাবতীও স্বামীকে আবার ফিরতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। পরস্পর পরস্পরের কথা শুনে সংশয়াচ্ছন্ন হলেন। ঘরে গিয়ে দেখেন তাঁর অসমাপ্ত পাদ পূরণ হয়ে গেছে। লেখা রয়েছে—"দেহি পদপল্লব-মুদারম্"। বুঝতে কারুর বাকী রইল না যে, তাঁদের প্রাণের ঠাকুর নিজে এসেই লিখে দিয়ে গেছেন—"দেহি পদপল্লবমুদারম্"। জয়দেব বললেন—"পদ্মা, তুমিই ধন্যা, তুমিই সৌভাগ্যবতী, তোমার স্বামীর রূপ ধরে পরমপুরুষ আজ তোমাকে দেখা দিয়ে গেছেন। আর তুমি তাঁর পদসেবা করবার সৌভাগ্য লাভ করেছ। আমি অভাজন, তাই তাঁকে দর্শন করতে পারলাম না।"

এর কিছুদিন পরে সাধক-দম্পতি তাঁদের প্রাণের ঠাকুর রাধামাধবকে নিয়ে বৃন্দাবন যান। 'ধীরসমীরে যমুনাতীরে' তাঁরা তাঁদের বসতি স্থাপন করেন। জয়দেব ও পদ্মাবতীর কণ্ঠে গীতগোবিন্দ কীর্তন বৃন্দাবনের আকাশ-বাতাস মাতিয়ে তুলল।

তারপর একদিন তাঁর প্রাণের ঠাকুরের দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন জয়দেব। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভক্তের প্রাণবায়ু ভগবানের প্রাণবায়ুর সঙ্গে মিশে গেল। স্বামীকে অনুসরণ করে পদ্মাবতীও অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন রাধারানীর দিকে। তাঁর প্রাণবায়ুও পরম প্রকৃতির প্রাণ-বায়ুর সঙ্গে মিশে গেল।

জয়দেবের মৃত্যুর পর তাঁর পূজিত রাধামাধব মূর্তিটি বহুদিন কেশীঘাটের মন্দিরে অবস্থিত ছিল। মন্দিরটি জীর্ণ হলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ভ্রমরঘাটের ওপর নূতন রাধামাধব মন্দির নির্মাণ করে দেন। হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেব যখন হিন্দুর মন্দির ও দেবদেবীর ধ্বংসলীলায় মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, তখন জয়পুরের মহারাজ বৃন্দাবনের অন্যান্য বিগ্রহের সঙ্গে রাধামাধবকে জয়পুরে নিয়ে যান। জয়দেবের রাধামাধব এখনও সেখানে বিরাজ করছেন। বৃন্দাবনে এখন মাত্র প্রতিনিধি বিগ্রহ আছে। (কেন্দুলীর বিগ্রহ ও মন্দির সম্বন্ধে "ধর্মীয় চেতনার 'যাদুঘর' " নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

তারা-মায়ের ছেলে বামাক্ষ্যাপা

বামাক্ষ্যাপাই তারাপীঠের শেষ সাধক। বামাক্ষ্যাপার জন্ম হয় তারাপীঠের দক্ষিণে অটলা গ্রামে। পিতা সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন গায়ক ও বেহালাবাদক। দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে তিনি সন্ধ্যার পর যেতেন তারা-মায়ের মন্দিরে। সেখানে আলো জ্বেলে সতরঞ্চী বিছিয়ে ছেলেরা গাইত মায়ের স্তবগান, আর বাবা বাজাতেন বেহালা। গান গাইতে গাইতে ছেলে বামাচরণ কেঁদে ফেলতেন। একদিন গান গাইতে গাইতে বামাচরণ হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফেরাবার জন্য সকলের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। মা রাজকুমারী ছেলের অসুখের কথা শুনে পাগলিনীর মত মন্দিরের দিকে ছুটে এলেন। দেখলেন তখনও বামাচরণ সংজ্ঞাহীন। অচেতন ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে, মা 'তারা, তারা' বলে কেঁদে উঠলেন। যেমনি 'তারা' শব্দ ছেলের কানে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এল।

সংসারের কোন কাজেই বামাচরণের মন নেই। দিনরাতই তারা-মাকে 'মা' বলে ডাকেন। তাঁর বোন জয়কালীরও ঠিক একই অবস্থা। পাড়ার লোকেরা দুজনকে 'ক্ষ্যাপা' ও 'ক্ষেপী' বলে ডাকত।

পিতা সর্বানন্দ বামাচরণকে পাঠশালায় পাঠিয়ে দিলেন। গুরুমশাই 'অ, আ, ক, খ' লিখতে বললে, বামাচরণ লেখেন 'জয় মা তারা।' গুরুমশাই শুধালেন—'এ কি লিখছিস?' ক্ষ্যাপা উত্তর দেন—'কেন, আমার বড় মায়ের নাম।'

বামাচরণ আর বাড়িতে থাকেন না। পাঠশালাতেও যান না। সব সময় বসে থাকেন তারাপীঠের শ্মশানে। সেখানে সাধুসঙ্গ করেন, আর মাঝে মাঝে 'তারা, তারা' বলে কেঁদে ওঠেন।

ইতিমধ্যে বাবা সর্বানন্দ গেলেন মারা। সংসার অচল হল। বামাচরণকে বেরুতে হল চাকরির সন্ধানে। মুলুটি গ্রামের কালীমন্দিরে চাকরি হল। কাজ ফুল তোলা, আর মায়ের জন্য ভোগ রাঁধা। কিন্তু সময়মত কোন কাজই করেন না। কেবল 'মা, মা' বলে চীৎকার করে কাঁদেন। সুতরাং বিরক্ত হয়ে তাঁরা বামাচরণকে বিদায় দিলেন।

কিছুদিন মাতুলালয়ে থাকবার পর কাজ পেলেন তারা-মায়ের মন্দিরে। কাজ মায়ের পূজার জন্য ফুলতোলা। বিনিময়ে বামাচরণ মায়ের প্রসাদ পেতেন ও সামান্য কিছু বেতন পেতেন। সামান্য কাজের জন্য মায়ের প্রসাদ পাচ্ছে, আবার মাইনে পাচ্ছে, এই দেখে লোকে ষড়যন্ত্র করে মুরশিদাবাদের কাছারীতে নালিশ করল। মুরশিদাবাদ থেকে নায়েব এলেন। তিনি রাঁধার কাজের জন্য বামাচরণকে গঙ্গাস্নানের লোভ দেখিয়ে মুরশিদাবাদ নিয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে উল্টা বিপত্তি ঘটায়, বামাচরণকে আবার তারাপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। মায়ের কাছে ফিরে এসে বামাচরণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে তারাপীঠে সাধনভজন করতে এলেন এক সন্ন্যাসী। নাম তাঁর ব্রজবাসী কৈলাসপতি। তারাপুরের শ্মশানে তিনি কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হলেন। ব্রজবাসীর পর্ণকুটিরে বামাচরণ স্থান নিলেন ও তাঁর সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখলেন।

এরপর ক্ষ্যাপা নিজে বসলেন শ্মশানের শিমুলতলায় জপতপ করবার জন্য। মায়ের অনুমতি নিয়ে বামাচরণ হলেন সন্ন্যাসী।

বামাচরণ কৈলাসপতির কাছে দীক্ষা নিলেন। তাঁর আদেশে বেদজ্ঞ বাবা মোক্ষদানন্দের কাছে নিয়মিত বেদপাঠ শুনতে লাগলেন। বেদপাঠ শেষ হলে গুরুদ্বয় ক্ষ্যাপাকে বসিয়ে দিলেন শিমুলতলায়। ক্ষ্যাপা একান্তমনে মায়ের ধ্যান করে যান। নিশীথরাত্রে ক্ষ্যাপা ভয় পান, যেন এক বিশালকায় রাক্ষসী তাঁকে গ্রাস করবার জন্য ছুটে আসছে। বামাচরণ অচল অটল। তাঁর প্রতিজ্ঞা, হয় মাকে দর্শন করব, আর তা নয়তো রাক্ষসীর পেটে যাব। রাত্রিশেষে মা এসে আবির্ভূতা হলেন। 'মা, মা' বলে বামাচরণ লুটিয়ে পড়লেন মায়ের চরণে। মা শিশুর মত তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—'আজ তোর সাধনা সম্পূর্ণ হল। তার চিহ্নস্বরূপ এই শিমুল গাছ মাটিতে পড়ে যাবে।' সকালে উঠে সকলেই দেখলেন শিমুল গাছটা মাটিতে পড়ে আছে।

তারপর গুরুদ্বয়ের সঙ্গে বামাচরণ যান কাশীতে। কিন্তু বেশিদিন সেখানে থাকতে পারলেন না। তাঁর বড়মায়ের জন্য মন উতলা হয়ে উঠল। বামাচরণ পালিয়ে এলেন বীরভুমে। এর পরই বামাচরণের মাতৃবিয়োগ ঘটে।

বামাচরণের মাতৃবিয়োগের সময় এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল। ক্ষ্যাপা মায়ের শ্রাদ্ধে সব গ্রামের লোককে নেমন্তন্ন করে এলেন। ভাইয়েদের সঙ্গতি সীমিত। তারা অল্প লোকেরই আয়োজন করেছিল। তারা চিন্তিত হয়ে পড়ল। কিন্তু

দেখা গেল কোথা থেকে ভারে-ভারে খাদ্যসামগ্রী এসে পৌঁছাল তাদের বাড়িতে। এদিকে আকাশ মেঘে ঘোর ঘটাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ক্ষ্যাপা তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে একটা জায়গায় দাঁড় কেটে দিলেন। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হল বটে, কিন্তু ওই জায়গাটায় হল না। সুষ্ঠুভাবে লোকজন খাওয়ান হল। সকলে তো দেখে অবাক্!

এখন থেকে সব সময়ই বামাচরণ মন্দিরে থাকেন। একদিন মন্দিরে মায়ের ভোগ তোলা হচ্ছে, বামাচরণ আগেই তা থেকে ভোগ তুলে নিয়ে খেতে শুরু করলেন। লোকে বামাচরণকে প্রহার করতে লাগল। বামাচরণ বলেন—"মা যে আমায় খেতে বলেছিল, তাই তো আমি খেয়েছি।" সেদিন নাটোরের রানী স্বপ্ন দেখলেন। মা তারা সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে বলছেন—"ক্ষ্যাপা আমার ভোগ খেয়েছে বেশ করেছে। মার ভোগ থেকে ছেলে খায় না? আজ থেকে আমার আগে, ক্ষ্যাপাকে যদি না ভোগ দিবি, আমি মন্দির ছেড়ে চলে যাব।" তারপর সেই নিয়মই বলবৎ হল।

ক্ষ্যাপা কখনও মায়ের কাছে হেসে ওঠেন, কখনও কাঁদেন, আবার কখনও মাকে গালিগালাজ করেন। একদিন ক্ষ্যাপা মাকে বলছেন—"তুই যে আমাকে এত কাঁদাস্, তার জন্য তোর মন্দিরে বজ্রাঘাত হোক।" তারপরই ক্ষ্যাপার পিঠে চপেটাঘাতের আওয়াজ। সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল, ক্ষ্যাপার পিঠে মায়ের পাঁচ আঙুলের দাগ। মায়ের কাছে মার খেয়ে ক্ষ্যাপা আবার সুবোধ ছেলের মত শ্মশানে চলে যান। কিন্তু সেদিন রাত্রে ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। ক্ষ্যাপার কথাই সত্য হল। বাজ পড়ে মায়ের মন্দিরের চূড়ো ফেটে গেল। এরপর থেকে বামাক্ষ্যাপার কোন কাজে কেউ বাধা দিত না।

মায়ের পুজোয় বসে আচমন করতে গিয়ে এক ঘড়া গঙ্গাজলই খেয়ে ফেললেন ক্ষ্যাপা। মায়ের নৈবেদ্য নিজেই তুলে মুখে দিলেন। তারপর মায়ের সামনে মূত্রত্যাগ করতে শুরু করলেন। সকলে হৈ-হৈ করে উঠল। মূত্র গিয়ে লেগেছে মায়ের প্রতিমাতে। বিগ্রহ শুদ্ধ করবার জন্য রাজা কাশী থেকে সাতজন পণ্ডিত আনাবার সিদ্ধান্ত করলেন। রাত্রে রাজা স্বপ্ন দেখলেন—"সন্তান, মার কোলে মলমূত্র ত্যাগ করবে না তো কোথায় করবে? তাতে মা কি কখনও অশুচি হন? যদি আমাকে শুদ্ধ করবার চেষ্টা করিস্ তো আমি চিরকালের মত মন্দির ত্যাগ করে চলে যাব।" রাজা বিরত হলেন। সকলেই বুঝলো ক্ষ্যাপা সাধারণ মানুষ নন।

এরপর বাবার অলৌকিক বিভূতির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভক্তদের আগমনে তারাপীঠ ভরে উঠল। লোকে টাকা-পয়সা দেয়; বাবা তা' নেন না। তা দিয়ে দরিদ্রনারায়ণের সেবা হয়।

জামালপুরের প্রবাসী বাঙালীরা দুর্গাপূজা করতেন। সেবার ধুমধাম করে ছিন্নমস্তার পূজা করল। বৃদ্ধেরা বলল, এতে অনিষ্ট হবে। হলো-ও তাই। কলেরা-বসন্তের মহামারীতে শহর উজাড় হয়ে গেল। সকলেই প্রমাদ গুনলেন। জেটিয়া বাবা বললেন, "একমাত্র বামাক্ষ্যাপা তোমাদের রক্ষা করতে পারে।" সকলেই তারাপীঠের শ্মশানের দিকে ছুটল। বাবা শুনে বললেন,—"শালারা, হেলে ধরতে পার না, কেউটে ধরতে যাও।" বাবা এলেন, পূজায় বসলেন, সকলকে প্রসাদ দিলেন। সেদিন থেকেই জামালপুরে কলেরা-বসন্তের তিরোধান হল।

রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একবার বাবাকে কলকাতায় নিয়ে আসেন, তাঁকে দিয়ে তাঁর মূলাজোড়ের কালীমন্দিরে পূজা করাবেন বলে। বাবার পূজা দেখবার জন্য সেদিন মূলাজোড়ের কালীবাড়ি লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সকলেই স্তম্ভিত। পূজায় বসে বাবা কোথায় বড় বড় সংস্কৃত শ্লোক আওড়াবেন, না বাবার মন্ত্র হল "এস মা, নাও মা, খাও মা।" তারপরে বাবা ধ্যানে বসলেন। সকলে দেখে অবাক্, পাষাণ প্রতিমা হঠাৎ সজীব হয়ে নড়ছে।

১৩১৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে তারাপীঠের মহাশ্মশানে আবির্ভূত হলেন এক কালপুরুষ। জীবন্ত প্রেতের মত তাঁর চেহারা। অট্টহাসিতে ভরিয়ে দেন তিনি মহাশ্মশান। কালপুরুষ আসবার পর থেকেই বাবা হয়ে পড়লেন অসুস্থ। ২রা শ্রাবণ সন্ধ্যাবেলা শ্মশানে শোনা গেল আবার সেই অট্টহাসি। ভয়ে সকলেরই হৃদয় কম্পিত হয়ে উঠল। হাসি ক্রমশ বাবার পর্ণকুটিরের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। বাইরে থেকে কালপুরুষ বাবাকে প্রশ্ন করল— আর কেন? ঘরের ভিতর থেকে বাবা প্রত্যুত্তরে বললেন—"হুঁ"। তারপর তিনি 'তারা' নাম জপ করতে লাগলেন। সকালে বাবাকে বিছানায় নিস্পন্দ নিশ্চল অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখে ভক্তরা ছুটলো রামপুরহাটের দিকে, কবিরাজ আনবার জন্য। আবার সেই কালপুরুষের অট্টহাসি। পর্ণকুটিরের বাইরে থেকে কালপুরুষ বললেন—"কার জন্য তোরা কোবরেজ ডাকছিস্, অনেক আগেই মায়ের ছেলে মায়ের কাছে চলে গেছে।" কখন যে বাবার ইহলীলা শেষ হল, কেউ টের পেল না।

যাঁরা ভাবেন যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্ভবপর নয়, তাঁদের যেতে বলি সতী-মায়ের মেলায়। কলকাতা থেকে বেশি দূর নয়। কল্যাণী স্টেশনে নেমে চলে যান সতীমায়ের মেলায়। দোলযাত্রার দিন থেকে তিন দিন হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান নরনারী একত্রে মিলিত হয় এই মেলায়, সতীমায়ের কাছে তাদের শ্রদ্ধার্ঘ দেবার জন্য। এখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন বিভেদ নেই। পাশাপাশি বসে ওখানে হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান একত্রে ভোজন করছেন ; একত্রে তাঁদের সাধনা করছেন। হিন্দু গুরুকে মুসলমান ভক্ত প্রণাম করছেন, আবার হিন্দু ভক্ত প্রণাম করছেন মুসলমান গুরুকে। না দেখলে বুঝতে পারা যাবে না, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্যের কি অনুপম দৃশ্য এখানে দেখতে পাওয়া যায়।

সতীমায়ের মেলা অনুষ্ঠিত হয় ঘোষপাড়ায়, সেজন্য একে ঘোষপাড়ার মেলা বলা হয়। এটার আর একটা নামও আছে। সেটা হচ্ছে 'বাইশ ফকিরের মেলা'। নাম দেখেই বুঝতে পারা যাবে ফকিররাও এখানে আসেন। স্বয়ং লালন ফকিরও আসতেন। তাঁরও এখানে নির্দিষ্ট আস্তানা আছে। মেলার সময় তাঁর শিষ্যরা সেখানে এসে আসর জমান। ঘোষপাড়া হচ্ছে 'সত্যধর্ম' দলের পীঠস্থান। পরে এটা লোকমুখে 'কর্তাভজা' সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়। এখানে যে শুধু কর্তাভজামতাবলম্বীরাই আসেন, তা নয়। এখানে আরও অনেকে আসেন যথা অঘোরপন্থী, নাথপন্থী, কালাচাঁদী সম্প্রদায়, শক্তিসাধক যোগতন্ত্রী, কপিলনাথের সম্প্রদায়, তান্ত্রিকমতাবলম্বী, মাধ্যাচার্য সম্প্রদায়, দশনামী সন্ন্যাসী, সিদ্ধেশ্বরী পুজারী, কীর্তনীয়া বাউল আউল বাই ফকির প্রমুখ।

। দুই ।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে একদিন নদীয়ার উলা গ্রামের (এখন কল্যাণী) বাসিন্দা মহাদেব বারুই নিজ পানের বরোজের মধ্যে এক পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে পান। তিনি তাকে এনে পালন করেন। তিনি তার নাম রাখেন পূর্ণচাঁদ। একটু বড় হয়ে পূর্ণচাঁদ উদাসীন হয়ে চব্বিশ পরগনার ও সুন্দরবনের নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান।

নানা জাতির লোক তাঁর অনুরাগী হয়। তখন তাঁর নাম হয় আউলচাঁদ। সাতাশ বছর বয়সে বেজরা গ্রামে তিনি ধর্মগুরু হিসাবে প্রকট হন। এখানেই তাঁর বাইশ জন শিষ্য জুটে যায়। তাদের নাম হচ্ছে—(১) হটু ঘোষ, (২) বেচু ঘোষ, (৩) রামশরণ পাল, (৪) নয়ন, (৫) লক্ষ্মীকান্ত, (৬) নিত্যানন্দ দাস, (৭) খেলারাম উদাসীন, (৮) কৃষ্ণ দাস, (৯) হরি ঘোষ, (১০) কানাই, (১১) শঙ্কর, (১২) নিতাই, (১৩) আনন্দরাম, (১৪) মনোহর ঘোষ, (১৫) বিষ্ণু দাস, (১৬) কিনু, (১৭) গোবিন্দ, (১৮) শ্যাম কাঁসারি, (১৯) ভীমরায় রাজপুত, (২০) পাঁচু রুইদাস, (২১) নিধিরাম ঘোষ ও (২২) শিশুরাম। আউলচাঁদকে তাঁর ভক্তরা শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন—'শ্রীচৈতন্যদেব যবনপ্রীতি ও হরিজন সেবায় মনোমত পথ পান নি তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে, তাই নতুন পথ প্রবর্তনের জন্য তিনি ঘোষপাড়ায় আউলচাঁদরূপে আবির্ভূত হন।' এদের মতে কর্তা বা ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা এবং গুরুই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। আরও এঁদের মতে সাধনা ও উপাসনার ক্ষেত্রে জাতি বা সম্প্রদায়-বিচার নেই, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই।

১৭৬৯-৭০ খ্রীস্টাব্দে আউলচাঁদের মৃত্যু হয়। তখন রামশরণ পাল কর্তা হন।

॥ তিন ॥

রামশরণের মৃত্যুর পর বংশানুক্রমে রামদুলাল ও ঈশ্বরচন্দ্র কর্তা হন। শ্রীরামপুরের মিশনারীদ্বয় মার্শম্যান ও কেরী প্রায়ই ঘোষপাড়ায় রামদুলালের কাছে যেতেন ও তাঁর সঙ্গে pantheism সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করতেন ('Calcutta Review', Sixth Part, 1846. Page 407).

১৮২৯-৩০ খ্রীস্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ডাফ ভারতে আসার পর, তিনিও ঘোষপাড়ায় যেতেন এবং কর্তাভজাগণের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন। পঞ্চানন অধিকারীকৃত এক পুরানো হস্তলিখিত পুঁথিতে এর বিবরণ আছে। তাতে লেখা আছে—'রাজা রামমোহন রায় যেতেন তাঁর পাশ / অমৃত রস পান করি মিটাইতে আশ / অনেক সাহেবে তিনি সাথে লয়ে যান / অনেকেই লন আশ্রয় করি প্রণিধান ॥ / ডাফ সাহেব পাদরী যেতেন তাঁর পাশে / লইতেন শিক্ষা যেয়ে ঘোষপাড়া আবাসে ॥ / ঘোষপাড়া ধারে করেন স্কুল নির্মাণ / স্কুলডাঙ্গা নামে অভিহিত আজও সেই স্থান ॥' (শ্রীরামাশ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক এই পুঁথিখানি প্রকাশিত হয়েছিল)।

শুধু রাজা রামমোহন রায় কেন, কলকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঘোষপাড়ায় যেতেন ও কর্তাভজাবলম্বী ছিলেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল। (সুকুমার সেন, ভারতকোষ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৭)। ভূকৈলাসের ঘোষাল পরিবারের সকলের নামকরণে 'সত্য' শব্দ সংযুক্ত হওয়া ওই পরিবারের ওপর কর্তাভজা দলের প্রভাব সূচিত করে। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে লিখে গেছেন—'এক্ষণে অনেকানেক ভদ্রলোক এই সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট হয়েছেন।' প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ও জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের (স্কটিশ চার্চেস কলেজের) অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে কর্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন (সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, পৃষ্ঠা ১৪১)। আরও যাঁরা কর্তাভজা ধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত তান্ত্রিক লক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী, রামচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীসারদা মা, আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সন্তদাস বাবাজী, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, আচার্য নিগমানন্দ সরস্বতী, বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী প্রমুখ। চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু কেশবভারতীর ও নিত্যানন্দ ঠাকুরের বংশধররা কেহ কেহ কর্তাভজা ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কলকাতার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারে এখনও সতীমার ঘট সংরক্ষিত আছে ও নিত্য পূজাদি হয়ে থাকে।

মাত্র হিন্দুরাই যে সতীমায়ের ভক্ত তা নন। ক্রীশ্চান, মুসলমানরাও আছেন। বাঙলাদেশের অনেক গ্রামের অধিকাংশ মুসলমানই সতীমায়ের ভক্ত। মুর্শিদাবাদের কুমিরদহ এরূপ একটি গ্রাম। এ-সম্বন্ধে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীঅশোককুমার মিত্র, আই. সি. এস. -সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত হয়েছে—'এই গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান সম্প্রদায়-ভুক্ত। কিন্তু ইঁহারা ঘোষপাড়ার সতীমায়ের সত্য-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। ডিম মাংস, মদ্য কেহ গ্রহণ করেন না। কেহ সত্যধর্মবহির্ভূত কার্য করিলে বা প্রকাশ পাইলে তাহাকে সমাজে দণ্ড পাইতে হয়।'

॥ চার ॥

সতীমা ছিলেন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রামশরণ পালের স্ত্রী। তিনি সাধন-ভজনে স্বামীর সঙ্গে থাকতেন। ভক্তরা তাঁকে সতীমা (অনেকে শচীমাও) বলতেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল সরস্বতী। তিনি ছিলেন গোবিন্দপুরের

জমিদার গোবিন্দ ঘোষের মেয়ে। এই 'সিদ্ধমতী রমণী' কর্তাভজা সম্প্রদায়-ভক্ত ভক্তগণের কাছে 'কর্তামা' নামে প্রসিদ্ধা। ভক্তরা বলে, 'যার কেউ নেই, তার সতীমা আছেন'। মানিক সরকার লিখেছেন—'মধ্যযুগের বাঙলায় সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় 'যার কেউ নেই'-দের সংখ্যাই ছিল বেশি। আর্থিক অনটন ও সামাজিক নিষ্পেষণে জর্জরিত কৃষকসমাজের দরিদ্র অংশের অগণিত নর-নারীর মধ্যে একটি অংশ কর্তাভজা ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই দেখা যায় ভক্তদের অধিকাংশই দরিদ্র ও নিঃস্ব কৃষিসমাজের মানুষ। তারা সমাজজীবনে অন্ত্যজ, অর্থনীতিতে নিঃস্ব। সম্ভবত বাঁচার আশাতেই সতীমার উপর নির্ভর করে।' ('পশ্চিমবঙ্গ', ২৯ জুন ১৯৭২ পৃষ্ঠা ১২৪৭)। বিশেষ করে সতীমা অন্ত্যজসমাজের অবহেলিত-বঞ্চিত নারীসমাজকে কর্তাভজা মতের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন।

রামশরণের মৃত্যুর পর প্রথমে সতীমাই কর্তাভজাদলের 'গদি'র অধিকারী হন। তারপর তাঁর পুত্র রামদুলাল। রামদুলালের পর আবার সতীমা। তারপর যুগ্মভাবে ঈশ্বরচন্দ্র ও ইন্দ্রচন্দ্র। ঠাকুর বা ঠাকুরানী যাকে উত্তরাধিকারিত্ব দিয়ে যান, তিনিই ওই গদির অধিকারী হন।

॥ পাঁচ ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নের পূর্বেই কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের 'সত্যধর্ম' এমন জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, নবপ্রসূত ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকরা তাতে বিচলিত হয়ে ওঠেন। সেজন্য 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় ও অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'-এ আমরা কর্তাভজাবলম্বীদের বিপক্ষে তির্যক মন্তব্য দেখি। কিন্তু দায়িত্বশীল প্রাজ্ঞ প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে আমরা কর্তাভজা-সম্প্রদায় ও ঘোষপাড়ার মেলা সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ পাই। এরূপ একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন কবি নবীনচন্দ্র সেন। তিনি যখন নদীয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন তখন মেলার সুবন্দোবস্তের জন্য, এক সপ্তাহ পূর্ব থেকেই তাঁকে মেলা-প্রাঙ্গণের এক পাশে তাঁবু ফেলে অবস্থান করতে হয়। তিনি তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন :

"আমি সমস্ত দিন দেখিয়াছি যে কাঁচড়াপাড়া স্টেশন হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে ভক্তগণ দুই মাইল পথ লঙ্ঘন করিয়া ঘোষপাড়া মেলাক্ষেত্রে আসিতেছে, এবং হিমসাগরে স্নান করিয়া ভক্তিতে অধীর হইয়া রামশরণ পালের

ও তাঁহার স্ত্রী সতীমার সমাধি দর্শন করিতেছে। আমি দেখিয়াছি যে শত শত নরনারী সতীমায়ের সমাধি সমীপস্থ দাড়িম্বতলায় বৈষ্ণবদের মত দশা প্রাপ্ত হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় দিনরাত্রি ধরণা দিয়া পড়িয়া আছে। কেহ বা অপদেবতাশ্রিত লোকের মত মাথা ঘুরাইতেছে ও কেহ উন্মাদের মত নৃত্য করিতেছে। এই দাড়িম্বতলার দৃশ্য দেখিলে পাষাণের হৃদয়েও ভক্তি সঞ্চার হয়। দেখিয়াছি কর্তা 'গদি'তে বসিয়া আছেন এবং সহস্র সহস্র যাত্রী ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া ও প্রণামী দিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার উপর এক 'মহাশয়'-এর সরল ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সেই ভক্তি দৃঢ়তর হইল। আমার বোধ হইল 'কর্তাভজা' রূপান্তরে হিন্দুদের গুরুপূজা মাত্র। তাহাদের ধর্ম বেদান্তের মায়াবাদের প্রতিবাদ। যে রামশরণ পাল বেদবেদান্তপ্লাবিত দেশে এরূপ একটা নূতন ধর্মপ্রচার করিয়া এত লোকের পূজিত হইয়াছিলেন, তিনি কিছু সামান্য মানুষ ছিলেন না। যথার্থই কাল্পনিক মূর্তির পূজা না করিয়া এরূপ পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করিলে ক্ষতি কি? এখন যে 'harmony of scriptures' বা ধর্মের সামঞ্জস্য বলিয়া একটা কথা শুনিতেছি, দেখা যাইতেছে এই রামশরণ পালই তাহা সর্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম, সকল আচার সত্য— এমন উদার মত এক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন ধর্মসংস্থাপক প্রচার করেন নাই। অতএব রামশরণ পাল আমি তোমাকে নমস্কার করি। আমি এতদিনে 'কর্তাভজা' ধর্ম কি বুঝিলাম এবং ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে আমার শিবিরে ফিরিলাম।···

"তৃতীয় দিবস যাত্রীর ভিড় আরও অধিক হইল। প্রাতে কয়েকজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহারা সকলেই প্রায় গ্রাজুয়েট, সুশিক্ষিত ও পদস্থ। তাঁহারা সকলেই কর্তাভজা। তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক সকল জাতই আছেন। ঘোষপাড়ায় জাতিভেদ নাই। তাঁহারা সকলেই এক রন্ধনশালা হইতে প্রসাদ গ্রহণ করেন, এবং এজন্য বৎসর বৎসর আসেন। ঘোষপাড়ায় যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ কোনও রূপ স্পর্শদোষ ইঁহারা মানেন না। ঘোষপাড়া কর্তাভজাদের শ্রীক্ষেত্র। এই অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় আমি যেন ইহলোকে ছিলাম না। আমি এমন মধুর প্রাণস্পর্শী কীর্তন আর কখনও শুনি নাই। সমস্ত রাত্রি যেন স্বপ্নেও আমি সেই কীর্তন শুনিতে লাগিলাম।

"পরদিন পরিবারবর্গকে রানাঘাটে পাঠাইয়া মেলা ভাঙ্গার পর আমি কি

কারণে কলিকাতা যাইতেছি। কাঁচড়াপাড়ায় গাড়ীতে উঠিয়া দেখি, গাড়ীর কক্ষ উজ্জ্বল করিয়া সচশমা রবি ঠাকুর। উভয়ে উভয়কে এরূপ আচম্বিত দেখিয়া উভয়ে বিস্মিত। তিনি বলিলেন—'আপনি কোথা হইতে?' আমি বলিলাম—'আপনি কোথা হইতে?' তিনি বলিলেন, তিনি তাঁহার জমিদারী হইতে। আমি বলিলাম, 'আমি আমার জমিদারী হইতে।'

তিনি—জমিদারীটি আবার কি?

আমি—ঘোষপাড়ায় কর্তাভজাদের মেলায় অধ্যক্ষগিরি।

তিনি—কর্তাভজাদের মেলা! শুনিয়াছি বড় জঘন্য ব্যাপার।

আমি—অক্ষয়কুমার দত্তের 'উপাসক সম্প্রদায়' পড়িয়া আমারও সেই বিশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু তিনদিন মেলায় কর্তাগিরি করিলাম, কই 'জ—ঘ—ন্য' এই তিন অক্ষরের একটিও দেখিলাম না। ব্রাহ্ম অক্ষয়কুমার দত্ত হিন্দুধর্মের প্রতি মিশনারিদের অধিক বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন।

"তিনি তখন বড় আগ্রহের সহিত মেলার বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলেন। আমিও যাহা দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিলাম। এই বর্ণনায় তাঁহারও চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, 'আমার একটি প্রার্থনা, আপনি আমাকে যাহা বলিলেন—যদি তাহা একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া 'সাধনা'র জন্য লিখিয়া দেন, তবে আমার মত অনেকেরই একটা বিষম ভ্রম ঘুচিবে'।"

এবার একজন ব্রাহ্মের কথা শুনুন। কুলদাপ্রসাদ মল্লিকের 'নবযুগের সাধনা' গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে: "ব্রাহ্ম সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মমতে ছিলেন উদার। অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ তাঁর ছিল না এবং তিনি চেয়েছিলেন সর্বধর্মের সমন্বয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'দেবালয়' এই আদর্শের মূর্ত প্রতীক।

"শশিপদ বাবুর সময়ে বরাহনগরে 'কর্তাভজা' নামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনেকগুলি উপাসনাস্থল ছিল। বনহুগলীতে নিমচাঁদ মৈত্রের বাগান এই সমস্তের মধ্যে অন্যতম। এই স্থানে সপ্তাহে একদিন করিয়া নিম্নজাতীয় হিন্দুগণ সম্মিলিত হইত এবং তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে স্তোত্রপাঠ ও আরাধনা করিত। শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবু সময়ে সময়ে ঐ স্থানে যাইতেন। তিনি স্বীকার করেন যে তাহাদের উপাসনার ঐকান্তিকতার দ্বারা তিনি সেই দলে মিশিয়া বিশেষরূপে উপকৃত হইতেন।

"এই সম্প্রদায়ের ঐকান্তিকতা ও নিজ অপরাধ স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা

শশিপদবাবুর ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।" তাঁর জীবনীকার বলেন : "বিশ্বাস ও প্রার্থনা দ্বারা সকল প্রকার ব্যাধি আরোগ্য হয়। জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয়, ইহাই শশিপদ বাবুর দৃঢ়তম বিশ্বাস···তিনি বলেন, প্রার্থনা ও বিশ্বাস ব্যাধিনাশের অদ্বিতীয় উপায়। শশিপদ বাবু আরও বিশ্বাস করতেন, ভগবানের নিকট অপরাধ স্বীকার করলে, ইন্দ্রজাল অপেক্ষা অদ্ভুত ফল ফলে। এগুলি তাঁর জীবনের পরীক্ষিত সত্য। উপাসনার শক্তিবলে তিনি কন্যার দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করেছেন, অপরাধ স্বীকার ও মার্জনা ভিক্ষার ফলে তাঁর স্ত্রী রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়েছেন। শশিপদ বাবু এ দুটিই শিখেছিলেন কর্তাভজাদের সংস্পর্শে এসে।"

॥ ছয় ॥

ক্রীশ্চান ধর্মের 'দশ আদেশ'-এর মত কর্তাভজা ধর্মেও দশটি কর্ম নিষিদ্ধ। এই সকল নিষিদ্ধ কর্মের মধ্যে তিনটি হচ্ছে কায়কর্ম—পরস্ত্রী-গমন, পরদ্রব্য হরণ ও পরহত্যা করণ। তিনটি মনঃকর্ম হচ্ছে—পরস্ত্রী-গমনের ইচ্ছা, পরদ্রব্য হরণের ইচ্ছা ও পরহত্যা করণের ইচ্ছা। চারটি বাক্যকর্ম হচ্ছে—মিথ্যাকথন, কটুকথন, অনর্থকবচন ও প্রলাপভাষণ। এই দশটি নিষিদ্ধ কর্ম পরিহার করাই হচ্ছে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের 'সত্যধর্ম'।

কর্তাভজা দলের সাধনার একটা বিশিষ্ট অংগ হচ্ছে বাউলের মত অধ্যাত্ম সংগীত। দুলালচাঁদ যে সকল গান রচনা করেছিলেন, সেগুলোকে বলা হয় 'ভাবের সংগীত'। এই ভাবের গীত শুনেই কবি নবীনচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছিলেন যে, এরূপ সুমধুর প্রাণস্পর্শী কীর্তন পূর্বে কখনও তিনি শোনেননি। কর্তাভজা সাধকরা বিস্তর গান লিখে গেছেন। সেগুলিকে 'মহাজন গীত' বলা হয়। অনেক গানেই পরবর্তীকালের রাবীন্দ্রিক ভাব ও শৈলী উপস্থিত। ঘোষপাড়ার মেলায় এসব গানের আসর বসে।

প্রতিষ্ঠিত হবার একশ বছরের মধ্যেই কর্তাভজা-সম্প্রদায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো শহরে যে ধর্ম-মহাসভা হয়েছিল (যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন) সেই সভার 'অ্যাডভাইসরি কাউনসিল'-এ কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের কর্তা সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন।

গত দুশো বছর যাবৎ ঘোষপাড়ার মেলা হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার এক মহামিলনক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে।

চলো যাই গাজনতলায়

এক সময়ে বাঙালীর জীবনকে আনন্দ-মুখরিত করে রেখেছিল বাঙলার পাল-পার্বণসমূহ। বাঙলায় তখন অনুষ্ঠিত হত, বারমাসে তের পার্বণ। তারই মধ্যে চৈত্র-সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয় শিবের পার্বণকে বলা হত গাজন। তবে গাজন যে মাত্র শিবেরই হত, তা নয়। ধর্মরাজেরও হত। ধর্মরাজের গাজনের সময়টা ছিল বৈশাখী পূর্ণিমায় বা তার কাছাকাছি সময়ে। আর শিবের গাজন হত চৈত্র-সংক্রান্তিতে।

ধর্মরাজের গাজনের সংগে শিবের গাজনের অনেক মিল আছে। সেজন্য অনেকে মনে করেন যে, ধর্মরাজের গাজনের দেখাদেখিই শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর স্বপক্ষে যেটা প্রমাণ হিসাবে খাড়া করা হয়, সেটা হচ্ছে বর্ধমান জেলার কুড়মুনের গাজন। কুড়মুনে এক সময় বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজনই মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত। পরে গ্রামের মণ্ডলেরা একে শিবের গাজনে রূপান্তরিত করে। তখন থেকে চৈত্র-সংক্রান্তিতে কুড়মুনের ঈশানেশ্বর শিবের গাজনই প্রধান গাজন হিসাবে জনগণের মন অধিকার করে আছে। এ ছাড়া বর্ধমান জেলার জামালপুরের বুড়ো-রাজার গাজনে যে নৈবেদ্য দেওয়া হয়, তার মাঝখানে একটা দাগ কেটে দেওয়া হয়। তার অর্থ অর্ধেক নৈবেদ্য শিবের আর অর্ধেক ধর্মরাজার। আরও, মুরশিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় ধর্মরাজের গাজনে যে-সকল গান গাওয়া হয়, তার একটা গান হচ্ছে—'মশানে গিয়েছিলাম, মশানে গিয়েছিলাম, সংগে গিয়েছিল কে? কার্তিক গণেশ দুটি ভাই সংগে সেজেছে।' এ থেকেও ধর্মরাজের গাজনের সংগে শিবের গাজনের সম্পর্ক সূচিত হয়। বস্তুতঃ এগুলো হচ্ছে এই দুই দেবতার মধ্যে সমন্বয়ের একটা চেষ্টা। অতীত ইতিহাসের শেষ স্মৃতিচিহ্ন মাত্র।

আজ বাঙালী জানে না, সে অতীতের কি অমূল্য সম্পদ হারিয়ে ফেলছে। সে হারিয়ে ফেলছে তার প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত বারমাসে তের পার্বণ, যা অতীতে মাত্র তার জীবনকেই আনন্দময় করে তুলেছিল, তা নয়; তার গ্রামীণ অর্থনীতিকে ক্রিয়াশীল করেও রেখেছিল। আজ বাঙালীর সেই বারমাসে তের পার্বণ অনাদৃত হয়ে পড়েছে। দু-এক পুরুষের মধ্যেই এটা ঘটেছে। পঞ্চাশ বছর আগে আমি যখন প্রথম আমার কর্মজীবন শুরু করি, তখন ইংরেজ

সরকারের ছুটির তালিকায় দশহরা, রথযাত্রা প্রভৃতি স্থান পেত। স্বাধীনতা লাভের পর দেশীয় সরকার এগুলোকে অবান্তর সংযোজন মনে করে ছুটির তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। আজ পাল-পার্বণ বলতে আমরা বিজলী বাতি-শোভিত ও মাইকধ্বনিত সার্বজনীন পূজা বুঝি।

॥ দুই ॥

গাজন-উৎসব বাঙলার সর্বত্রই পালিত হয়। অঞ্চলভেদে তাদের মধ্যে কিছু আঞ্চলিক রূপান্তর থাকলেও মোট কাঠামোটা একই রকমের। ভক্ত সন্ন্যাসীরা ও বৈতনিক ও অবৈতনিক কর্মচারীরা এর অনুষ্ঠানসমূহে অংশ গ্রহণ করে। হর-পার্বতীর আরাধনা, মুখোসখেলা, মড়াখেলা, বাণফোঁড়া, নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধন করা ও ঢাকঢোল বাজিয়ে শিবের নাম উচ্চারণ করে গাজনতলা মুখরিত করে রাখাই এর বৈশিষ্ট্য। আমি দুজায়গার গাজন উৎসবের কার্যক্রমের তালিকা এখানে দিচ্ছি। প্রথমে মালদহের গাজনের কথা বলছি। এখানে শিবের গাজনকে আদ্যের (আদ্যদেবের) গম্ভীরা (শিবগৃহ ?) বলা হয়। চৈত্রমাসের শেষে তিন-চারদিন গম্ভীরা-উৎসব স্থায়ী হয়। গম্ভীরা-উৎসব শ্রেণীবিশেষের মধ্যেই বেশি প্রচলিত। তবে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যগণের মধ্যেও গম্ভীরা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গ্রামের মণ্ডলের অধীনেই গম্ভীরা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বকালে এই উৎসব পালনের জন্য জমিদার কিছু নিষ্কর জমিজমা দান করতেন। তার আয় থেকেই গম্ভীরার সম্পূর্ণ ব্যয় চলত। এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। এখন চাঁদা তুলেই গম্ভীরার ব্যয় নির্বাহিত হয়।

গম্ভীরার জন্য একটা মণ্ডপ তৈরি করা হয়। আগে মণ্ডপ সদ্যফোটা পদ্মফুল দিয়ে সাজানো হত। এখন ফুলের অভাবে কাগজের ফুল তার স্থান অধিকার করেছে। চৈত্রমাস যদি ৩০ দিনে শেষ হয়, তা হলে ২৬ তারিখে গম্ভীরার 'ঘটভরা', ২৭শে 'ছোট তামাসা', ২৮শে 'বড় তামাসা', ২৯শে 'আহারা' এবং ৩০শে চড়কপূজা হয়। ছোট-তামাসা ও বড়-তামাসার দিন সকালে হর-গৌরীর পূজা হয়। ভক্তগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে শিবের সামনে দাঁড়িয়ে শিববন্দনা করে। বন্দনার একটা নমুনা—'সৃষ্টি প্রকরণ আবাহন / কোথা হইতে আইলেন গোঁসাই কোথায় তোমার স্থিতি/আহার নাই পানি নাই আস নিতি নিতি / জল নাই স্থল নাই সকল শূন্যাকার / কর্পূরেতে ভর কর পবনে

আহার / শিবনাথ কি মহেশ।' বন্দনার শেষে ভক্তগণ গম্ভীরা-প্রাঙ্গণের ধুলোয় গড়াগড়ি দেয় ও ধুলো ছড়ায়।

খুব উচ্চনিনাদে ঢাকঢোল বাজিয়ে দুদিনই দুপুরের পর ভক্তগণের শোভাযাত্রা বেরোয়। ভক্তগণ নাচ-গান করে। বড় তামাসার দিন ভক্তগণ শোভাযাত্রার সময় ভূত, প্রেত, প্রেতিনী, বাজিকর ইত্যাদি যার যা ইচ্ছা সে সেরূপ বেশভূষা করে। নাচগান করতে করতে তারা এক গ্রামের গম্ভীরা থেকে অপর গ্রামের গম্ভীরায় যায়। ভক্তগণের মধ্যে কেউ কেউ ত্রিশূলাকৃতি ক্ষুদ্রবাণ বুকের দুদিকে বিঁধিয়ে ত্রিশূলের ডগায় কাপড় জড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, আর অন্য একজন তাতে ধুপচূর্ণ নিক্ষেপ করে। অন্য অঞ্চলের গাজনেও এটা প্রচলিত আছে।

পরদিন 'মশান নাচ' হয়। মশান আলুলায়িত কেশ, ললাট সিন্দুরলিপ্ত, কাঁচুলি পরা উন্নত কুচ, হাতে শাঁখা—বিকটবদনা বেশে সজ্জিতা হয়ে বিবিধ অঙ্গভঙ্গী করে নাচতে থাকে। নরমুণ্ড নিয়েও আগে নাচা হত। এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন একটা শুষ্ক নারিকেল তার বিকল্প হিসাবে ধারণ করা হয়। পরের দিন অগ্নিঝাঁপ বা পাটভাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়।

॥ তিন ॥

আমরা আবার গাজনের কথাতেই ফিরে আসছি। সংস্কারের দিক দিয়ে গাজন শিবেরও নয়, ধর্মরাজেরও নয়। 'গাজন' শব্দটা 'বারোয়ারী' বা সার্বজনীন শব্দের সমার্থবোধক। গাজন মানে সেই উৎসব যাতে গ্রামের জনগণ সকলে অংশ গ্রহণ করে। (গ্রাম + জন = গা + জন) 'গাজন' শব্দের এই ব্যুৎপত্তি বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থেও গ্রহণ করেছেন। প্রচলিত অভিধানসমূহে 'গাজন' শব্দের যে ব্যুৎপত্তি ('গর্জন' শব্দের অপভ্রংশ) দেওয়া হয় তার চেয়ে এটাই আমার কাছে বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

সাধারণ লোকের সংস্কার শিব শ্রাবণ মাসে জন্মেছিলেন, আর চৈত্রমাসে বিবাহ করেছিলেন। সেজন্য বর্ধমান জেলার জামালপুর-কালনার গাজনে অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দুজনকে বর-কনে সাজিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়। শিবের বিবাহ হয়েছিল চৈত্রমাসের শেষে নীলচণ্ডিকা বা নীলপরমেশ্বরীর সঙ্গে। সাধারণের কাছে তিনি নীল, নীলা বা নীলাবতী নামে পরিচিত। সেজন্য চৈত্র-মাসের শেষে নীলের উপবাসের দিন থেকেই শিবের গাজন-উৎসব আরম্ভ হয়। অনেক জায়গায় আবার এর আগে থেকেও শুরু হয়। জাতিনির্বিশেষে সকল

হিন্দু-রমণীই নীলের উপবাস করে। সুতরাং গাজনটা যে নিম্নসম্প্রদায়ের উৎসব (বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের একজন প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক একথা বলেছেন), তা মনে করার কোন কারণ নেই। আমি আগের এক নিবন্ধে বলেছি যে, শিব অনার্য দেবতা। সেজন্য গাজন-উৎসবের সঙ্গে অনেক কিছু অনার্য-চিন্তাধারা মিশ্রিত হয়ে আছে। সুতরাং নিম্নসম্প্রদায়ের মধ্যেই এই উৎসবের যে প্রাধান্য দেখা যাবে সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তা থেকে এরূপ কোন সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হবে না যে, গাজনের প্রচলন মাত্র নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই নিবদ্ধ। নীলের উপবাসে উত্তম-অধম সকল শ্রেণীর হিন্দু-রমণীর অংশ গ্রহণ, এরূপ সিদ্ধান্তকে নস্যাৎ করে দেয়। তা ছাড়া, গাজনের সময় যাঁরা ব্রত গ্রহণ করে 'সন্ন্যাসী' বা 'ভক্ত' হন, তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ হতে চণ্ডাল বাউরি পর্যন্ত সকল জাতকেই দেখতে পাওয়া যায়। এ কথা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশায়ই বলে গেছেন।

সাধারণত যাঁরা শিবের কাছে কিছু মানত করেন, তাঁরাই 'সন্ন্যাস' গ্রহণ করেন। তিন দিন থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত ব্রত গ্রহণের নিয়ম। অনেকে আবার সমগ্র চৈত্রমাসটাই ব্রত পালন করেন। ব্রতধারীর পক্ষে দিনের বেলায় উপবাস ও স্নানান্তে সন্ধ্যার পর ফলমূল ভোজন। ব্রতধারীর চিহ্ন লটকানে রঞ্জিত ধুতি বা শাড়ি পরিধান, কাঁধে 'উত্তরী' ধারণ ও হাতে বেত্রদণ্ড।

চৈত্র-সংক্রান্তির কাছাকাছি সময়ে ব্রতধারীর দল যখন গাজনতলার দিকে অগ্রসর হয়, তখন অঞ্চলভেদে তারা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে বলতে থাকে—'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে, মহাদেব', 'ব্যোম ব্যোম শিবশঙ্কর', 'শিবনাথ কি মহেশ' ইত্যাদি।

॥ চার ॥

মুরশিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার জেমো ও উদ্ধারণপুরে রুদ্রদেবের যে গাজন-উৎসব হয়, তাতে সন্ন্যাসীদের একটা শ্রেণীভেদ ও কর্মভেদ আছে। যথা, ১. কালিকার পাতা—এরা পিশাচবেশে মৃত নরদেহ নিয়ে নাচে। একে 'মড়া খেলা' বলা হয়। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, বর্ধমানের কুড়মুনের গাজনেও সন্ন্যাসীরা নরমুণ্ডসহ নাচত। ২. মায়ের পাতা—এরা ডাকিনী সেজে নেচে বেড়ায়। এরা লাল কাপড় পরে, মুখে আবির মাখে ও বিকট সাজসজ্জা করে। ৩. চামুণ্ডার পাতা; এদের সাজ-সজ্জাও ওই রকম বিকট, তবে এরা

মুখে মুখোস পরে নাচে। ৪. লাউসেনের পাতা—এরা লাউ, কুমড়ো ইত্যাদি হাতে নিয়ে নাচে। ৫. ধুলোসেনের পাতা—এরা ধুলোয় গড়াগড়ি দেয় ও ধুলো ছড়ায়। ৬. ব্রহ্মার পাতা—এরা হোমাগ্নি বহন করে। ৭. জলকুমির পাতা—এরা জলে খিচুড়ি ভোগ ডুবায়। মালদহে জলে শোলমাছ ডুবানো হয়। তাকে 'শামশোল' বলা হয়।

সব গাজনেই সন্ন্যাসী-ভক্তগণ নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধন করে। মালদহে তারা স্নান করতে গিয়ে কাঁটাগাছের গুচ্ছ সংগ্রহ করে। তারপর সেই গুচ্ছ এনে শিবের সামনে বুকে চেপে ধরে দাঁড়ায়। জেমো-কান্দিতে তারা কাঁটাগাছের ডালে শয্যা রচনা করে, তার ওপর গড়াগড়ি দেয়। বাঁকুড়ার বহুলাড়া গ্রামে তারা লোহার কাঁটা-বেঁধানো পাটাতনের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে বুকের ওপর ব্রাহ্মণ পুজারীকে বসিয়ে, ঘাট থেকে গাজনতলায় আসে। এছাড়া সেখানে জিভ-বাণ, কপাল-বাণ ইত্যাদি হত। বাঁকুড়ার পাঁচালের গাজনে জিভ-বাণ হত। এতে জিভের ভিতর দিয়ে একটা বাণ এফোঁড়-ওফোঁড় করা হত। কলকাতার গাজনেও সন্ন্যাসীরা বুকে বাণ ফুটিয়ে কালীঘাট থেকে নিজ নিজ মহল্লায় আসত।

তবে গাজন-উৎসব এখন বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। একশ বছর আগে বাঙলার প্রতি গ্রামে-গ্রামে গাজন-উৎসব হত। শহরেও হত। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্রসমূহ থেকে জানতে পারা যায় যে, কলকাতায় তখন বহুসংখ্যক গাজন হত। এ-সকল গাজন সাধারণত বড়লোকের বাড়িতে হত। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-র প্রথম নকশা 'বাবুদের বাড়ির গাজন'-এ কলকাতার গাজনকে অমর করে রেখে গেছেন। বাবুদের বাড়ির গাজনের মধ্যে ছাতুবাবু-লাটুবাবুদের বাড়ির গাজন ছিল প্রসিদ্ধ। কলকাতার গাজনসমূহের সন্ন্যাসীরা দলে দলে বাণফোঁড়া অবস্থায় কালীঘাট থেকে শহরের বিভিন্ন পাড়ায় নিজ নিজ গাজনতলায় আসত।

গাজনের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল মেলা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিশু'-তে লিখেছেন—'মেলা বসবে গাজনতলার হাটে'। এখন অনেক জায়গায় গাজন উঠে গেলেও মেলাটা বসে। যেমন ছাতুবাবু-লাটুবাবুদের বাড়ির সামনের ফুটপাথে এখনও চড়কের দিন মেলা বসে। কলকাতার উপকণ্ঠে সিঁথির গাজনও লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু মেলা এখনও বসে। গাজনের আর একটা আনুষঙ্গিক অঙ্গ ছিল ব্যঙ্গাত্মক সং-এর শোভাযাত্রা। ১২৪০ বঙ্গাব্দের ১৬ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ)-এর 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা থেকে আমরা অবগত হই যে, ওই

সময় ওইরূপ সং 'চিৎপুরের রাস্তায় অসংখ্য ঢাকের মহাশব্দ'-এর সহিত বেরুত। ওই বৎসরের এক সং-এ দেখানো হয়েছিল যে একজন ইষ্টদেবতাকে সামনে রেখে মালা জপছে, আর রাস্তার দুধারের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েছেলের মুখ দেখছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমপাদে এরূপ সং জেলেপাড়া (কলেজ স্ট্রীট-বহুবাজার অঞ্চল) থেকে বের করা হত। বছরের পর বছর এ সং আমি দেখেছি।

গাজন এখন ম্রিয়মাণ হলেও কলকাতার কাছাকাছি দুটো জায়গার গাজন এখনও সমারোহের সংগে অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে হুগলী জেলার তারকেশ্বরে। গাজন উপলক্ষে এখানে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। আর দ্বিতীয় জায়গাটা হচ্ছে পশ্চিমবংগ ও ওড়িশার সীমান্তে চন্দনেশ্বর গ্রাম। চন্দনেশ্বর হচ্ছে দীঘার তিন-চার মাইল উত্তর-পশ্চিমে। এখানে চন্দনেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে গাজন-উৎসব খুব জাঁকজমকের সংগে অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালী ও ওড়িয়ারা সমান উৎসাহের সংগে এই উৎসবে যোগদান করে। কয়েক সহস্র লোকের সমাগম হয় ও এই উপলক্ষে একটা মেলা বসে।

॥ পাঁচ ॥

গাজনের শেষদিনে অনুষ্ঠিত হয় চড়ক (চক্র = চড়ক = বর্ণবিপর্যয়ে চরক বা চড়ক)। এই উপলক্ষে একটা কাষ্ঠস্তম্ভের মাথায় আড়ভাবে একটা বাঁশ এমন করে বাঁধা হয় যে, তাতে পাক খাওয়া যায়। পিঠে বড়শীর মত একটা লোহার শলাকা বিঁধিয়ে সন্ন্যাসীরা ওই আড়ের দিকের বাঁশের শেষ অংশ হতে ঝুলে চড়কগাছে পাক খেত। বোধ হয় হঠযোগের সাহায্যে এটা তারা করতে সক্ষম হত। কিন্তু এই প্রথাটাকে অনেকে, বিশেষ করে ক্রীশ্চান মিশনারীরা 'অমানুষিক' দাবি করে ১৮৫৬-৫৭ খ্রীস্টাব্দে বাঙলা সরকারকে এই প্রথা রহিত করবার জন্য অনুরোধ করে। তদানীন্তন ছোটলাট জে. পি. গ্রান্ট বিভাগীয় কমিশনারদের এ-বিষয় অনুসন্ধান করতে বলেন। অনুসন্ধানের রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার নির্দেশ দেন যে যুক্তিতর্ক দ্বারা জনসাধারণকে বুঝিয়ে জমিদারদের এটা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ফল না হওয়ায়, ছোটলাট বিডন হিন্দু নেতাগণের ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্মতিক্রমে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে ১৫ই মার্চ তারিখে এক ইস্তাহার জারি করে এই প্রথা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করেন। তখন থেকে সন্ন্যাসীরা বুকে গামছা বা কাপড় বেঁধে, তার সাহায্যেই চড়ক গাছে পাক খায়।

শিব বড়, না বিষ্ণু বড়?

হিন্দুর দেবতামণ্ডলীতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিনের স্থান সকলের ওপরে। যুক্তভাবে এঁদের ত্রিমূর্তি বলা হয়। তবে এঁদের মধ্যে বিষ্ণু ও শিবই জনপ্রিয় দেবতা। এ দুজনের মধ্যে কে বড়? তার উত্তর দেবার পূর্বে, এই দুই দেবতা সম্বন্ধে আমাদের যা-কিছু জানা আছে, সে কথাই আগে বলব।

বিষ্ণু আর্যদেবতা। অন্যতম বৈদিক দেবতা হিসাবে বিষ্ণুর উল্লেখ ঋগ্বেদে মাত্র একবার আছে। প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তের ১৬ থেকে ২১ পর্যন্ত ঋকে বিষ্ণুকে স্মরণ করে বলা হয়েছে: 'বিষ্ণু সপ্তকিরণের সাথে যে ভূপ্রদেশ পরিক্রমা করেছিলেন, সে প্রদেশ হতে দেবগণ আমাদের রক্ষা করুন (১৬)। বিষ্ণু এ জগৎ পরিক্রমা করেছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করেছিলেন, তাঁর ধূলিযুক্ত পদে জগৎ আবৃত হয়েছিল (১৭)। বিষ্ণু রক্ষক, তাঁকে কেউ আঘাত করতে পারে না, তিনি ধর্মসমুদয় ধারণ করে তিন পদ পরিক্রমা করেছিলেন (১৮)। বিষ্ণুর যে কর্মবলে যজমান ব্রত সমুদয় অনুষ্ঠান করেন সে কর্মসকল অবলোকন কর। বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা (১৯)। আকাশে সর্বতঃ বিচারী যে চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সেরূপে দৃষ্টি করেন (২০)।' স্তুতিবাদক ও সদাজাগরূক মেধাবী লোকেরা সে বিষ্ণুর পরমপদ প্রদীপ্ত করেন (২১)। ঋগ্বেদে বিষ্ণু সম্বন্ধে সব কিছু, এই ছয়টি ঋকেই বলা হয়েছে। এখানে বিষ্ণুকে ইন্দ্রের সখারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর তিন প্রকার পদবিক্ষেপের কথাও বলা হয়েছে। ঋগ্বেদে বর্ণিত বিষ্ণুর এই তিন প্রকার পদবিক্ষেপ সম্বন্ধে যাস্ক ও অন্যান্য ভাষ্যকারগণ যা বলেছেন তা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি এবং অস্তাচলে অস্তগমন, এ তিনটি বিষ্ণুর পদবিক্ষেপ বলে বর্ণিত হয়েছে। এই উপমা থেকেই পরবর্তী যুগে বিষ্ণুর বামনরূপ ধারণ করে অসুররাজ বলির কাছে মাত্র ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনার কাহিনী সৃষ্ট হয়েছিল। সেই কাহিনী অনুযায়ী বলিরাজ একবার এক যজ্ঞানুষ্ঠান করে প্রভূত দান করতে থাকেন। বিষ্ণু বামনরূপে কশ্যপের পুত্র হয়ে বলির যজ্ঞানুষ্ঠানে গিয়ে বলির কাছে মাত্র ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি এতে সম্মত হলে বামন আশ্চর্যরূপে বর্ধিত হয়ে, তাঁর দুই পদদ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্য

অধিকার করে, নাভি হতে নির্গত তৃতীয় পদ রাখবার স্থান বলিকে নির্দেশ করতে বলেন। বলি তখন নিজের মাথা নীচু করে তার ওপর বামনকে তার তৃতীয় পদ রাখতে বলেন। বিষ্ণু তৃতীয় পদ বলির মাথার ওপর রাখা মাত্র বলি বিষ্ণুর স্তব করতে থাকেন। এমন সময়ে তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদ সেখানে আবির্ভূত হয়ে, বিষ্ণুকে বলির বন্ধন মোচন করবার অনুরোধ জানান। প্রহ্লাদের কথায় বিষ্ণু বলির বন্ধন মোচন করে বলেন যে, 'বলি, বহু কষ্টস্বীকার করে তুমি নিজের সত্য পালন করেছ। সেইজন্য দেবতাদের দুষ্প্রাপ্য স্থান রসাতল তোমার বাসের জন্য দিলাম।' তারপর থেকে বলি রসাতলে বাস করতে থাকেন।

বিষ্ণু সম্বন্ধে আর একটা পৌরাণিক কাহিনী আছে বলিরাজার প্রপিতামহ অসুর-সম্রাট হিরণ্যকশিপুকে অবলম্বন করে। হিরণ্যকশিপুর ভাই হিরণ্যাক্ষ বরাহরূপী বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হওয়ায় হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুদ্বেষী হয়েছিলেন। কঠোর তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে তিনি বর প্রার্থনা করেন যে 'কোন সৃষ্টপ্রাণী হতে যেন তাঁর মৃত্যু না হয়, অভ্যন্তরে বাহিরে, দিনে বা রাত্রে ব্রহ্মার সৃষ্টি ভিন্ন অন্য হাতে যেন তাঁর মৃত্যু না হয়। নর ও পশুর তিনি যেন অবধ্য হন।' এই বর পাবার পর হিরণ্যকশিপু যথেচ্ছাচারী হয়ে রাজত্ব করতে থাকেন। বিষ্ণু-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র প্রহ্লাদ অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিল। তার ফলে হিরণ্যকশিপুর সমস্ত রাগ প্রহ্লাদের ওপরে গিয়ে পড়ে। নানাভাবে হিরণ্যকশিপু পুত্রকে হত্যা করবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও প্রহ্লাদকে মারতে পারলেন না। এতে আশ্চর্য হয়ে গিয়ে একদিন তিনি প্রহ্লাদকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। প্রহ্লাদ বলল যে, 'হরি সব সময় আমাকে রক্ষা করেন, এবং তিনি সবসময় সর্বত্র বিরাজমান।' সামনে প্রাসাদের এক স্ফটিক-স্তম্ভ দেখিয়ে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোর হরি কি এই স্তম্ভের মধ্যেও আছে ?' প্রহ্লাদ বলে—'হাঁ'। হিরণ্যকশিপু এক পদাঘাতে সেই স্তম্ভ ভগ্ন করলে, নরসিংহরূপী বিষ্ণু আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে নিজ জানুদ্বয়ের ওপর রেখে নখাঘাতে উদর বিদীর্ণ করে তাঁকে হত্যা করেন।

বিষ্ণু সম্বন্ধে তৃতীয় পৌরাণিক কাহিনী হচ্ছে সমুদ্রমন্থনে বিষ্ণুর কূর্মরূপ ধারণ। অসুরদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে, দেবতারা তাদের শক্তি হারিয়ে ফেলেন। সেজন্য দেবতারা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে শক্তি ও অমরত্ব প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু দেবতাদের উপদেশ দেন—তোমরা সমুদ্রমন্থন করে অমৃত সংগ্রহ কর। বিষ্ণু নিজে কূর্মরূপ ধারণ করে অমৃতমন্থনে সাহায্য করেন। মন্দার

পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকি নাগকে মন্থনরজ্জুরূপে ব্যবহার করে, দেবতারা সমুদ্রগর্ভ থেকে অমৃত ওঠায়। পরে বিষ্ণুর ছলনায় অসুররা সে অমৃত থেকে বঞ্চিত হয়। এটা মহাভারতের কাহিনী। অন্যান্য পুরাণে একই কাহিনী সামান্য রূপান্তরভেদে আছে। মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বিষ্ণু সম্বন্ধে যেসব কাহিনী আছে, তার মধ্যে এই তিনটিই প্রধান। এই তিনটি কাহিনীতেই আমরা বিষ্ণুকে অসুরবিদ্বেষী দেখি।

॥ দুই ॥

শিব ছিলেন অসুরদের দেবতা। বিষ্ণু যেমন বৈদিক দেবতা, শিব তেমনই অবৈদিক দেবতা, যদিও পরবর্তীকালে বেদের রুদ্রদেবতার সংগে শিবের সমীকরণ করা হয়েছিল। শিব শুধু অবৈদিক দেবতা নন, তিনি প্রাগ্‌বৈদিক দেবতা। শিবের প্রতীকের সংগে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় প্রাগ্‌বৈদিক সিন্ধুসভ্যতায়। সেখানে আমরা মৃগ, হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, মহিষবেষ্টিত যোগাসনে উপবিষ্ট ঊর্ধ্বলিংগ পশুপতি শিবকে এক সীলমোহরের ওপর মুদ্রিত দেখি। ভারতীয় দেবদেবীর বিবর্তনের ইতিহাসের এইটিই আদিমতম নিদর্শন। সুতরাং সিন্ধুসভ্যতায় বন্দিত দেবতা হিসাবে শিবের বিদ্যমানতা বৈদিক যুগের বহু পূর্ব হতে। প্রাগার্য বা অনার্য বলেই বৈদিক যাগযজ্ঞে শিবের হবির্ভাগ ছিল না। দক্ষ এই কারণেই তাঁর যজ্ঞে শিবকে আমন্ত্রণ জানান নি। শিব এই যজ্ঞ পণ্ড করবার পরই, শিব আর্যসমাজে স্বীকৃতি লাভ করে। সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের নিয়ামক দেবাদিদেব শিবের স্বীকৃতি দানে সেদিন সহায়ক হয়েছিলেন বিষ্ণু। বিষ্ণুই সেদিন রুষ্ট শিবের তাণ্ডবের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচিয়েছিলেন ও শিব-শক্তি উপাসনার গোড়াপত্তন করেছিলেন।

খুব সম্ভবত এই স্বীকৃতি অথর্ববেদ রচনায় পরে দেওয়া হয়েছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতায় শিবকে গিরিশ বা গিরিত্র বলা হয়েছে। গিরিশ হিমালয় অঞ্চলের পার্বত্য দেবতা, পার্বতী তার স্ত্রী। অথর্ববেদে ও মহাভারতে শিবকে কিরাতরূপী বলা হয়েছে। শিবকে যে আর্য দেবতামণ্ডলীর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, দক্ষযজ্ঞের কাহিনী তারই রূপক মাত্র।

আর্যসমাজ কর্তৃক গৃহীত হবার পর শিবকে বৈদিক রুদ্রের সংগে অভিন্ন করা হয়। এটা করা সহজ হয়েছিল এই কারণে যে, এই দুই দেবতার কল্পনার মধ্যে অনেকটা ঐক্য ছিল। উভয় দেবতার চরিত্রেই বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ

দেখা যায়। রুদ্র সহজেই তুষ্ট ও কল্যাণপ্রদ। আবার রুষ্ট হলে তিনি সংহারকারী। তিনি স্ত্রী, পুরুষ, গাভী, অশ্ব, মেষ ইত্যাদিকে নানা প্রকার মঙ্গল ও প্রাচুর্য দান করেন। রোগের ওষধি দান করে সকলকে নীরোগ করেন ; পাপ থেকে সকলকে নিষ্কৃতি দেন। লিঙ্গরূপী শিবও শস্য ও উর্বরতার দেবতা ; গ্রাম, ক্ষেত্র ও পশুরক্ষক ও মারীভয়-নিবারক। শিবও সহজে তুষ্ট হন, আবার রুষ্ট হলে তিনি সংহারকারী হন। রুদ্রের সঙ্গে শিবের সমীকরণে সাহায্য করেছিল ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯২ সূক্তের নবম মন্ত্র। সেখানে বলা হয়েছে রুদ্র একাধারে 'রুদ্র' (ভয়ানক) ও 'শিব' (মঙ্গলময়)। লক্ষণীয়, এখানে 'শিব' শব্দ বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষ্যরূপে নয়। এই বিশেষণই পরে রুদ্রের অপর নাম হিসাবে শিবরূপে পরিগণিত হয়েছিল।

পৌরাণিক কল্পনা অনুযায়ী শিব মহাদেব। তার মানে শিবের স্থান দেবতাদের পুরোভাগে। তাঁর উপাসকদের মধ্যে ছিল অবৈদিক জাতিগণ—যেমন অসুর, রাক্ষস ইত্যাদি। অসুররাজ বান তাঁর পরমভক্ত ছিল। অনুরূপভাবে লঙ্কেশ্বর রাক্ষসরাজ রাবণও তাঁর পরমভক্ত ছিল। দেব ও অসুরগণের মধ্যে বহুকাল ধরে বিরোধ চলেছিল। সেজন্য শিব যখন আর্যসমাজে গৃহীত হন—তখন আর্যগণ শিবেরই শরণাপন্ন হন, অসুরদের পরাস্ত করবার জন্য। এরই রূপক হচ্ছে সমুদ্রমন্থন। দেবতা ও অসুররা পরস্পর যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে, অমৃত পান করে অজর অমর ও নিরাময় হতে চাইল। উভয়েই অমৃত লাভের জন্য সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হল। সহস্র বৎসর মন্থনের পর বাসুকি বিষ বমন করতে লাগলেন। দেবতারা ভীত হয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হন। বিষ্ণুও সেখানে উপস্থিত হয়ে মন্থনজাত বিষ অগ্রপূজা হিসাবে দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে পান করতে বলেন। মহাদেব সেই বিষ পান করে কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ হন। পরে অমৃত উঠলে অমৃতের অধিকার নিয়ে যখন দেবগণ ও অসুরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল, তখন বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করে অমৃত হরণ করে দেবতাদের দিলেন।

সমুদ্রমন্থন-উপাখ্যানে বিষ্ণু নিজেই মহাদেবকে দেবশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তবে বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কে বড় ? তাই নিয়ে তখনকার দিনেও বিতর্ক চলেছিল। এই বিতর্কের সমাধানের প্রয়াসেই জলন্ধর কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল। ইন্দ্র একবার কৈলাসে শিবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এক ভীষণাকার পুরুষ দেখেন। তাকে শিবের কথা জিজ্ঞাসা করে উত্তর না পেয়ে,

ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তার মস্তকে বজ্রাঘাত করেন। এই বজ্রাহত পুরুষের মস্তক হতে এক ভীষণ অগ্নি নির্গত হয়ে ইন্দ্রকে ভস্ম করতে উদ্যত হয়। ইন্দ্র যখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি স্বয়ং শিবের মাথায় বজ্রাঘাত করেছেন, তখন তিনি স্তবস্তুতি দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন। সন্তুষ্ট হয়ে শিব সেই অগ্নি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত সেই অগ্নি থেকে জলন্ধর নামে এক অসুররাজের সৃষ্টি হয়। জলন্ধরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গচ্যুত হয়ে শিবের আশ্রয় নেন। দেবতাদের সংগে জলন্ধরের যুদ্ধ হয়। শিব দেবতাদের পক্ষ নেন। জলন্ধরের স্ত্রী বৃন্দা স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য বিষ্ণুর পূজা করেন। বিষ্ণু এই সময় জলন্ধরের রূপ গ্রহণ করে বৃন্দার সামনে উপস্থিত হন। স্বামী অক্ষতদেহে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছে ভেবে, বৃন্দা পূজা অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়েন। এর ফলেই জলন্ধরের মৃত্যু হয়। এই কাহিনীর মধ্যে শিবকেই বড় করা হয়েছে, এবং শক্তিহীন বিষ্ণুকে কপট ব্যবহারের আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়েছে।

॥ তিন ॥

বস্তুত হিন্দুসমাজে শিবের অনুপ্রবেশ নিয়ে বেশ কিছুদিন আলোড়ন চলেছিল। পরবর্তীকালে এই আলোড়নের সমাপ্তি ঘটে হরিহর মূর্তির কল্পনাতে। তখন থেকে শিব ও বিষ্ণু হিন্দুসমাজের কাছ থেকে সমানভাবে পূজা পেতে থাকলেন। এমন কি একই পরিবার দুই দেবতার আরাধনা সমানভাবে করতে লাগল। রাজা-রাজড়াদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হল। যেমন সেনবংশের বিজয় সেন ও বল্লাল সেন উভয়েই ছিলেন পরম-মাহেশ্বর অর্থাৎ শৈব। পরন্তু লক্ষ্মণ সেনের দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন উভয়েই ছিলেন নারায়ণ এবং সূর্যভক্ত। বিষ্ণুপুরের রাজারাও পরমবৈষ্ণব হলেও, তাঁরা-মল্লেশ্বর শিবমন্দিরও নির্মাণ করে-ছিলেন। অর্থাৎ, পরবর্তীকালে বিষ্ণু ও শিব অবিসংবাদিতভাবে হিন্দুসমাজের সকল শ্রেণীর লোক কর্তৃক সমানভাবে পূজিত হয়েছেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের মূল প্রশ্ন "শিব বড়, না বিষ্ণু বড়?" অমীমাংসিত রয়ে গেল। তবে এখানে আমি একটা ইঙ্গিত করতে পারি। বিষ্ণুর স্ত্রী শিবকন্যা লক্ষ্মী। সুতরাং শিব শ্বশুর, বিষ্ণু জামাতা। এখন পাঠক নিজেই বিচার করুন—জামাই বড়, না শ্বশুর বড়!

পঞ্চকন্যা নিত্যস্মরণীয়া কেন ?

বাঙালী মেয়েরা এখন আর সকালে ঘুম থেকে উঠে পঞ্চকন্যার নাম স্মরণ করে না। বোধ হয় তারা পঞ্চকন্যার নামও জানে না। অথচ পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পর্যন্ত এদেশের মেয়েরা সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই পঞ্চকন্যার নাম উচ্চারণ করত। বর্ষীয়সীরা আজও করে। যুগ-যুগ ধরে এই সংস্কারই মেয়েদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল যে, সকালে ঘুম থেকে উঠে পঞ্চকন্যার নাম স্মরণ করলে, দিনটা ভাল যাবে ও তাদের মঙ্গল হবে। পঞ্চকন্যার নামের যখন এতই মাহাত্ম্য, তখন পঞ্চকন্যারা নিশ্চয়ই আদর্শচরিত্রা। আদর্শচরিত্রা নারী বলতে আমরা সতীরমণী বুঝি। মনুর বিধান অনুযায়ী সেই নারীই হচ্ছে সতীরমণী যে অক্ষতযোনি অবস্থায় বিবাহিতা হয়ে পতি ব্যতীত অপর কারুর প্রতি অনুরক্ত হয় না, এবং পতির মৃত্যুর পর কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করে বাকী জীবন অতিবাহিত করে। সেই সব লক্ষণের দিক্ দিয়ে পঞ্চকন্যার কেউই সতী নয়। সকলেই অসতী।

নিত্যস্মরণীয়া পঞ্চকন্যা হচ্ছেন অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী। এই পঞ্চকন্যার মধ্যে তিনজন হচ্ছেন রামায়ণের চরিত্র, আর দুজন মহাভারতের। রামায়ণের সবচেয়ে বড় সতীরমণী হচ্ছেন সীতা, আর মহাভারতের সাবিত্রী। এ ছাড়া, সত্যযুগে দক্ষরাজার মেয়ে শিববনিতা সতীও বড় সতী ছিলেন। অথচ, এঁদের কারুর নামই পঞ্চকন্যার নামের তালিকায় স্থান পায়নি। এটা খুবই বিচিত্র ব্যাপার।

পঞ্চকন্যার সকলেরই চরিত্র দুষ্ট। অহল্যার চরিত্র রামায়ণের আদিকাণ্ডের ৪৮-৪৯ সর্গে ও উত্তরকান্ডের ৩৫ সর্গে বিবৃত হয়েছে। অহল্যা ছিলেন বিরূপতাশূন্যা অদ্বিতীয়া সুন্দরী। সে-জন্যই তাঁর নাম হয়েছিল অহল্যা। তিনি ছিলেন গোতম ঋষির স্ত্রী ও ধর্মপত্নী। গোতমের সঙ্গে অহল্যার বিবাহ হওয়ায়, ইন্দ্র হয়েছিলেন ঈর্ষাপরায়ণ। ইন্দ্রের ধারণা ছিল যে, এই অপূর্ব-সুন্দরী রমণী তাঁরই প্রাপ্য। একদিন গোতম আশ্রম থেকে স্নান করতে বেরিয়ে গেলে, ইন্দ্র গোতমের রূপ ধরে অহল্যার কাছে এসে তাঁর সঙ্গম প্রার্থনা করেন। অহল্যা ইন্দ্রকে চিনতে পেরেও সেই সময় কামার্তা ছিলেন বলে দুর্মতিবশত ইন্দ্রের দ্বারা নিজের কামলালসা পরিতৃপ্ত করেন। অহল্যার অসতীপনা সম্বন্ধে কোন

সন্দেহই থাকতে পারে না। কেননা, বাল্মীকি লিখে গেছেন যে, ইন্দ্র অহল্যাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—'ঋতুকালং প্রতীক্ষ্যন্তে নার্থিন সুসমাহিতে। সংগমং ত্বহমিচ্ছামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে॥' (রামায়ণ ১।৪৮।১৮)। 'হে সুমধ্যমে! তুমি সুবেশা ঃ তোমার সহিত আমি সংগম ইচ্ছা করছি, রমণার্থী ব্যক্তি ঋতুকাল প্রতীক্ষা করতে পারে না।' অহল্যা ইন্দ্রকে চিনতে পেরেও দুর্বুদ্ধিবশতঃ ও রমণার্থ কৌতূহলী হয়ে ইন্দ্রের অভিলাষ পূর্ণ করলেন। শুধু তাই নয়, কৃতার্থা ও পূর্ণমনোরথা হয়ে ইন্দ্রকে বললেন—'কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো। আত্মানঞ্চ মাঞ্চ দেবেশ সর্বথা রক্ষ গৌরবাৎ॥' (রামায়ণ ১।৪৮।২১)। 'হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি কৃতার্থা হয়েছি ; প্রভো! এখান হতে শীঘ্র প্রস্থান কর ; সর্বথা আমার ও আপনার গৌরব রক্ষা কর।' সুতরাং অহল্যা যে সজ্ঞানে এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় কামলালসা পরিতৃপ্ত করবার জন্য ইন্দ্রের রমণাভিলাষ পূর্ণ করেছিলেন এবং নিজেও বিশেষ কৃতার্থা ও পূর্ণমনোরথা হয়েছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। (অহল্যার এই কামলালসা চরিতার্থ করবার পাপের জন্য পরবর্তীকালে কালিদাস তাঁর রঘুবংশে অহল্যাকে গৌতমের শাপে পাষাণময়ী করেছিলেন ; রামায়ণে সে-কাহিনী নেই)। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এহেন অসতী নারী পঞ্চকন্যার মধ্যে স্থান পেলেন কেন ?

॥ দুই ॥

সকলেরই জানা আছে যে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হয়ে অর্জুনই লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীর বরমাল্য লাভ করেছিলেন। মহাভারতের আদিপর্বে ব্যাস বলেছেন—'বিদ্ধন্তু লক্ষ্যং প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণা / পার্থঞ্চ শত্রু প্রতিমং নিরীক্ষ্য। স্বভ্যস্তরূপাপি নবেব নিত্যং / বিনাপি হাসং হসতীব কন্যা॥ মদাদৃতেঽপি স্খলতীব ভাবৈ / র্বাচা বিনা ব্যাহরতীব দৃষ্ট্যা।' (মহাভারত ১।১৮৭।১৭)।

'লক্ষ্য বিদ্ধ হয়েছে দেখে এবং ইন্দ্রতুল্য পার্থকে নিরীক্ষণ করে কুমারী কৃষ্ণা হাস্য না করেও যেন হাসতে লাগলেন। বহুবার দৃষ্টি হলেও তাঁর রূপ দর্শকদের কাছে নূতন বোধ হল। বিনা মত্ততায় তিনি যেন ভাবাবেশে স্খলিত হতে লাগলেন, বিনা বাক্যে যেন দৃষ্টি দ্বারাই বলতে লাগলেন।' সুতরাং অর্জুনই যে দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পরমুহূর্তেই আমরা এক আজগুবী গল্প দেখি। দ্রৌপদীকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব উপস্থিত হয়ে গৃহের বহির্দেশ থেকে মাতা কুন্তীকে বলেন যে—'দ্যাখ, আজ

আমরা কি অপূর্ব সামগ্রী ভিক্ষা করে এনেছি।' কুটিরের ভিতর থেকেই কুন্তী বলেন—'তোমরা সকলে মিলে তা ভোগ কর।' সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীর পতি হয়ে গেলেন। এখানে দুটি বক্তব্য আছে। প্রথম, কুন্তী যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, তখন তিনি দ্রৌপদীর বহুপতিত্বটা 'পাপ'কর্ম বলে মনে করেছিলেন? কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি কেন পাপের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন? দ্বিতীয়, অন্যান্য রাজন্যবর্গ দ্রুপদ-নির্মিত কৃত্রিম আকাশযন্ত্র দুর্জয় ধনুদ্বারা লক্ষ্যভেদ করতে অকৃতকার্য হলেই, অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে 'জয়' করেছিলেন। সুতরাং এখানে ভিক্ষালব্ধ অপূর্বসামগ্রীর কথা আসেই না। এছাড়া, যে-দ্রৌপদী স্বজনবর্গ ও সমবেত রাজন্যবৃন্দের সমক্ষে তেজস্বিতার সঙ্গে কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করে বলতে পেরেছিলেন—'আমি হীন-জাতীয় সূতপুত্রকে কখনও বিবাহ করব না।' সেই দ্রৌপদীই মাত্র কুন্তীর কথায় (কুন্তী সেটাকে 'পাপ' কর্ম বলা সত্ত্বেও) তাঁর পঞ্চপতিত্ব মেনে নিলেন, এটা দ্রৌপদীর পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক আচরণ। দ্রৌপদী যদি পঞ্চপতির প্রতি সমানভাবে অনুরক্তা থাকতেন, তা হলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু দ্রৌপদী সমানভাবে তাঁর পতিগণের প্রতি অনুরক্তা ছিলেন না। সে কথা মহাপ্রস্থানিক পর্বে যুধিষ্ঠির নিজেই বলে গেছেন। তিনি দ্রৌপদীর এটা অধর্মাচরণ মনে করেছিলেন। (দ্রৌপদীর বিবাহরহস্য সম্বন্ধে যাঁরা বিশদভাবে জানতে চান, তাঁরা আমার 'ভারতে বিবাহের ইতিহাস' ও 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থদ্বয় দেখুন)। সতী রমণীর একাধিক পতি থাকতেই পারে না। সে ক্ষেত্রে পাঁচ-ভাতারী দ্রৌপদী কিভাবে নিত্যস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার মধ্যে স্থান পেলেন, সেটাই অত্যন্ত রহস্যাবৃত ব্যাপার।

এবার কুন্তীর কথায় আসা যাক্। কুন্তীভোজের এই পালিতা কন্যার কুমারী অবস্থাতেই একটি ছেলে হয়েছিল। কলঙ্কের ভয়ে কুন্তী ছেলেটিকে একটি পাত্রে রেখে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এই পুত্রই কর্ণ। এই পুত্রলাভ সম্বন্ধে মহাভারতের আদিপর্বে যে-কাহিনী বিবৃত আছে, তা হচ্ছে—এক সময়ে মহর্ষি দুর্বাসা অতিথিরূপে কুন্তীভোজের গৃহে এলে, কুন্তী তাঁকে পরিচর্যায় সন্তুষ্ট করেন। তখন দুর্বাসা তাঁকে একটি অমোঘ মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বলেন যে, এই মন্ত্রের প্রভাবে কুন্তী যে দেবতাকে স্মরণ করবেন, সেই দেবতাই তাঁর কাছে আসবে এবং তাঁর প্রসাদে কুন্তীর পুত্রলাভ হবে। কৌতূহলবশে কুন্তী সূর্যকে আহ্বান করেন এবং তাঁর সঙ্গে মিলনের ফলে

কুন্তীর দেবকুমারের ন্যায় এক পুত্রলাভ ঘটে এবং সূর্যের বরে কুন্তী কুমারীই থেকে যান। এটা সকলেরই জানা আছে যে, জীবজনিত কারণ (biological reason ব্যতীত কখনও মাতৃত্ব হয় না। সুতরাং সূর্যের সংগে মিলন ও পুত্রলাভের কাহিনীটাই অলীক। তাছাড়া, যেখানে দুর্বাসার বরে এই মিলন ঘটেছিল এবং সূর্য তাঁকে কুমারীত্বের আশ্বাস দিয়েছিলেন, সে ক্ষেত্রে কোন 'কলঙ্কের' ভয়ে কুন্তী তাঁর পুত্রকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন? এর উত্তর আমরা চাই না। শুধু এই কথা বলতে চাই যে, কুন্তীর আচরণ অনুযায়ী কুন্তী ছিলেন কলঙ্কিতা নারী। তারপর কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন প্রভৃতি পুত্রের জন্ম নিজ পতির ঔরসে ঘটেনি; ঘটেছিল অপর পুরুষের ঔরসে। কুন্তী-চরিত্রের এসব কলঙ্ক থাকা সত্বেও, কুন্তী নিত্যস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার অন্যতমা কেন?

তারা ও মন্দোদরী এ দু'জনের ব্যাপার একই। দু'জনেই রামের আদেশে নিজ নিজ দেবরকে বিবাহ করেছিলেন। 'তারা' ছিলেন কিষ্কিন্ধ্যার বানরাধিপতি বালীর স্ত্রী। বালী রামচন্দ্রের হাতে নিহত হলে, 'তারা' রামের আদেশে সুগ্রীবকে বিবাহ করেছিলেন। আর মন্দোদরী ছিলেন রাবণের প্রধান মহিষী। রাবণ-বধের পর রামের আদেশে যখন বিভীষণ লঙ্কার রাজা হন, তখন মন্দোদরী রামের আদেশে বিভীষণকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। মনু নারীর দ্বিতীয়বার বিবাহের কোন বিধান দেননি। এক্ষেত্রে প্রাচীনকালে প্রচলিত 'নিয়োগ'-প্রথা অনুযায়ী দেবরের সহিত মিলিত হবার প্রশ্নও ওঠে না। কেননা, নারী যে ক্ষেত্রে সন্তানের জননী নয়, মাত্র সেক্ষেত্রেই 'নিয়োগ'-প্রথা ব্যবস্থিত ছিল। তারা ও মন্দোদরী দুজনেই সন্তানের জননী ছিলেন। বালির ঔরসে তারার গর্ভে অংগদ নামে পুত্রের জন্ম হয়েছিল। আর রাবণের ঔরসে মন্দোদরীর মেঘনাদ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি পুত্রলাভ ঘটেছিল। সুতরাং এদের বিবাহ 'নিয়োগ'-প্রথার সামিল নয়। 'নিয়োগ'-প্রথা ছিল সন্তান উৎপাদনের অধিকার, আর বিবাহ হচ্ছে সাধারণ রমণের অধিকার। মনুর বিধান অনুযায়ী তারা ও মন্দোদরী উভয়েই পুতচরিত্রা সাধবী রমণী নন। তা ছাড়া, উভয়েই ছিলেন অনার্য সমাজভুক্ত। অথচ, এঁরা নিত্যস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার মধ্যে স্থান পেলেন কেন?

॥ তিন ॥

পঞ্চকন্যার সকলেই অসতী। অথচ পঞ্চকন্যা নিত্যস্মরণীয়া কেন? এর

একমাত্র উত্তর যা আমরা দিতে পারি, তা হচ্ছে এই যে, পঞ্চকন্যার নাম স্মরণ করবার প্রথা এমন এক যুগ থেকে চলে এসেছে, যে-যুগে বিবাহিতা নারীর পক্ষে স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষের সঙ্গে যৌনসংসর্গ নিন্দিত ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর এই ধরনের যৌনমিলন তো ঘটতই, স্বামী জীবিত থাকাকালীনও এরূপ মিলন ঘটত। এছাড়া, কুমারী মেয়েদের যৌনসংসর্গও সমাজে বরদাস্ত হত। কুমারী কন্যার পক্ষে গর্ভধারণ করাও অতীব নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল না। (আমার 'ভারতে বিবাহের ইতিহাস' ও 'Sex and Marriage in India' বই দুখানি দ্রষ্টব্য।) এরূপ মিলনে প্রাচীন স্মৃতিকারদের অনুমোদন ছিল। এ সব বাতিল হয়ে যায় মনুর 'মানবধর্মশাস্ত্র' রচনার পর। তখন অন্যান্য স্মৃতিকাররা একতানে বললেন—'মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ণ প্রশস্যতে।' তার মানে, যে স্মৃতি মনুর বিপক্ষে বিধান দেয়, সে স্মৃতি স্মৃতিই নয়। পরবর্তীকালে মনুর সংবিধান অনুযায়ী মনুর বিবাহ-বিধানই প্রাধান্য লাভ করে। মনুর বিধানের ফলে সতী বা পতিব্রতা নারীর সংজ্ঞারও পরিবর্তন ঘটে। মনুর বিধানের ফলে যে আদর্শ (norms) গঠিত হয়, তা হচ্ছে—(ক) কন্যার বিবাহ দিতে হবে ঋতুমতী হবার পূর্বে, (খ) বিবাহিতা নারীকে সতীত্বের সমস্ত বিধান অনুসরণ করে পতিব্রতা হয়ে থাকতে হবে, (গ) স্বামীর মৃত্যুর পর নারীকে সধবার সমস্ত ভূষণ পরিহার করে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, (ঘ) পরস্ত্রীগমন ব্যভিচার বলে গণ্য হবে এবং তার জন্য ব্যভিচারীকে গুরুদণ্ড পেতে হবে। উত্তরকালের নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজের যৌনজীবন এই সকল বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

॥ চার ॥

আমি খুবই সচেতন যে, উপরে যে ব্যাখ্যা দিলাম, এটা কোন ব্যাখ্যাই নয়। তার কারণ, এ ব্যাখ্যাকে অর্থবাহক করতে হলে আমাকে ধরে নিতে হবে যে, পঞ্চকন্যা সম্পর্কিত যে কাহিনীসমূহ রামায়ণ ও মহাভারতে বিবৃত আছে, তার মধ্যে অনেক কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। কিন্তু সেটা হচ্ছে অনুমানের বিষয়। সবচেয়ে বড় সন্দেহ যেটা মনে জাগে, সেটা হচ্ছে মনুর বিধান স্বীকৃত হবার পরও কেন পঞ্চকন্যার নাম নিত্যস্মরণীয়া রইল ? আমার মনে হয়, আমার গোটা প্রশ্নটাই রয়ে গেল 'যথা পূর্বং তথা পরং'।

বাঙলার পুজা-নির্ভর শিল্প

খুব ছেলেবেলার কথা। আমাদের পাড়ায় বিশ্বাস-বাড়িতে দুর্গাপুজো হত। প্রতিমাটা ওঁদের বাড়ির ঠাকুর-দালানেই তৈরি হত। ওই প্রতিমা-গড়া দেখবার জন্য আমরা ছেলের দল সারা বৎসরই উৎসুক হয়ে থাকতুম। জন্মাষ্টমীর পর প্রতিমা গড়বার জন্য আসত কুমোরের দল। তখন তাদের কুমোর বলেই আমরা জানতুম। তারা যে আমাদের দেশের এক রকম শিল্পী, যারা দেবতাকে দেয় রূপ, তা জানতুম না। সে চেতনা তখনও আমাদের হয় নি।

প্রতিমাটা গড়া হত একটা কাঠের তৈরি কাঠামোর ওপর। ওই কাঠামোটা ওঁদের বহুকালের। অতীতে ওঁদের কোন এক পূর্বপুরুষ, যিনি প্রথম দুর্গাপুজো স্থাপন করেছিলেন, তিনিই ওটা তৈরি করিয়েছিলেন। তারপর থেকে ওই কাঠামোটাই প্রতি বৎসর পুজো করে ওর ওপর প্রতিমা গড়া হত।

কুমোররা এলেই আমরা ছেলের দল ঠাকুরদালানে ওঠবার সিঁড়ির এক পাশে গিয়ে বসতুম এবং কুমোররা কি করে ঠাকুর গড়ে তা দেখতুম।

কুমোররা আসত কুমোরটুলি পাড়া থেকে। তাদের ওখানে বাস প্রায় দুশো বছরের। আগে তাদের বাড়ি ছিল মৃৎশিল্পের দেশ নদীয়ায়। গোড়ায় গোড়ায় ওরা আসত মাত্র কয়েক মাসের জন্য। নৌকায় চড়ে নদীয়া থেকে কলকাতায় আসত বর্ষার শেষে। দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ থেকে শুরু করে সরস্বতী প্রতিমা নির্মাণ পর্যন্ত, এই ক'মাস তারা কুমোরটুলিতে বাসা ভাড়া করে থাকত। তারপর আবার দেশে ফিরে যেত। পরে ওরা কলকাতাতেই স্থায়ী বসবাস শুরু করে। তখন কুমোরটুলিতে একটা কুমোরবস্তি গড়ে ওঠে।

আমরা বিশ্বাস-বাড়িতে বসে ঠাকুর-গড়া দেখতুম। ভারী আনন্দ হত দেখতে, কি ভাবে ওরা বেলে মাটি, এঁটেল মাটি, তুষ, গোবর ইত্যাদি দিয়ে, দেবতার মূর্তি গড়ে তোলে। কখনও কখনও দেখতে দেখতে আমরা এমনই বিহ্বল হয়ে পড়তুম যে, খাওয়া-দাওয়ার কথাও ভুলে যেতাম। বাড়ি থেকে ডাকের পর ডাক আসত, কিন্তু আমাদের ঠাকুর-গড়া দেখাতেই মন থাকত।

পুজোর আর পনেরো কি কুড়ি দিন দেরি আছে। বাবা সেদিন রাত্রে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁরে, বিশ্বাসবাড়ির ঠাকুর-গড়া কি শেষ হল?"

বললাম, "প্রায়ই শেষ হয়ে এসেছে, এখন শুধু রঙ করা ও ডাকের সাজ-সাজানো বাকী আছে।"

॥ দুই ॥

কুমোরের কাজটা যে একটা বিশিষ্ট শিল্প, তা বেশ বড় হয়ে বুঝলাম। কুমোরপাড়ার তখন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কারিগর হচ্ছেন গোপেশ্বর পাল। কুমোরপাড়ায় অত বড় শিল্পী আর জন্মান নি। তাঁর হাত ও মনের মধ্যে ছিল ভগবানের অসীম করুণা। দু-চার মিনিটের মধ্যেই যে-কোন লোকের আবক্ষমূর্তি তিনি তৈরি করে ফেলতে পারতেন। তাঁর শিল্পশক্তির পরিচয় দেবার জন্য তিনি আহূত হলেন লন্ডনের ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে। ডেক প্যাসেঞ্জার হয়ে যাচ্ছিলেন বিলাতে। একদিন হঠাৎ জাহাজের ক্যাপটেনের নজরে পড়ল, লোকটা সারাদিন ধরে মাটি নিয়ে কি গড়ে, আর ভাঙে। মুহূর্তের মধ্যে গোপেশ্বর তৈরি করে দিল ক্যাপটেনের মূর্তি। চমৎকৃত হলেন ক্যাপটেন। বুঝলেন লোকটা মস্ত বড় শিল্পী। নিজের দায়িত্বেই শিল্পীকে নিয়ে গিয়ে স্থান দিলেন সেকেন্ড ক্লাস কেবিনে। এ-সব রূপকথার মত শোনায়, কিন্তু সবই সত্য।

একজিবিশনে আসছেন ডিউক অভ্ কনট। বেংগল প্যাভিলিয়নে থাকবেন মাত্র পাঁচ মিনিট। কিন্তু ওই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গোপেশ্বর তৈরি করে দিলেন ডিউক অভ্ কনটের মূর্তি। অবাক্ হয়ে গেল দর্শকরা। গোপেশ্বর পালের সমকক্ষ না হোক, এরকম শিল্পী কুমোরটুলিতে বহুকাল ধরেই আছেন। তবে তাঁরা অবহেলিত।

ঠাকুর গড়ার কথা বলতে গিয়ে ডাকের সাজের কথা বলেছি। এ যারা তৈরি করে, তারাও বড় শিল্পী। তারা মালাকার-শ্রেণীরই এক শাখা। এদের উপাদান হচ্ছে শোলা। শোলা নিচু জমিতে আপনি আপনিই জন্মায়। নদীয়া জেলার বাতের বিলে যে শোলা জন্মায়, তাই হচ্ছে উৎকৃষ্ট। সেজন্য নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ, মাতিয়ারী ও কৃষ্ণনগর সদরই হচ্ছে শোলা-শিল্পীদের কেন্দ্র। তবে অন্য জেলাতেও অনেক শোলা-শিল্পী আছে। যথা, হাওড়া জেলার বালী-বারাকপুর ও আমতা; হুগলির ডানকুনি, উত্তরপাড়া ও শিয়াখালা; চব্বিশ পরগনার খড়দহ; মেদিনীপুরের তমলুক ও গড়বেতা; বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী; বর্ধমানের কাটোয়া, দোমহনী ও জামুরিয়া;

মুরশিদাবাদের বহরমপুর ও বেলডাঙ্গা ; বীরভুমের খয়রাশোল, দুবরাজপুর ও ময়ূরেশ্বর। খাস কলকাতাতেও অনেক মালাকার-পরিবারের বাস আছে। এরা মায়ের গায়ের সাজ ছাড়া, চাঁদমালা, কদমফুল, পদ্মফুল প্রভৃতি যা পুজো-উৎসবে লাগে, তা তৈরি করে।

॥ তিন ॥

পুজোর একটা অংগ হচ্ছে ঢাকের বাজনা। ঢাকীরা বছরের অপর সময় চাষবাস বা অন্য কাজ করে। পুজোর সময়েই এরা কলকাতায় আসে ঢাক বাজাবার জন্য। বড় বড় রাস্তার মোড়ে যেমন শ্যামবাজার, শোভাবাজার, বৌবাজার, মৌলালি বা জানবাজার প্রভৃতি জায়গায় এসে এরা জড় হয়। সেখান থেকেই পুজোবাড়ির লোকেরা এদের ভাড়া করে নিয়ে আসে। অনেক পুজোবাড়ির আবার বাঁধা ঢুলির দলও আছে। তারা ঠিক সময় ওই সব বাড়িতে এসে হাজির হয়। আজ মাইকের অভিঘাতে এরা প্রত্যাখ্যাত। অথচ এদের মধ্যেই এমন সব সানাইবাদক ছিল, যারা আজকালকার নামজাদা সানাই-বাদকদের চেয়ে কম কৃতবিদ্য নয়। পুজোমণ্ডপে তাদের আলাপিত রাগ-রাগিণী আজ হারিয়ে গেছে মাইক-পরিবেশিত চিত্র-তারকাদের গানের প্রতিঘাতে।

আরও অনেক পুজো-নির্ভর শিল্প ছিল, যেমন মিষ্টান্নশিল্প, যাত্রাগান ইত্যাদি। দুর্গাপুজোর সময় এ সকল শিল্পের গুরুত্ব খুব কম ছিল না। তবে একশ বছর আগে পুজোর মিষ্টান্ন বলতে যা বোঝাতো এখন তা বোঝায় না। তখনকার দিনে পুজোবাড়ি ও বিয়েবাড়িতে খই-মুড়কি ও নারিকেল নাড়ুর ছড়াছড়ি ছিল। তখনকার দিনে মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণদের খাওয়ানো হত ফলার, আর সাধারণ লোককে ভাত-তরকারি। বিজয়া দশমীর দিন অভ্যাগতদের নারিকেলের তৈরি মিষ্টান্ন দেওয়া হত। এখন সে সবও উঠে গেছে।

আর যাত্রাগান ইত্যাদির ব্যাপারে প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল জমিদার ও মধ্যবিত্ত ধনীসম্প্রদায়। তখনকার দিনে দুর্গোৎসবে হত যাত্রাগান ও বাসন্তী পুজোয় কবিগান। গ্রাম্যপুজোয় যাত্রাগানের ধুমধাম শহরের চেয়ে অনেক বেশি হত। বড় বড় যাত্রাওয়ালাদের শহর থেকে বায়না করে নিয়ে যাওয়া হত গ্রামে। তা ছাড়া কোন কোন গ্রামে নিজস্ব সখের যাত্রার দলও ছিল। গাঁয়ের লোকেরা কবির গানও বাঁধতেন। একজন গানের প্রথম কলির পদ রচনা করতেন, অপর একজন তার পরের পদের যোগান দিতেন। যে-সব গান

এরকমভাবে তৈরি হত, তা মুখে মুখে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ত। এখন জমিদার-শ্রেণীর বিলুপ্তির সঙ্গে এদেরও বিলুপ্তি ঘটেছে। এসব এক সময় সমাজ-জীবনের অংগবিশেষ ছিল। কালের চাকার বিবর্তনে, সমাজ-জীবনের সে পরিবেশ আজ বিধ্বস্ত।

॥ চার ॥

মোটকথা, আজকালকার দিনে পূজার সময় আমাদের সমাজ-জীবনের অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত টিকে আছে শুধু তন্তুজ শিল্প। তা সে পূজার সময় নতুন কাপড় না পরলেই নয়, সেজন্য।

"আনন্দময়ীর আগমনে, আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।"—এ গান থেকে বুঝতে পারা যায় যে, পূজার সময়ে সমাজ-জীবনে বয়ে যেত এক অপূর্ব আনন্দের ঢেউ। বিশেষ করে, আজকের অবহেলিত শিল্পীদের আনন্দই ছিল সবচেয়ে বেশি। কেননা, পূজার সময়টাই ছিল তাদের মরশুমের সময়। আজ পূজানির্ভর শিল্পগুলি অধিকাংশই অবহেলিত। তাদের কোন দিনই আমরা সম্বর্ধনার আসরে ডাকিনি। তাদের জন্য কোন সম্মান, পুরস্কার বা শিরোপাও রেখে দিইনি। অথচ একদিন তারাই ছিল আমাদের পূজার আনন্দের উৎস।

শিল্পে মহিষমর্দিনী

বর্তমান কালে আমরা মহিষমর্দিনীর যে প্রতিমা পূজা করি, তাহাতে দেবী দশভুজারূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকেন। প্রাচীন কালে কিন্তু দেবী সর্বত্র দশভুজারূপে কল্পিত হইতেন না। পুরাণাদি গ্রন্থে ও শিল্প-শাস্ত্রের নানাস্থানে মহিষমর্দিনী প্রতিমার লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। পুরাণে—দেবী দশভুজা, প্রতি হস্তে তাঁহার থাকিবে এক একটি অস্ত্র, সিংহ হইবে তাঁহার বাহন এবং তিনি থাকিবেন মহিষাসুর-বধে রত। হেমাদ্রি অনুরূপ লক্ষণই নির্দেশ করিয়াছেন, কেবল বলিয়াছেন যে, দেবী বিংশভুজা। শিল্পরত্ন অনুসারে—দেবীর তিন নেত্র, মস্তকে জটামুকুট, অতসী ফুলের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, নীলোৎপলের ন্যায় চক্ষু, উচ্চ বক্ষ, ক্ষীণ কটি ও ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গীতে তিনি দণ্ডায়মান। তিনি দশভুজা—দক্ষিণ হস্তে তাঁহার থাকিবে ত্রিশূল, খড়্গ শক্ত্যায়ুধ, চক্র ও ধনু এবং বাম হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, খেটক, পরশু ও ঘণ্টা।

যদিও প্রাচীন সাহিত্যের বহুস্থানে দেবী দশভুজারূপে কল্পিত হইয়াছেন, তথাপি প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শনানুসারে দেবী মহিষমর্দিনীর মূর্তি প্রাচীনকালে দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা ও অষ্টভুজা রূপেও নির্মিত হইত। বস্তুতঃ এযাবৎ মহিষমর্দিনীর যত প্রাচীনমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রাচীনতমটি দ্বিভুজা। যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত আলাহাবাদ শহরের নিকটবর্তী ভিটা নামক গ্রামে, উপর হইতে ৯ ফিট নীচে মাটির অভ্যন্তরে গুপ্তযুগের অন্যান্য ধ্বংসাবশেষের সহিত এই মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মূর্তি উচ্চতায় মাত্র পৌনে নয় ইঞ্চি। নির্মাণ-কৌশলের দিক দিয়া এ মূর্তিটি ভারতীয় শিল্পের এক নিকৃষ্ট নিদর্শন। দেবীর মাত্র দুইটি হস্ত। এক হস্তের দ্বারা মনে হয় তিনি মহিষের গ্রীবাভাগ মর্দন করিতেছেন ও অপর হস্তে এক অস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন। ইহার কিছু পরবর্তী কালের আরেকটি মূর্তিও ভিটা গ্রামের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রথম মূর্তি অপেক্ষা দ্বিতীয় মূর্তিটি সুন্দর। ইহারই অনুরূপ আরেকটি মূর্তি মথুরায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, এইরূপ মূর্তি তখনকার সময়ে নির্মাণ করিবার একটি বিশিষ্ট রীতি ছিল। দুইটি মূর্তিতেই দেবী চতুর্ভুজা এবং উচ্চতায় ৭½ ইঞ্চির অধিক নয়। দেবী উপবিষ্টা—মহিষ তাঁহার পদতলে দলিত। দক্ষিণের উপর হস্তে ধৃত একটি অস্ত্রের দ্বারা তিনি মহিষের

কণ্ঠদেশ বিদীর্ণ করিতেছেন। বামদিকের নীচের হস্তদ্বারা তিনি মহিষের লেজ ধরিয়াছেন ও অপর দুই হস্তে দুইটি অস্ত্র আছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, তিনটি মূর্তিতেই দেবীর বাহন সিংহ প্রদর্শিত হয় নাই এবং অসুর মহিষাকারেই চিত্রিত। তিনটি মূর্তিই বর্তমানে কলিকাতার জাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে।

॥ দুই ॥

ভিটার ও মথুরার শেষোক্ত মূর্তি দুইটির সমসাময়িক যুগের দুইটি চতুর্ভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি পশ্চিম ভারতের অন্তর্গত বাদামী গুহায় দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গগত প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের Bas Reliefs of Badami নামক গ্রন্থে উভয় মূর্তিরই চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। চালুক্য বংশীয় রাজা মঙ্গলেশের রাজ্যকালে (৫৭৮ খ্রী.) মূর্তি দুইটি খোদিত হইয়াছিল। প্রথম মূর্তিটি বাদামীর ১নং গুহার মধ্যে একটি বেদীর উপর সংস্থাপিত, দেবী চতুর্ভুজা, দক্ষিণপদ তাঁহার ভূমিতলে, বামপদ মহিষের মস্তকোপরি, বাম হস্তদ্বয়ে চক্র ও ত্রিশূল এবং দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও মহিষের পুচ্ছ। ত্রিশূলের নিম্নভাগ বর্শাফলকের ন্যায় এবং তদ্দ্বারা তিনি মহিষকে বিদীর্ণ করিতেছেন, পুচ্ছদ্বারা মহিষটির দেহ সবেগে উপরে তুলিতেছেন। দেবীর উভয় পার্শ্বে দুইজন গন্ধর্ব অনুচর।

বাদামীর দ্বিতীয় মূর্তিটি ২নং গুহার দরজার মাথার উপর খোদিত আছে। দেবীর সহিত মহিষের সংঘর্ষ এখানে অতি সুন্দর ও বিশদরূপে চিত্রিত হইয়াছে। সমস্ত খোদিত অংশটিকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে—দেবতারা বিপদাপন্ন হইয়া দেবীর নিকট যাইতেছেন। দ্বিতীয়ভাগে দেবী সিংহাসনে উপবিষ্টাবস্থায় দেবতাগণের প্রার্থনা শুনিতেছেন। তৃতীয়ভাগে সংঘর্ষের দৃশ্য—মহিষাসুরের পরাজয় ও বিনাশ। দেবী চতুর্ভুজা—বাম দিকের উপর হস্তে ধৃত এক ত্রিশূল দ্বারা তিনি অসুরকে বিদীর্ণ করিতেছেন। বামদিকের নিম্নহস্তে এক তরবারী বা গদা। দক্ষিণ দিকের হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে মহিষের শৃঙ্গ ও শঙ্খ। দেবীর পশ্চাদ্ভাগে দেবতাগণের সহিত অসুরগণের সংঘর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। দেবীর পদতলে এক অসুরের মৃতদেহ।

চতুর্ভুজা মহিষমর্দিনীর একটি সুন্দর মূর্তি ভোগেল (Vogel) চম্বার

আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। মূর্তিটির গাত্রস্থ লিপি হইতে জানা যায় যে, মূর্তিটি আনুমানিক ৭০০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। এই মূর্তিটির লক্ষণগুলি দুর্গাসপ্তশতীর বর্ণনার সহিত মিলিয়া যায়। দেবী চতুর্ভুজাও মহিষাসুরবধে নিযুক্তা। দক্ষিণ হস্তে ধৃত ত্রিশূল দ্বারা তিনি মহিষাসুরের কণ্ঠ বিদীর্ণ করিতেছেন। বাম হস্ত দ্বারা অসুরের দেহ ভূমি হইতে তুলিয়া ধরিয়াছেন। দক্ষিণের অপর হস্তে তরবারী ও বাম হস্তে এক ঘণ্টা। মূর্তিটি ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চ। বাদামীর মূর্তিটির সহিত এই মূর্তিটির প্রভেদ এই যে—প্রথম মূর্তিটিতে দেবীর হস্তে যেখানে চক্র ও শঙ্খ, ইহার সেইস্থানে তরবারী ও ঘণ্টা আছে।

॥ তিন ॥

মধ্যযুগের মূর্তিগুলিতে দেবী অষ্টভুজারূপে প্রদর্শিত হইয়াছেন। অষ্টভুজা মহিষমর্দিনীর একটি সুন্দর মূর্তি ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলের উত্তর দিকের কুলুঙ্গীর মধ্যে স্থাপিত আছে। দেবী আট হাতে যথাক্রমে তরবারী, ঢাল, ত্রিশূল, সর্প, বর্শা. ধনু, তীর ও খড়্গ ধারণ করিয়া আছেন। মহিষাসুর-বধে তিনি নিযুক্তা।

উড়িষ্যার অন্তর্গত খিচিং হইতে কতকগুলি সুন্দর মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মূর্তিতে দেবী ত্রিভঙ্গভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। বাম-পদ তাঁহার ভূমিতলে, দক্ষিণপদ মহিষের পৃষ্ঠোপরি। মহিষের মুণ্ডহীন দেহ হইতে উদ্ধত অসুরের নররূপ বাহির হইয়া দেবীকে আক্রমণ করিতেছে। দেবী শূল দ্বারা অসুরকে বিদীর্ণ করিতেছেন। তাঁহার বামপদ অসুরের গণ্ডদেশে স্থাপিত। নিষ্ঠুর রণে নিযুক্ত থাকিলেও দেবীর মুখে এক অনির্বচনীয় শান্তি বিরাজ করিতেছে।

কুলুর অন্তর্গত বাজায়ুরের (Bajaur) শিবমন্দিরের উত্তর দিকের কুলুঙ্গীর মধ্যে মহিষমর্দিনীর একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্তিটিতে দেবীর পশ্চাদ্ভাগে বামদিকে এক দ্বিতীয় অসুরের মূর্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তরবারী দ্বারা সেই অসুর দেবীকে আঘাত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সম্মুখে আরেকটি অসুর ঢাল হস্তে দণ্ডায়মান। দেবীর পদতলে মহিষ—তাহার মুণ্ডহীন দেহ হইতে এক তৃতীয় অসুর আবির্ভূত হইয়াছে। ভোগেলের (Vogel) মতানুসারে প্রথম দুইটি অসুর শুম্ভ ও নিশুম্ভ ও তৃতীয়টি মহিষাসুর। দেবী যে পদ দ্বারা

মহিষকে দলন করিতেছেন, তাহার নিকটেই তাঁহার বাহন সিংহের মস্তক ভাগ। সিংহ দন্ত ও নখর দ্বারা চণ্ড ও মুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে আক্রমণ করিয়া দেবীকে রণে সাহায্য করিতেছে।

॥ চার ॥

মহিষমর্দিনীর এক বিচিত্র মূর্তি অসিয়ায় (Osia) শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার মহাশয় বহুকাল পূর্বে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অসিয়ায় পিপলা দেবীর মন্দিরে এই মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছিল। দেবীর উভয় পার্শ্বে কুবের ও গণপতির মূর্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। মূর্তিটি বিচিত্র। কেননা, পরবর্তী কালে দেবীর উভয়পার্শ্বে কার্তিক-গণেশকেই দেখিতে পাওয়া যায়—কুবের ও গণপতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহা অপেক্ষাও বিচিত্রতর আরেকটি মূর্তি কোনারকে পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্তিটিতে দেবীর উভয় পার্শ্বে জগন্নাথ ও শিবলিঙ্গ। অনেকের মতে মূর্তিটি শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের সমন্বয়সূচক। মূর্তিটি উচ্চতায় ২ ফুট ১০ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১ ফুট ৬½ ইঞ্চি। দেবী মহিষাসুর নিধনে রত। উভয় পার্শ্বে জগন্নাথ ও শিবলিংগ। দেবীর সম্মুখে রাজকীয় পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান। পণ্ডিত বিষণস্বরূপের মতানুসারে এই মূর্তিটি রামেশ্বর তীর্থে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক শিবলিংগ প্রতিষ্ঠার চিত্র।

উপরে বর্ণিত মূর্তিগুলির বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মধ্যযুগ পর্যন্তও মহিষমর্দিনীর বর্তমান প্রতিমার উদ্ভব হয় নাই বর্তমান প্রতিমা অতি আধুনিক।*

*এই প্রবন্ধটি পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বে (১৭ই আশ্বিন, ১৩৪২ সাল) 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় ছাপা হয়েছিল। মূলের ভাষা ও কথার কোন পরিবর্তন করিনি। গত ৪৫ বছরের মধ্যে ভারতের বহু জায়গা থেকে মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। বীরভূমের মহিষমর্দিনী মূর্তিসমূহের কথা 'ধর্মীয় চেতনার যাদুঘর' নিবন্ধে বলেছি। বাঙলার আরও অনেক জায়গা থেকে মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি কলকাতার বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। মনে হয় বর্তমান মূর্তির উদ্ভব হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা। তার মধ্যে কত কোটি যে মেয়েলী দেবতা, তার ইয়ত্তা নেই। এসব অধিকাংশ দেবতাকেই মেয়েরা 'ব্রত' হিসাবে আরাধনা করে। এই সকল ব্রত সম্পাদন সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না ওই ব্রত বা পুজা-সম্পর্কিত কোন ছড়া বা কাহিনী বলা হয়। ছড়া বা কাহিনীগুলো সবই অলিখিত। যদিও আজকাল ছাপাখানার দৌলতে এগুলোর কিছু কিছু ছাপা হয়েছে, তা হলেও মূলগতভাবে এগুলো অলিখিত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই অলিখিত সাহিত্য পুরুষ-পরম্পরায় চলে এসেছে।

যত দেবতা তত কাহিনী। সব দেবতার কাহিনী এখানে বিবৃত করা সম্ভবপর নয়। মাত্র প্রধান প্রধান কয়েকটা দেবতার 'কথা'ই এখানে বিবৃত করছি।

প্রথমেই ধরুন লক্ষ্মীর 'কথা'। একদিন নারায়ণের ইচ্ছা হল পৃথিবীর লোকেরা কিভাবে আছে, তা নিজের চোখে দেখতে যাবেন। লক্ষ্মীঠাকরুন তাঁকে ধরে বসলেন যে তিনিও সঙ্গে যাবেন। তাঁকে সঙ্গে নিতে নারায়ণ এক শর্তে রাজি হলেন। শর্তটা হচ্ছে এই যে, ধরাধামে অবতীর্ণের পর লক্ষ্মীঠাকরুন উত্তরদিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। কিন্তু পৃথিবীতে আসবার পর লক্ষ্মীঠাকরুনের কৌতূহল হল, নারায়ণ তাঁকে উত্তরদিকে তাকাতে মানা করলেন কেন, ওদিকে কি আছে তা তিনি দেখবেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উত্তরদিকে তাকালেন, এবং তাঁর চোখে পড়ল এক তিল-ক্ষেত। তিলের ফুল তাঁর মনকে হরণ করল, এবং তিনি রথ থেকে নেমে গিয়ে কয়েকটা ফুল তুলে আনলেন। নারায়ণ যখন ফিরে এসে লক্ষ্মীর এই কাণ্ড দেখলেন, তখন তিনি লক্ষ্মীকে বললেন—'এজন্যই আমি তোমাকে উত্তরদিকে তাকাতে মানা করেছিলাম ; তুমি কি জান না যে, ক্ষেত্রস্বামীর বিনা অনুমতিতে তাঁর ক্ষেত্র থেকে ফুল তোলা পাপ ? এখন তোমাকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, তিন বছর ওর গৃহে থেকে দাসীবৃত্তি করে।' তারপর নারায়ণ ও লক্ষ্মী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করে, ক্ষেত্রপতির গৃহে এসে বললেন—'দেখ, এই স্ত্রীলোক তোমার বিনা অনুমতিতে তোমার ক্ষেত থেকে তিল ফুল তুলেছে, এজন্য ওকে তিন বছর তোমার গৃহে দাসীবৃত্তি করতে হবে, তবে ওকে কখনও

উচ্ছিষ্ট খাদ্য দেবে না, ঘর ঝাঁট দিতে দেবে না এবং অপরের পরা ময়লাকাপড় কাচতে দেবে না।' এই কথা বলে নারায়ণ চলে গেলেন। ক্ষেত্রস্বামী নিজেও ব্রাহ্মণ ছিলেন, তবে অত্যন্ত দরিদ্র। স্ত্রী ছাড়া, তাঁর তিন ছেলে, এক মেয়ে ও এক পুত্রবধূ ছিল। তাঁদের নিজেদেরই খাওয়া জোটে না, তারপর আর একজনকে খাওয়াতে হবে এই ভেবে ব্রাহ্মণগৃহিণী খুব চিন্তিত হলেন। তিনি লক্ষ্মীকে বললেন—'মা, আমরা খুবই গরীব, আমাদের ঘরে চাল ডাল কিছুই নেই, তিন ছেলে ভিক্ষায় বেরিয়েছে, যদি কিছু জোগাড় করে আনতে পারে, তবেই আজ আমাদের খাওয়া হবে।' লক্ষ্মী দেখলেন ব্রাহ্মণগৃহিণী শতচ্ছিন্ন এক মলিন কাপড় পরে আছেন। তাই দেখে লক্ষ্মীঠাকরুনের দয়া হল। তিনি ব্রাহ্মণীকে বললেন—'চল তো মা, গিয়ে দেখি কেমন তোমার ঘরে কিছু নেই।' যখন ব্রাহ্মণগৃহিণী লক্ষ্মীঠাকরুনকে ঘরের ভিতর নিয়ে এলেন, তখন তিনি দেখে আশ্চর্য হলেন যে ঘর ভরতি রয়েছে চাল-ডাল, নুন, তেল, ঘি ইত্যাদি, এবং আলনায় ঝুলছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়। এই দেখে বাড়ির সকলেই খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং ভাবল এই স্ত্রীলোক নিশ্চয়ই কোন দেবী হবে। লক্ষ্মীকে কিছু না বলে, তাঁরা মনে মনে তাঁকে প্রণাম করল।

সেদিন থেকেই ব্রাহ্মণ-পরিবারের ঐশ্বর্য বাড়তে লাগল, এবং তারা লক্ষ্মীর প্রতি বিশেষ যত্নবান হল।

তিন বছরের শেষে একদিন গঙ্গায় পুণ্যস্নানের দিন এল। ব্রাহ্মণ-পরিবার গঙ্গাস্নানে যাবেন। তাঁরা লক্ষ্মীকেও তাঁদের সঙ্গে যেতে বললেন। লক্ষ্মী বললেন—'আমি যাব না, তবে আমি এই কড়ি পাঁচটা দিচ্ছি, তোমরা আমার নাম করে এই কড়ি পাঁচটা গঙ্গার জলে ফেলে দেবে।' গঙ্গাস্নান সারবার পর ব্রাহ্মণ-গৃহিণীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, লক্ষ্মী তাঁকে পাঁচটা কড়ি দিয়েছিলেন গঙ্গার জলে ফেলে দেবার জন্য। তিনি কড়ি পাঁচটা আঁচল থেকে খুলে যেমনি গঙ্গায় ফেলে দিলেন, দেখলেন যে, মা গঙ্গা নিজে মকরে চেপে এসে কড়ি পাঁচটা নিয়ে গেলেন। এই দেখে তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

বাড়িতে ফিরে এসে দেখলেন যে, দুয়ারে একখানা রথ দাঁড়িয়ে আছে। রথের ভিতর একজন ব্রাহ্মণ রয়েছেন, আর লক্ষ্মী এক পা রথে ও এক পা মাটিতে রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এই দেখে ব্রাহ্মণী লক্ষ্মীর পা জড়িয়ে ধরে বললেন—'মা, তোমাকে আমরা চিনতে পারি নি, আমাদের যা কিছু দোষ ত্রুটি হয়েছে আমাদের মাপ কর, আমাদের ছেড়ে তুমি যেও না।' লক্ষ্মী বললেন, 'মা,

আমার তো আর থাকবার উপায় নেই, তোমাদের বাড়ি দাসী হিসাবে থাকবার আমার তিন বছরের মেয়াদ ছিল, আজ তিন বছর উত্তীর্ণ হয়েছে, নারায়ণ এসেছেন আমাকে গোলোকে নিয়ে যাবার জন্য।' তিনি আরও বললেন—'তোমরা মনে ব্যথা পেও না, বাড়ির পিছনে বেলগাছের তলায় গিয়ে খনন কর, তোমাদের দুঃখ-কষ্ট ঘুচে যাবে ; আর ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ ও চৈত্র মাসে লক্ষ্মীর পুজা করবে ; এর ফলে তোমরা সুখী ও ঐশ্বর্যশালী হবে।' বেলগাছের তলা খুঁড়ে তারা যে ধনরত্ন পেল, তা দিয়ে তারা বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করল ও দাসদাসী পরিবৃত হয়ে ছেলেমেয়ে, জামাই ও পুত্রবধূ নিয়ে সুখে দিন কাটালো। এইভাবে ধরাধামে লক্ষ্মীপুজা প্রবর্তন হল।

॥ দুই ॥

এবার জয়মঙ্গল চণ্ডীর পুজা প্রবর্তনের কাহিনীটা বলি। কোন এক দেশে দুই বণিক ছিল। একজনের সাতটি মেয়ে ; আর অপর জনের সাতটি ছেলে। একবার মঙ্গলচণ্ডী ভিখারিণী ব্রাহ্মণীর বেশে প্রথম বণিকের বাড়ি ভিক্ষার জন্য আসেন। বণিকপত্নী ভিক্ষা দিতে এলে, মঙ্গলচণ্ডী বললেন—'মা, তুমি অপুত্রক, তোমার হাতে আমি ভিক্ষা নেব না। ভিখারিণী ভিক্ষা না নিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে বণিকপত্নী তার দুটো পা জড়িয়ে ধরে। মঙ্গলচণ্ডী তাকে একটা শুকনো ফুল দিয়ে বললেন, এই ফুল জলে গুলে প্রত্যহ তুমি খাবে, তা হলে তোমার ছেলে হবে এবং ছেলের নাম রাখবে জয়দেব। তারপর মঙ্গলচণ্ডী দ্বিতীয় বণিকের বাড়ি গেলেন এবং বণিকপত্নীর মেয়ে সন্তান নেই বলে তার হাত থেকে ভিক্ষা নিলেন না। বণিকপত্নী তাঁর পা জড়িয়ে ধরলে, তাকেও মঙ্গলচণ্ডী একটা শুকনো ফুল দিলেন এবং বললেন, 'মেয়ে হলে তার নাম রাখবে জয়াবতী।' এর ফলে দুই বণিকপত্নীরই যথাক্রমে ছেলে ও মেয়ে হল।

জয়দেব একটা পায়রা নিয়ে খেলা করত, আর জয়াবতী ফুল তুলে মঙ্গলচণ্ডীর পুজা করত। একদিন জয়দেবের পায়রাটা উড়ে গিয়ে জয়াবতীর কোলে বসল। জয়দেব পিছনে পিছনে এসে জয়াবতীর কাছ থেকে পায়রাটা ফেরত চাইল। জয়াবতী দিতে অস্বীকার করল। জয়দেব বলল, 'আমি তোমার পুজার সমস্ত সামগ্রী ভেঙে দেব।' জয়াবতী বলল, 'আজ আমি মঙ্গলচণ্ডীর পুজা করছি, আর তুমি আমার পুজার উপকরণ নষ্ট করতে চাও ?' জয়দেব জিজ্ঞাসা করল—'মঙ্গলচণ্ডীর পুজা করলে কি হয় ?' জয়াবতী বলল—

'মংগলচণ্ডীর ব্রত করলে আগ্নুনে কিছ্নু পোড়ে না, জলে কিছ্নু ডোবে না, নষ্ট জিনিস উদ্ধার হয়, কেউ তাকে তরোয়াল দিয়ে কাটতে পারে না, মরে গেলে, সে আবার জীবন ফিরে পায়।'

কিছ্নুকাল পরে স্বপ্নে মংগলচণ্ডীর আদেশে জয়দেবের সংগে জয়াবতীর বিয়ে হল। জয়দেব যখন জয়াবতীকে বিয়ে করে নৌকা করে ফিরছিল, জয়াবতীর হঠাৎ মনে পড়ল যে সেটা জয়মংগলবার। জয়াবতী তাড়াতাড়ি মংগলচণ্ডীর একটা শ্নুকনো ফ্নুল গিলে ফেলল এবং দেবীর কাছে প্রার্থনা করল তার ত্রুটি যেন তিনি মার্জনা করেন। জয়দেবের প্নুরানো দিনের কথা মনে পড়ল, মংগলচণ্ডীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে জয়াবতী তাকে যা বলেছিল। পরীক্ষা করবার জন্য জয়দেব জয়াবতীকে বলল, 'এখানে বড় দস্যুর ভয়, তুমি তোমার অলঙ্কারগ্নুলো খ্নুলে ফেলে, একটা পোঁটলা করে আমাকে দাও।' জয়াবতী এর্নুপ করলে, জয়দেব পোঁটলাটা জলে ফেলে দিল। সংগে সংগে একটা বোয়াল মাছ এসে সেটা গিলে ফেলল।

বরকনে বাড়ি এলে, অত বড় ধনীর মেয়েকে নিরাভরণা দেখে সকলেই নানারকম মন্তব্য করতে লাগল। জয়াবতী চ্নুপ করে রইল। বউভাতের দিন একটা বড় বোয়াল মাছ আনা হল। জেলে মাছটা কাটতে পারল না। পরীক্ষা করবার জন্য জয়দেব জয়াবতীকে মাছটা কাটতে বলল। জয়াবতী রাজী হল, তবে বলল যে, সে পরদার আড়ালে বসে মাছটা কাটবে। পরদার আড়ালে গিয়ে জয়াবতী মংগলচণ্ডীকে স্মরণ করল। মংগলচণ্ডী আবির্ভূতা হয়ে মাছটা কেটে ফেললেন, এবং মাছটার পেট থেকে তার অলঙ্কারের পোঁটলাটা বের করে তার হাতে দিলেন। জয়াবতী যখন অলঙ্কার পরে পরদার ভিতর থেকে বের্নুল, তখন সকলে তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারপর অত মাছ কেউ রাঁধতে পারল না। তাও জয়াবতী মংগলচণ্ডীর সাহায্যে রাঁধল।

তারপর জয়াবতীর এক সন্তান হল। জয়দেব আবার পরীক্ষা করবার জন্য ছেলেটাকে ক্নুমোরদের ভাটির মধ্যে রেখে এল। কিন্তু মংগলচণ্ডী এসে জয়াবতীর কোলে তার সন্তানকে দিয়ে গেলেন। তারপর একদিন জয়দেব ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে প্নুক্নুরে ডুবিয়ে দিল। আবার মংগলচণ্ডী ছেলেটাকে এনে জয়াবতীর কোলে দিয়ে গেলেন, এবং বললেন ভবিষ্যতে যেন সে ছেলের সম্বন্ধে সাবধান হয়। একদিন জয়দেব ছেলেটাকে কেটে ফেলতে যাচ্ছে, এমন সময় জয়াবতী দেখতে পেয়ে, জয়দেবকে বলল—'তুমি এখনও মংগলচণ্ডীর দয়ায় বিশ্বাস

করছ না?' জয়দেব বলল—'হাঁ, এখন আমি বিশ্বাস করি।' এইভাবে জয়মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর পূজার প্রবর্তন হল।

॥ তিন ॥

অরণ্যষষ্ঠীর পূজার প্রবর্তন সম্বন্ধে যে কাহিনীটা আছে, তা হচ্ছে—এক ব্রাহ্মণের তিন পুত্র ও তিন পুত্রবধূ ছিল। ছোট বৌটা খুব পেটুক ছিল, এবং খাদ্যসামগ্রী লুকিয়ে খেয়ে বিড়ালের নামে দোষ দিত। বিড়াল হচ্ছে মা ষষ্ঠীর বাহন। মিছামিছি তার নামে দোষ দেয় বলে সে মা ষষ্ঠীর কাছে গিয়ে ছোট বৌয়ের নামে নালিশ করল।

কালক্রমে ছোটবৌ অন্তঃসত্ত্বা হল, এবং যথা সময়ে এক পুত্রসন্তান প্রসব করল। কিন্তু সকাল বেলা কেউ আর ছেলেটাকে তার কাছে দেখতে পেল না। এইভাবে তার সাতটা সন্তান হল, কিন্তু রাত্রিকালে ছেলেটা অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কেউ আর ছেলের সন্ধান পায় না।

মনের দুঃখে ছোটবৌ বনে গিয়ে কাঁদতে লাগল। সেখানে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে ষষ্ঠীঠাকরুন আবির্ভূতা হয়ে ছোটবৌকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি বনে এসে কাঁদছ কেন, মা?' ছোটবৌ তাঁকে তার সব দুঃখের কথা বলল। তখন ষষ্ঠীঠাকরুন রোষকণ্ঠে তাকে বললেন—'তুই জানিস না, চুরি করে খাস্, আর ষষ্ঠীর বাহন বিড়ালের নামে দোষ দিস্?' তখন ছোটবৌ বুঝতে পারল ওই ব্রাহ্মণী কে, এবং তাঁর দুটো পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। ষষ্ঠী দেবীর দয়া হল। তিনি বললেন—'দ্যাখ্, ওখানে একটা মরা বিড়াল পড়ে আছে, এক ভাঁড় দই এনে ওর গায়ে ঢেলে দে, এবং চেটে তা ভাঁড়ে তোল।' ছোটবৌ ষষ্ঠীর আদেশ মত ওইরূপ করলে, ষষ্ঠীঠাকরুন তাকে তার সাত ছেলে ফিরিয়ে দিলেন ও তাদের কপালে দইয়ের ফোঁটা দিতে বললেন। তিনি আরও বললেন, 'কখনও চুরি করে কিছু খাস্ না। আর বিড়ালকে কখনও লাথি মারবি না, এবং বাঁ হাত দিয়ে কখনও ছেলেকেও মারবি না, বা 'মরে যা' বলে কখনও ছেলেকে গাল দিবি না।' অরণ্যষষ্ঠীর দিন কিভাবে ষষ্ঠীপূজা করতে হয়, সে সম্বন্ধেও তিনি উপদেশ দিলেন। আরও বললেন—'অরণ্যষষ্ঠীর দিন ফলার করবি, কখনও ভাত খাবি না। তারপর ষষ্ঠীদেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ছোটবৌ সাত ছেলে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল, এবং সব কথা নিজের জায়েদের বলল। সকলেই সেই থেকে অরণ্যষষ্ঠীর পূজা আরম্ভ করল।

॥ চার ॥

অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার মেয়েরা ইতুপূজো করে। ইতুপূজোর কথা তারা যা বলে তা হচ্ছে—কোন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের দুই মেয়ে ছিল নাম উমনো ও ঝুমনো। ব্রাহ্মণ একদিন ভিক্ষা করে কিছু চাল এনে ব্রাহ্মণীকে বললেন তাকে পিঠে তৈরি করে দিতে। এক-একটা পিঠে তৈরি হচ্ছে আর ব্রাহ্মণ দাওয়ায় বসে একগাছা দড়িতে একটা করে গেরো দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণকে যখন পিঠে দেওয়া হল, তখন তিনি দুখানা পিঠে কম দেখলেন। গৃহিণী বললেন, দুখানা পিঠে দুই মেয়েকে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে পরদিন মাসির বাড়ি নিয়ে যাবার ছল করে তাদের বনবাস দিয়ে এলেন। বনে ঘুরতে ঘুরতে তারা কতকগুলি মেয়েকে ইতুপূজো করতে দেখল। তাদের কাছ থেকে তারা জানল যে ইতুপূজো করলে বাপ-মায়ের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়। এই কথা শুনে তারা বাড়ি গিয়ে ইতুপূজো করতে লাগল। ব্রাহ্মণ তাদের দেখে প্রথমে খুব চটে গেল, কিন্তু যখন ইতুপূজোর মাহাত্ম্যের কথা শুনল, তখন কিছু নরম হল।

এর কিছুদিন পরে ওই দেশের রাজা মৃগয়ায় বেরিয়ে তৃষ্ণার্ত হয়ে তাদের বাড়ি এসে জল চাইল। উমনো ঝুমনো জল এনে দিল। তাদের দেখে রাজা ও মন্ত্রী তাদের বিয়ে করতে চাইলেন।

বিয়ের পর স্বামীগৃহে যাবার দিন উমনো ভাত-তরকারি খেল। সেদিন ইতুপূজো, সেজন্য ঝুমনো শুধু ইতুর প্রসাদ খেল। উমনো রাজপ্রাসাদে আসামাত্র নানারকম অঘটন ঘটতে লাগল। রাজা তাকে বোনের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ঝুমনো উমনোকে বলল—'বোন, তুই ইতুপূজোর দিন ভাত খেয়েছিলি, সেজন্য ইতুর কোপে পড়েছিস, তুই ইতুপূজো করে ইতুকে প্রসন্ন কর।' উমনো তাই করল। রাজার আবার সমৃদ্ধি ফিরে এল। রাজা উমনোকে নিয়ে গেলেন। উমনো রাজাকে সব কথা বলল। সেই থেকে ইতুপূজোর প্রচলন হল।

॥ পাঁচ ॥

একদিন পার্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কিসে সবচেয়ে বেশি তুষ্ট হও।' শিব বললেন, 'শিবরাত্রির দিন যদি কেউ উপবাস করে আমার মাথায় জল দেয়, তা হলে আমি খুব তুষ্ট হই।' তখন মহাদেব পার্বতীকে একটা

কাহিনী বললেন। বারাণসীতে এক ব্যাধ ছিল। একদিন সে অনেক পশু শিকার করে এবং তার ফিরতে রাত্রি হয়ে যায়। বাঘ ভাল্লুকের ভয়ে সে এক গাছের উপর আশ্রয় নেয়। ওই গাছের তলাতেই এক শিবলিঙ্গ ছিল। রাত্রিতে ব্যাধ যখন ঘুমোচ্ছিল, তখন তার এক ফোঁটা ঘাম মহাদেবের মাথায় পড়ে। সেদিন শিবরাত্রির দিন ছিল এবং ব্যাধও সারাদিন উপবাসী ছিল। মহাদেব তার ওই এক ফোঁটা ঘামেই তুষ্ট হন। যথাসময়ে যখন ব্যাধের মৃত্যু হয়, যমদূত এসে তাকে নরকে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু শিবদূত তাকে বাধা দিয়ে তাকে শিবলোকে নিয়ে গেল। এই ভাবে শিবরাত্রি ব্রতের প্রচলন হল।

॥ ছয় ॥

শীতলা পূজা প্রচলিত হয়েছিল এইভাবে: রাজা নহুষ একবার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত হয়ে শীতল হলে, তা থেকে এক পরমা সুন্দরী রমণী আবির্ভূতা হন। ব্রহ্মা তার নাম দেন শীতলা, এবং বলেন যে, 'তুমি পৃথিবীতে গিয়ে বসন্তের কলাই ছড়াও, এরূপ করলে লোকে তোমার পূজা করবে।' শীতলা বললেন, 'আমি একা পৃথিবীতে গেলে, লোকে আমার পূজা করবে না, আপনি আমার একজন সঙ্গী দিন।' ব্রহ্মা তাঁকে কৈলাসে শিবের কাছে যেতে বললেন। শীতলা কৈলাসে গিয়ে শিবের কাছে তাঁর প্রয়োজনের কথা বললেন। মহাদেব চিন্তিত হয়ে ঘামতে লাগলেন। তাঁর ঘাম থেকে জ্বরাসুর নামে এক ভীষণকায় অসুর সৃষ্টি হল। জ্বরাসুর শীতলার সঙ্গী হলেন। শীতলা বললেন, 'দেবতারা যদি আমার পূজা না করেন, তা হলে পৃথিবীর লোক করবে কেন?' তখন শিব তাঁকে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে ইন্দ্রপুরীতে যেতে বললেন। ইন্দ্রপুরীর রাস্তা দিয়ে যাবার সময় জ্বরাসুরের মাথা থেকে বসন্তের কলাইয়ের ধামাটা রাস্তায় পড়ে গেল। সে-সময় ইন্দ্রের ছেলে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। শীতলা তাকে ধামাটা জ্বরাসুরের মাথায় তুলে দিতে বললেন। ইন্দ্রের ছেলে এটা তার পক্ষে মর্যাদাহানিকর মনে করে, ব্রাহ্মণীকে ঠেলে ফেলে দিল। শীতলার আদেশে জ্বরাসুর ইন্দ্রের ছেলেকে আক্রমণ করল। এর ফলে ইন্দ্রের ছেলে বসন্তরোগে আক্রান্ত হল। তারপর শীতলা দেবসভায় গিয়ে ইন্দ্রকে আশীর্বাদ করেন। ইন্দ্র তো চটে লাল। ভাবলেন, সমস্ত জগতের লোক তাঁকে পূজা করে, আর এ কোথাকার এক বুড়ী

এসে তাঁকে আশীর্বাদ করছে। এর আস্পর্ধা তো কম নয়! ইন্দ্র তাকে মেরে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর ইন্দ্র নিজেও বসন্তরোগে আক্রান্ত হলেন। অন্যান্য দেবতারাও হলেন। মহামায়ার দয়া হল। তিনি গিয়ে শিবের শরণাপন্ন হলেন। শিব বললেন, 'দেবতারা সকলে শীতলার পূজা করুক, তা হলে রোগমুক্ত হবে।' তখন দেবতারা ঘটা করে শীতলার পূজা করলেন। এইভাবে শীতলা দেবলোকে স্বীকৃতি পেলেন।

তারপর শীতলা জ্বরাসুরকে নিয়ে পৃথিবীতে এলেন। প্রথমে তিনি বিরাটরাজার রাজ্যে এলেন। স্বপ্নে তিনি বিরাটকে শীতলার পূজা করতে বললেন। বিরাট বলল, 'আমার বংশে কেউ কখনও নারীদেবতার পূজা করে নি, আমি নারীদেবতার পূজা করব না।' বিরাটরাজ্যে মহামারী রূপে বসন্ত দেখা দিল। প্রজারা সব মরতে লাগল। বিরাটের তিন ছেলেও মারা গেল। তবুও বিরাট অচল, অটল। নারীদেবতার সে পূজা করবে না। বিরাটের এক পুত্রবধূ তখন পিত্রালয়ে ছিল। শীতলা সেখানে গিয়ে তাকে বললেন, 'তুমি যদি শীতলার পূজা কর, তা হলে তোমার স্বামী ও তার ভাইয়েরা বেঁচে উঠবে।' পুত্রবধূ দ্রুত বিরাটরাজ্যে ফিরে এসে শীতলার পূজা করলেন। তার স্বামী ও তার ভাইয়েরা সব বেঁচে উঠল। শীতলা যে বসন্তের দেবতা, তা বিরাটরাজার প্রত্যয় হল। সেই থেকে পৃথিবীতে শীতলা পূজার প্রচলন হল।

॥ সাত ॥

অঞ্চলভেদে এসব কাহিনীর পার্থক্য আছে। তা ছাড়া, পরবর্তীকালে রচিত নূতন কাহিনী আদিম কাহিনীকে চাপা দিয়েছে। যেমন, ওপরে লক্ষ্মীর যে কাহিনী দেওয়া হয়েছে, সেটাই হচ্ছে আদি কাহিনী। এখন প্রতি বৃহস্পতিবার মেয়েরা লক্ষ্মীর পূজা করে, ছাপা বই দেখে যে পাঁচালী পাঠ করে, তার কাহিনী অন্যরূপ। আবার অরণ্যষষ্ঠীর যে কাহিনী দেওয়া হয়েছে, তাছাড়া আর একটা কাহিনী আছে। সে কাহিনীতে ছোট বউয়ের কথা নেই। তার পরিবর্তে আছে অভিশপ্ত এক বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীদের কাহিনী। এ সকল অলিখিত সাহিত্যের উপাখ্যানসমূহের রূপভেদ বিশেষভাবে লক্ষ্য করি গন্ধেশ্বরী পূজার কাহিনীসমূহে। গন্ধেশ্বরী হচ্ছে গন্ধবণিক জাতির দেবতা। গন্ধেশ্বরী তাদের শত্রু গন্ধাসুরকে বধ করেছিল বলেই গন্ধবণিক

সমাজ তার পূজা করে। কিন্তু গন্ধেশ্বরী পূজার উদ্ভব সম্বন্ধে অন্য বহু কাহিনী প্রচলিত আছে।

অলিখিত এই সব উপাখ্যানের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, উপাখ্যানের মধ্যে অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ। হিন্দু এ-সব কাহিনীর অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করত। সেই কারণেই হিন্দুর নৈতিক মান খুব উচ্চস্তরে ছিল। আজ হিন্দু সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মন থেকে পাপপুণ্যের বিশ্বাসও লোপ পেয়েছে। সেজন্যই হিন্দুর নৈতিক মান আজ নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।

তিন বিদুষী বাঙালী

বাঙালী মেয়েরা লেখাপড়ায় আজকাল অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই তারা আজ আর পুরুষদের পিছনে পড়ে নেই। অনেকেই অধ্যাপিকা হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। অনেকে আবার ডবল ডক্টরেট হয়েছেন। বিদেশে গিয়েও তাঁরা গবেষণা চালিয়ে স্বীকৃতি পেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কোষগ্রন্থ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'। এর জন্য আছেন তাদের এক অনন্য-সাধারণ গবেষকমণ্ডলী। অনেকেই হয়তো জানেন না যে, এই সম্পাদকীয় গবেষক-মণ্ডলীর ভূগোল-শাখার প্রধান হচ্ছেন একজন বাঙালী মেয়ে, নাম সুজাতা ব্যানার্জি।

মেয়েদের মধ্যে রীতিমত লেখাপড়ার সূচনা হয় ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে বেথুন স্কুল স্থাপনের পর থেকে। মাত্র ৯৭ বছর আগে এই স্কুলেরই কলেজ বিভাগ থেকে প্রথম দুজন বাঙালী মেয়ে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু বি. এ. পাশ করেন। তাঁরাই হচ্ছেন আমাদের দেশের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট।

॥ দুই ॥

কিন্তু এ-কথা ভাবলে ভুল হবে যে, তার আগে আমাদের দেশের মেয়েরা সব গণ্ডমূর্খ ছিল। তা নয়। অনেকেই বিদ্বদ্‌সমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন কোটালিপাড়া নিবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ সার্বভৌমের স্ত্রী বৈজয়ন্তী দেবী। সুন্দরী ছিলেন না এবং বংশগৌরবে শ্বশুরকুল অপেক্ষা হীন ছিলেন বলে বহুদিন শ্বশুরালয়ে যেতে পারেন নি। তারপর তাঁর সংস্কৃত শ্লোকে রচিত পত্রে কবিত্ব শক্তির পরিচয় পেয়ে স্বামী তাঁকে গ্রহণ করেন। এই বিদুষী নারী কাব্য, সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে সুপণ্ডিত ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে (১৭৫২-১৭৭২ খ্রী.) প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামগতি সেনের মেয়ে আনন্দময়ী। নয় বছর বয়সে পয়গ্রাম নিবাসী অযোধ্যারামের সংগে তাঁর বিবাহ হয়। সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রসমূহে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। পিতার অনুপস্থিতিতে মহারাজা রাজবল্লভ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও প্রতিকৃতি নিজ হাতে

তৈরি করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। খুল্লতাত জয়নারায়ণকে 'হরিলীলা' কাব্য রচনায় সাহায্য করেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মাত্র বিশ বছর বয়সে অনুমৃতা হয়েছিলেন।

রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' (১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে রচিত) নামক আত্মজীবনী থেকে আমরা জানতে পারি যে, এদেশের মেয়েদের মধ্যে অনেকেই ছেলেদের সংগে পাঠশালায় লেখাপড়া শিখত। তবে সে-যুগে মেয়েদের আট-দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যেত বলে, পরে আর তারা বিদ্যাভ্যাসের সুযোগ ও সুবিধা পেত না। মাত্র সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদেরই সে সুযোগ ছিল। এক শ্রেণীর বৈষ্ণবী ছিল যারা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের মেয়েরা এই রকম বৈষ্ণবীর কাছেই লেখাপড়া শিখতেন। আবার অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য পণ্ডিতও নিযুক্ত করা হত। বস্তুত সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের মধ্যে যে বিদ্যাভ্যাস ছিল তা আমরা বর্ধমানের মহারানী কৃষ্ণকুমারী, নাটোরের রানী ভবানী প্রভৃতির জীবনী থেকে জানতে পারি। বর্ধমান রাজবাড়ির আর যাঁরা লেখাপড়া শিখেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের পট্টমহিষী মহারানী কমলকুমারী ও মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুরের দুই রানী এঁরা সকলেই সুশিক্ষিতা ছিলেন। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের পরিবারের মেয়েরাও বিদ্যাভ্যাস করতেন। রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের পুত্র শিবচন্দ্র রায়ের মেয়ে হরসুন্দরীও সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দী এই তিন ভাষায় এমন সুশিক্ষিতা হয়েছিলেন যে পণ্ডিতেরাও তাঁকে ভয় করতেন। তিনি সেকালের একজন নামজাদা পণ্ডিত কুমারহট্টনিবাসী রূপচাঁদ ন্যায়ালঙ্কারের কাছ থেকে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি তাবৎগ্রন্থ পাঠ করে সেকালের একজন সুশিক্ষিতা মহিলা হয়েছিলেন। স্বামী লোকনাথ মল্লিক লেখাপড়া জানতেন না বলে লজ্জিত হয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে পালিয়ে যেতেন। একবার ওঁদের বাড়িতে কোন এক বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠানে স্বজাতীয় সুবর্ণবণিক মেয়েরা সেজেগুজে নেমন্তন্ন খেতে এসে দেখেন যে হরসুন্দরী সামান্য একখানা শাড়ি পরে আছেন। তাঁরা হরসুন্দরীকে বলেন—আজও কি তোমায় গহনা-অলঙ্কার ও ভাল কাপড় পরতে নেই? হরসুন্দরী তাঁদের উত্তর দেন—'নক্ষত্র ভুষণং চন্দ্রো নারীনাং ভুষণং পতিঃ। পৃথিবী ভুষণং রাজা, বিদ্যা সর্বত্র ভুষণং।' হরসুন্দরী হবিষ্যাশিনী ছিলেন এবং সন্ধ্যার পর ডাইনে বাঁয়ে দুদিকে বাতির আলো জেবলে গভীর রাত্তির পর্যন্ত মহাভারত, পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি পাঠ করতেন।

॥ তিন ॥

এবার সেকালের সাধারণ ঘরের তিন বিদুষী বাঙালী মেয়ের কথা বলব, যাঁরা নিজেরা চতুষ্পাঠী স্থাপন করেছিলেন অধ্যাপনার জন্য এবং যাঁদের সংগে পুরুষ পণ্ডিতেরাও বিচার-যুদ্ধে পেরে উঠতেন না। এঁরা হচ্ছেন—হটী বিদ্যালঙ্কার, রূপমঞ্জরী ও দ্রবময়ী। হটী ছিলেন সে-যুগের অদ্বিতীয় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সমসাময়িক। তিনি ছিলেন বর্ধমান জেলার সোঞাই গ্রামের এক কুলীন বামুনের মেয়ে। পিতা এক কুলীন পাত্রের সংগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেকালের অন্যান্য কুলীনকন্যাদের মত হটীকে বিয়ের পর বাপের বাড়িতেই থাকতে হয়েছিল। বাবা ছিলেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি মেয়েকে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যাদি শাস্ত্রে সুশিক্ষিত করেন। সে-যুগের লোকেদের মনে এই কুসংস্কার ছিল যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়। অবশ্য বিধিবৈগুণ্যে হটীকেও বিয়ের অনতিকাল পরেই বিধবা হতে হয়েছিল। এরপর তাঁর বাবাও মারা যান। তখন হটী বারাণসীতে গিয়ে স্মৃতি-ব্যাকরণ ছাড়া নব্যন্যায়েও পারংগম হয়ে ওঠেন। কাশীতেই তিনি একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। দেশ-বিদেশের ছাত্ররা তাঁর কাছে নব্যন্যায় পড়তে আসত। কাশীর পণ্ডিতসমাজ তাঁকে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধিতে ভূষিত করেন। হটী বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ও পুরুষ পণ্ডিতদের সংগে অসাধারণ পারদর্শিতার সংগে ন্যায়শাস্ত্রের বিচার করতেন। পুরুষ ভট্টাচাজ্জিদের মত তিনি বিদায়-ও নিতেন। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামপুরের পাদরী উইলিয়াম ওয়ার্ড তাঁর 'রিলিজন অ্যান্ড ম্যানারস অভ্ দি হিন্দুস' বইয়ে লিখে গেছেন :

"I am informed that there is a female philosopher at Benares, whose name is Huttee Vidyalankar."

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন : 'একজন সহায়সম্বলহীনা বাংগালী বিধবা বারাণসীর মত বিদ্যাকেন্দ্রে গিয়ে অধ্যাপনা দ্বারা বিপুল যশের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, এ কথা ভাবিয়া বাংগালী মাত্রই গৌরববোধ করিবেন।'

॥ চার ॥

হটী তো বামুনের মেয়ে ছিলেন। কিন্তু সেকালে ব্রাহ্মণেতর সমাজের মেয়েরাও যে বিদুষী হতেন ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্তা থাকতেন

তার প্রমাণ রূপমঞ্জরী ওরফে হটু বিদ্যালঙ্কার। এঁরও বাড়ি বর্ধমান জেলায় কলাইঝুটি নামক গ্রামে। পিতা নারায়ণ দাস ছিলেন পরম বৈষ্ণব। ছেলেবেলাতেই হটুর মা মারা যান। তার ফলে, বাবা পিতা-মাতা দুয়েরই স্থলাভিষিক্ত হন। রূপমঞ্জরীর অদ্ভুত মেধাশক্তি দেখে নারায়ণ দাস মেয়েকে গ্রামের এক বৈয়াকরণিকের কাছে রেখে আসেন। গুরুগৃহ থেকে তিনি ষোল বছর বয়সেই ব্যাকরণশাস্ত্র আয়ত্ত করে ফেলেন। ব্যাকরণ পড়া শেষ হলে সরগ্রাম নিবাসী গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কার নামক অধ্যাপকের কাছে সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। পরে কাশীধামে গিয়ে নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অধ্যাপকরা তাঁর অসাধারণ প্রতিভা দেখে বিস্মিত হয়ে যান। জনসেবা প্রবৃত্তির বশীভুত হয়ে রূপমঞ্জরী চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্য সরগ্রামে আবার ফিরে আসেন গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের কাছে। চরক, সুশ্রুত ইত্যাদি জটিল চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তারপর রূপমঞ্জরী চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। ব্যাকরণ, চরক, নিদান প্রভৃতি অধ্যয়ন করবার জন্য তাঁর কাছে দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্ররা আসত। অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসকও তাঁর কাছ থেকে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি পুরুষের মত মাথামুণ্ডন করে পণ্ডিতদের মত শিখা রাখতেন। আজীবন কুমারী থেকে ও নির্মল নিষ্কলঙ্ক জীবন অতিবাহিত করে একশ বছর বয়সে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি মারা যান।

॥ পাঁচ ॥

হটী বিদ্যালঙ্কার ও রূপমঞ্জরী দুজনেরই জন্ম হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। হটী বিদ্যালঙ্কার মারা যান আনুমানিক ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে, আর রূপমঞ্জরী মারা যান ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে। এর মধ্যবর্তীকালে আবির্ভূতা হয়েছিলেন আর এক বিদুষী বাঙালী মেয়ে, নাম দ্রবময়ী। পিতা ছিলেন বেড়াবাড়ি গ্রাম নিবাসী ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার। বাল্যে বিধবা মেয়ে দ্রবময়ী পিতার টোলে পড়তে লাগলেন ব্যাকরণ ও অভিধান। অল্পদিনের মধ্যেই শেষ করে ফেললেন সাতখানা মূল ব্যাকরণ ও তার টীকা। কন্যার অদ্ভুত প্রতিভা দেখে পিতা পড়ালেন কাব্য, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র। পরে দ্রবময়ী আয়ত্ত করে ফেললেন পুরাণ, মহাভারত ও হিন্দুদের অন্যান্য সব শাস্ত্র। কিন্তু বয়স তাঁর তখন মাত্র চোদ্দ বছর। বৃদ্ধ পিতার শ্রম লাঘব করবার জন্য নিজেই পিতার

টোলে পড়াতে লাগলেন পিতার ছাত্রদের। তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের 'সম্বাদ ভাস্কর'-এ তিনি এক প্রতিবেদনে লেখেন, 'তাঁহার (দ্রবময়ীর) বিদ্যার বিবরণ শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ অধ্যাপকরা অনেকে বিচার করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই পরাজয় মানিয়া গিয়াছেন। দ্রবময়ী কর্ণাট রাজার মহিষীর ন্যায় যবনিকান্তরিতা হইয়া বিচার করেন না। আপন আসনে বসেন। সম্মুখে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বসিতে আসন দেন। তাঁহার মস্তক এবং মুখ নিরাবরণ থাকে। তিনি চাবর্ঙ্গী যুবতী, ইহাতেও পুরুষদিগের সাক্ষাতে বসিয়া বিচার করিতে শংকা করেন না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত বিচারকালীন অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথা কহেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার তুল্য সংস্কৃত ভাষা বলিতে পারেন না, বিচারেতেও পরাস্ত হয়েন।'

যাঁরা ভাবেন যে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে এদেশের মেয়েরা সব গণ্ডমূর্খ ছিল, তাঁদের এই কয় প্রতিভাশালিনী বাঙ্গালী বিদূষী মেয়ের কথা স্মরণ করা উচিত। হয়তো এ রকম বিদূষী মেয়ে আরও অনেক ছিলেন, যাঁদের কথা আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়নি।

ছাপাখানা ও সামাজিক বিস্ফোরণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে এদেশে ছাপাখানার প্রবর্তন সমাজের ওপর এক গভীর প্রতিঘাত হেনেছিল। যদিও ছাপাখানা শিক্ষার বিস্তারে সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তথাপি একথা বললে ভুল হবে যে, ছাপাখানা প্রবর্তনের পূর্বে এদেশের লোক অশিক্ষিত ছিল। সমাজের অনেকেই পাঠশালার মারফত সাক্ষরতা অর্জন করত। এটা যে উচ্চকোটির লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। নিম্নকোটির লোকেরাও সাক্ষরতা অর্জন করত। সামান্য মুদির দোকানে সুর করে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়া হত। বিদ্যার দৌড়ে অনেক মুদি আবার তার চেয়েও বেশি এগিয়ে যেত। দৃষ্টান্তস্বরূপ কান্ত মুদির উল্লেখ করা যেতে পারে—যিনি বাংলা, ফারসী ও যৎসামান্য ইংরেজী জানতেন এবং হিসাবপত্রে পারদর্শী ছিলেন।

মুদির দোকানে রামায়ণ পড়াই বলুন, আর চতুষ্পাঠীসমূহে সংস্কৃত ব্যাকরণ-কাব্য-সাহিত্য-দর্শন অধ্যয়নই বলুন, সবই হাতে লেখা পুথির সাহায্যে করা হত। এর জন্য সমাজে এক শ্রেণীর লোক পুথিলেখকের কাজ করত। যখন ছাপাখানা আবির্ভূত হল, এবং মুদ্রিত বই বেরুতে লাগল, তখন তার প্রথম প্রতিঘাত গিয়ে পড়ল এইসব পুথিলেখকদের ওপর। অবশ্য তারা রাতারাতি সব বেকার হয়ে পড়েনি। কেননা, প্রথম প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের প্রতি নিষ্ঠাবান সমাজের একটা প্রচণ্ড বিদ্বেষ ছিল। এ বিদ্বেষের কারণ ছিল, ছাপাখানা বিলাতী যন্ত্র বলে। তখন এদেশে যা কিছু বিলাতী জিনিসের সংস্পর্শে আসত, তা নিষ্ঠাবান সমাজের বিচারে ছিল হিন্দুর ধর্মনাশ করবার একটা কৌশল মাত্র। কিন্তু নিষ্ঠাবান সমাজের এ বিদ্বেষ খুব বেশি দিন টেকে নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নের পূর্বেই ছাপা বইয়ের প্লাবন এনে দিয়েছিল শিক্ষাজগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তখন থেকেই উপজীবিকার উপায় হিসাবে পুথিলেখা তার সূত্র হারিয়ে ফেলে।

॥ দুই ॥

ছাপাখানার প্রবর্তনের ফলে, এক শ্রেণীর লোক যেমন তাদের কর্মসংস্থানের সূত্র হারিয়ে ফেলে, অপর দিকে ছাপাখানা নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

ছাপাখানার বহুমুখী কাজে সমাজের বহুলোক নিযুক্ত হয়ে পড়ে। কেউ বা অক্ষর-ক্ষোদন ও অক্ষর-ঢালাইয়ের কাজে নিযুক্ত হয়, আবার কেউ বা অক্ষর-সংযোজন (composing) ও মুদ্রাযন্ত্র চালানোর কাজে ব্যাপৃত হয়। তারপর ছাপাখানার সঙ্গে সঙ্গে আসে ছবি ছাপবার জন্য নানা রকমের কাজ। ছবি ছাপবার জন্য আবির্ভূত হয় শিল্পী ও শিল্পীর সঙ্গে আবির্ভূত হয় ব্লক-মিস্ত্রি, যারা কাঠে বা ধাতুর পাতে ক্ষোদন করে ব্লক তৈরি করত ছাপবার জন্য। তারপর লিথোগ্রাফি প্রক্রিয়াতেও ছবি ছাপা শুরু হল। (১৮২২ খ্রীস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখের 'ক্যালকাটা জর্নাল' অনুযায়ী দুজন ফরাসী শিল্পী, নাম বেলনস ও সাভিনাক কর্তৃক এই প্রথা কলকাতায় প্রবর্তিত হয়েছিল) এ সব কাজের জন্য সমাজের মধ্যে বিশিষ্ট বৃত্তিধারী নানাশ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হল। পুথিলেখকরা তাদের কর্ম হারাল বটে, কিন্তু তাদের তুলনায় সমাজের এক গরিষ্ঠ জনসংখ্যা নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ পেল।

এদিকে ছাপাখানার সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। ছাপাখানার সংখ্যা যত বাড়ল সমাজের বেশিসংখ্যক লোক তত ছাপাখানার কাজে নিযুক্ত হল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে (১৮৮৫-৮৬ খ্রীস্টাব্দে) এদেশে ১,০৯৪টি ছাপাখানা ছিল। গড়ে যদি প্রতি ছাপাখানায় পাঁচজন লোক নিযুক্ত থেকে থাকে, তা হলে বলতে হবে যে মালিক সমেত ৬,৫৬৪ সংখ্যক লোক ছাপাখানা থেকে তাদের ভাতরুটির সংস্থান করত। আর প্রত্যেক লোকের পরিবারে যদি পাঁচজন করে লোক থাকে, তা হলে ছাপাখানা থেকে প্রায় ৩২,৮২০ লোকের ভরণ-পোষণ চলত। মাত্র কর্মসংস্থান ও ভরণ-পোষণ নয়, সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে সবচেয়ে যে বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটল, সেটা হচ্ছে সমাজের বহুজন এক নতুন টেকনোলজিতে দক্ষ হয়ে দাঁড়াল।

তারপর নতুন নতুন দিকে ছাপাখানার বিকাশ ঘটল। লাইনোটাইপ, মনোটাইপ প্রভৃতি যন্ত্রের আবিষ্কার হল। মুদ্রণযন্ত্রও প্ল্যাটেন প্রেস থেকে রোটারী প্রেসে পরিণত হল। সচিত্র বই ছাপবার জন্য হাফটোন ব্লক তৈরি হতে লাগল। অফসেট প্রিন্টিং-এরও প্রবর্তন হল। এসব কাজ সমাধার জন্য দক্ষতাপূর্ণ নানা বৃত্তিধারী মানুষের আবির্ভাব ঘটল। ফলে, অন্যান্য শিল্পের ন্যায়, ছাপাখানাও এক বিরাট শিল্পে পরিণত হল। সমাজের লোকেরা নতুন নতুন টেকনোলজি শিখল এবং এর দ্বারা সমাজের বহুলোক উপকৃত হল।

সম্প্রতি ছাপাখানার ধর্মঘটের সময় প্রকাশ পেয়েছিল যে, মাত্র কলকাতার ৬,০০০ ছাপাখানায় প্রায় এক লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। এছাড়া, কাগজ ও ছাপার কালি শিল্পেও বহু লোক নিযুক্ত আছে। কর্মনিযুক্তি বর্তমান সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এবং সেদিক দিয়ে বিচার করলে মুদ্রাযন্ত্র এদেশের সমাজের ওপর এক অতি দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। কেননা, ছাপাখানার ফসল হচ্ছে বই ও সংবাদপত্র। বই ও সংবাদপত্র বিক্রির কাজে বহু লোক নিযুক্ত আছে। বস্তুত ছাপাখানার কর্মযজ্ঞ ভারতের কর্মনিযুক্তির ক্ষেত্রে যে এক প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

॥ তিন ॥

এবার অন্যদিক দিয়ে সমাজের ওপর ছাপাখানার প্রভাব সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। ছাপাখানার সাহায্যেই সামাজিক অপপ্রথাসমূহ ও নিপীড়ন বন্ধ হয়েছিল। মুদ্রিত পুস্তকই এদেশে সমাজ-সংস্কারের প্রধান হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুত ছাপাখানাই এদেশে 'আন্দোলন'-এর যুগ আনে। 'আন্দোলন' চালাবার জন্য হাতে-লেখা মাধ্যমের একটা সীমা আছে—সংখ্যা এবং ব্যয়, এই উভয় দিক থেকেই। অপর পক্ষে মুদ্রিত মাধ্যম মারফত প্রয়োজনীয় সংখ্যা ছাপানো যায়, এবং তার ব্যয়ও অল্প।

মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যে সামাজিক অপপ্রথার বিরুদ্ধে অভিযান প্রথম চালান রাজা রামমোহন রায়। সতীদাহ প্রথার বিলোপসাধনের জন্য তিনি কয়েকখানি পুস্তিকা রচনা করে তাঁর সপক্ষে দেশের জনমত গঠনের ও সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। তাঁর সে আন্দোলন যে সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছিল, তা আজ সকলেরই জানা আছে। মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যে অনুরূপ আন্দোলন চালিয়েছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য। তাঁর সে চেষ্টাও সার্থক হয়েছিল। রাজা রামমোহনের সমসাময়িক কালে (১৮২২ খ্রীস্টাব্দে) স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক এক পুস্তিকা প্রচার করে, এদেশের মেয়েরা যাতে বিদ্যাভ্যাস করে, তার জন্য আন্দোলন করা হয়। এর ফলে এদেশে মেয়েদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যাভ্যাসের সূচনা হয়। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে নাটকে রামনারায়ণ কুলীনপ্রথা সম্পর্কে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক রচনা করেন। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র 'কস্যচিৎ পথিকস্য' ছদ্মনামে তৎকালীন নীলকরদের বীভৎস অত্যাচার ও চাষীদের লাঞ্ছনা ও দুরবস্থা অবলম্বনে

তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন। এই নাটকের ফলেই জাতীয় চেতনা জেগে ওঠে ও নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায়। তখন আন্দোলনমূলক রচনা সাহিত্যের রূপ ধারণ করেছে। জাতীয় অপপ্রথা, কুসংস্কার ও কু-অভ্যাস সমূহ দূরীকরণের জন্য সে-যুগে আরও যেসব সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিল ম্যালেনস্ রচিত "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ", প্যারীচাঁদ মিত্র কর্তৃক রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক রচিত 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'। কিছু পরেই বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় চেতনা জাগরণের জন্য লেখেন তাঁর সীতারাম, চন্দ্রশেখর ও আনন্দমঠ। আনন্দমঠ-এর 'বন্দেমাতরম্' গানই পরবর্তীকালের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। বিংশ শতাব্দীতেও শরৎচন্দ্র তাঁর পল্লীসমাজ, চরিত্রহীন, বামুনের মেয়ে, পথের দাবী প্রভৃতি উপন্যাস লিখে সামাজিক অত্যাচার দূরীকরণ, স্ত্রীজাতির মর্যাদা স্থাপন ও জাতীয় চেতনা জাগরণের চেষ্টা করেন। মাত্র পুস্তক রচনা দ্বারাই এ-সব আন্দোলন সার্থকতা লাভ করে নি। সংবাদপত্রও এর সহায়ক ছিল। বলা বাহুল্য, সংবাদপত্র ছাপাখানারই আর এক ফসল। সংবাদপত্র মারফৎ এসব আন্দোলনের খবর ও ওই সম্বন্ধীয় সম্পাদকীয় মন্তব্য জনসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল ; এবং তাতে সমাজের মধ্যে একটা জনমত গঠিত হচ্ছিল। বিশেষ করে জাতীয় চেতনা জাগবার পর, সংবাদপত্রই জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বস্তুত দেশের মধ্যে জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সংবাদপত্রকে রাষ্ট্রের চতুর্থ অঙ্গ বলা হয়। এ ছাড়া, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনসমূহ আজ সমাজকে সাহায্য করছে শিল্পসমূহের মাল বিক্রি করা থেকে আরম্ভ করে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত।

॥ চার ॥

সমাজতত্ত্বের দিক দিয়ে ছাপাখানার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করা। এর ফলে দেশের জনসমাজের সামনে জ্ঞানরাজ্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ দেশের লোক আজ দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ছাপাখানা যে এদেশে এক প্রচণ্ড সামাজিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর-এর 'আলালের ঘরের দুলাল'কে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাস বলা হয়। এটা কিন্তু ঠিক নয়। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাস হচ্ছে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'। 'আলালের ঘরের দুলাল' রচিত হয়েছিল ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে, আর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে। সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলাল' অপেক্ষা 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' ছয় বছরের বেশি পুরানো। বইখানি সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হয়েছিল, এবং সেখানাকে অবলম্বন করে সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেও অনূদিত হয়। এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে সমসাময়িককালে বইখানা খুব জনপ্রিয় ছিল ও সমস্ত ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে বাঙালী পাঠক ফুলমণি ও করুণাকে ভুলে গিয়েছিল। ফুলমণি ও করণার অজ্ঞাতবাসের অনেক কারণ ছিল। ফুলমণি ও করুণাকে তাদের অজ্ঞাতবাসের আস্তানা থেকে আমাদের সামনে প্রথম হাজির করেন, বিশ বছর আগে জাতীয় গ্রন্থাগারের তৎকালীন গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখানাকে আপতিকভাবে আবিষ্কার করে। কি করে তিনি বইখানাকে তার অজ্ঞাতবাস থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তার ইতিহাস আমি তাঁর ভাষাতেই বলছি—"একটি বিশেষ কাজে পুরনো বাঙলা বইগুলি উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম। হঠাৎ একটি বই দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এটি আমার হিসাবের মধ্যে ছিল না; কেমন করে কাছে এসে পড়ল। নামপত্র খুলে দেখলাম বইটি ১৮৫২ সালে ছাপা। লেখকের নাম কোথাও নেই। একশ বছর পূর্বের বইয়ের তুলনায় বইটি বেশ মোটা, তিনশ পৃষ্ঠার উপরে। পাতা জীর্ণ হয়েছে, কিন্তু বেশ বড় বড় অক্ষরে সুন্দর পরিচ্ছন্ন ছাপা। বইটির নাম 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'।"

বইটি পড়েই চিত্তরঞ্জনবাবু জানতে পারলেন যে, বইখানা কোন মহিলার লেখা। তিনি কে? লঙ সাহেবের ও মারডক সাহেবের ক্যাটালগ থেকে তিনি জানতে পারলেন যে লেখিকা একজন বিদেশিনী মহিলা, নাম হানা ক্যাথারিন ম্যালেনস্। এক সুবিস্তৃত ভূমিকা, টীকা প্রভৃতি সমেত চিত্তরঞ্জন-

বাবু বইখানার এক পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ বের করেন ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে।

যদিও বইখানি বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস, তা হলেও এই পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ বাঙালী পাঠককে যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, তা নয়। বিশ বছর পরে ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে আমি আমার 'বাংলা মুদ্রণের দুশ বছর' বইতে বইখানির প্রতি বাঙালী পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। পরে ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' যখন বাংলা মুদ্রণের দুশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক বইমেলার আয়োজন করে, তখন সেই সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' যে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে, তার জন্য লিখিত এক বিশেষ প্রবন্ধে বইখানির প্রতি আমি পুনরায় বাঙালী পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমার সে চেষ্টা সার্থক হয়। তার ফলে, বইখানির প্রথম সংস্করণের সমুদয় কপি বইমেলায় বিক্রি হয়ে যায়। বইখানির আবার পুনর্মুদ্রণের চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু বর্তমানে মুদ্রণক্ষেত্রে যে উৎকট পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাতে বইখানি কবে পুনরায় প্রকাশিত হবে, তা বলা কঠিন। যাঁদের বইখানি পাবার সুযোগ ও সুবিধা হয়নি, তাঁদের জন্যই এই প্রবন্ধটি লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

॥ দুই

চিত্তরঞ্জনবাবুর ভাষায় 'কাহিনীর মৌলিকতায়, ভাষার প্রাঞ্জলতায় এবং চরিত্র-চিত্রণের কুশলতায় ইংরেজ মহিলা বিরচিত এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।' লেখিকার বাংলা ভাষার ওপর দখল দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। এদেশে জন্মেছিলেন এবং বাঙালী সমাজের পরিবেশের মধ্যে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছিল বলেই, তিনি বাংলা ভাষার ওপর এই আশ্চর্য রকম দখলের অধিকারিণী হয়েছিলেন। তিনি বাড়িতেই লেখাপড়া শিখেছিলেন, এবং বাড়ির বাঙালী চাকরের কাছ থেকে চলতি বাংলা শেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। বাংলা তিনি অনর্গল বলতে পারতেন, এবং অনেক বাংলা বইও পড়েছিলেন।

ম্যালেন্সের পিতা ছিলেন লন্ডন মিশনারী সোসাইটির সহিত সংশ্লিষ্ট মিশনারী। মিশনারীরা যখন ভবানীপুরে বাঙালী মেয়েদের জন্য একটা স্কুল স্থাপন করেন, তখন তাঁরা হানাকে বাংলা ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। হানার তখন মাত্র বারো বছর বয়স। পনের বছর বয়সে হানা পিতামাতার সঙ্গে ইংলন্ডে যান, এবং সেখানে এক ভদ্রমহিলার তত্ত্বাবধানে আঠারো মাস শিক্ষালাভ

করেন। তারপর কলকাতায় ফিরে আসবার পর, উনিশ বছর বয়সে মিশন স্কুল সমূহের পরিদর্শক মিঃ জে. ম্যালেন্সের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' লেখেন। মিশন স্কুলে শিক্ষকতা করতে করতেই ৩৫ বছর বয়সে অন্ত্রের এক ধমনী ছিঁড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

॥ তিন ॥

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে রচিত। খ্রীস্টান মিশনারীদের পক্ষে এ সময়টা ছিল বিরোধের যুগ। মিশনারীরা যেমন এদেশের লোকদের খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষিত করছিল, হিন্দুরাও তেমনই মিশনারীদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাচ্ছিল। এই দ্বন্দ্ব এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছায় যে, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। এই সংঘর্ষের যুগে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' লিখে লেখিকা যথেষ্ট সৎসাহস দেখিয়েছিলেন। আরও, সময়টা ছিল বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের যুগ। বিদ্যাসাগরের যুগে লেখিকার পক্ষে চলতি ভাষায় কাহিনী লেখা, আর এক সৎসাহসের ব্যাপার।

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' 'স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত।' এই স্ত্রীলোক কারা, তা নামপত্রের ওপর ইংরেজীতে লেখা শিরোনামের তলায় লেখা "A Book for Native Christian Women" থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। বস্তুতঃ এ উপন্যাসের সমস্ত কাহিনী ও চরিত্র এদেশীয় খ্রীস্টান সমাজের। ফুলমণিকে আদর্শ খ্রীস্টান রমণী হিসাবে দেখানোই উপন্যাসখানির উদ্দেশ্য। ফুলমণির চরিত্র ফুটিয়ে তোলবার জন্য আরও অনেক চরিত্র এসে পড়েছে। যেমন—করুণা, প্যারী, সুন্দরী, রানী ইত্যাদি। লেখিকা নিজেও এই উপন্যাসের এক প্রধান চরিত্র।

বইখানি থেকে বাঙলার সমসাময়িক গ্রাম্যজীবনের এক সুন্দর আলেখ্য পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্না মেয়েরা কোন্ বিষয় নিয়ে কিরূপ জটলা করে, তার জীবন্ত চিত্র তিনি এঁকেছেন রানীর প্রসব-বেদনার সময় প্রতিবেশিনীদের কথোপকথনের ভিতর দিয়ে।

উপন্যাসখানি লেখিকা আরম্ভ করেছেন এই বলে—"কয়েক বৎসর হইল আমি বঙ্গদেশের মফস্বলে নদীতীরবর্তী এক নগরে বাস করিতাম। সেই নগরের নাম এইস্থানে লিখিবার আবশ্যক নাই। তথা হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে

এদেশীয় খ্রীষ্টিয়ান লোকদের এক গ্রাম আছে ; ঐ গ্রামস্থ ভ্রাতা ও ভগিনীদের সহিত আমার যে সুখজনক আলাপ ও ধর্মের বিষয়ে কথোপকথন হইত, তাহা আমি অদ্যাবধি স্মরণে রাখি।

'আপন পরিবারের সহিত উক্ত নগরে পৌঁছিবামাত্র আমি প্রথমে সেইস্থান নিবাসী মিশনারী পাদরি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। পরে অন্যান্য বিষয়ে নানাপ্রকার কথা কহিয়া আমি সাহেবকে বলিলাম। মহাশয়, এই নগরের মধ্যে আমি নূতন আসিয়াছি, এখানে কাহাকেও চিনি না। অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনার বিবেচনাতে কোন্ কোন্ সাহেব ও বিবিরা ধার্মিক বোধ হয়, কারণ আমি এমত লোকদের সহিত মিত্রতা করিতে চেষ্টা করিব। অন্যের সহিত বড় একটা আলাপ করিতে চাহি না। পাদরি সাহেব উত্তর করিলেন ; হায়! এই স্থানে যে ইংরাজ লোকেরা আছে তাহাদের মধ্যে দুই একজন মাত্র ঈশ্বরকে ভয় করিয়া তাঁহার আদেশ পালন করে, অন্য সকলে সাংসারিক কার্যেতে ও নানাপ্রকার কৌতুকাদিতে মত্ত আছে। কিন্তু অতি নিকটবর্তী বাঙালি খ্রীষ্টিয়ানদের যে গ্রাম আছে, তাহাতে এক একজন এমত ধার্মিক লোক বাস করে যে তাহাদের বিষয়ে যথার্থ বলিতে পারি, তাহারা খ্রীষ্টের মণ্ডলীর অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছে।"

॥ চার ॥

বইখানির সূচনা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, লেখিকার বর্ণনার মধ্যে একটা অদ্ভুত সজীবতা ছিল। শুধু কথোপকথন ও ঘটনা সমাবেশের মাধ্যমে নয়, এই বর্ণনার সজীবতার সাহায্যেই তিনি তাঁর উপন্যাসের চরিত্রসমূহকে পাঠকের কাছে পরিস্ফুট করে ধরেছেন। এই উপন্যাসের পরস্পর বিপরীত চরিত্র হচ্ছে ফুলমণি ও করুণা। ফুলমণিরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মিতব্যয়ী, ধর্মভীরু ও পরোপকারী। পাড়াপড়শীর আপদ-বিপদে তারা সব সময়েই এগিয়ে আসে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাদের প্রখর দৃষ্টি। আলস্যকে তারা ঘৃণা করে। ফুলমণির স্বামী প্রেমচাঁদ সাত টাকা বেতনে স্থানীয় পাদরি সাহেবের হরকরার কাজ করে। আর ফুলমণি দুধ বিক্রয় ও সেলাইয়ের কাজ করে সংসারের আয় বৃদ্ধি করে। অপরপক্ষে করুণার স্বামী লম্পট ও মাতাল। ছুতোর মিস্ত্রির কাজ খুব ভাল জানে, এবং কাজ করলে স্বচ্ছন্দে কিছু উপার্জন করতে পারে। কিন্তু সে তা করে না। সে অলস। করুণাও তার মত অলস। এজন্য

তাদের বড় দুর্দশা। তাদের খাবার পরবার সংস্থান নেই। ফুলমণির ছেলে-মেয়েরা মিশনারী স্কুলে পড়ে। তাদের স্বভাব-চরিত্র পিতামাতার ন্যায়। আর করুণার ছেলে লেখাপড়া করে না, জুয়া খেলে ও পিতার মত মদ খায়।

বর্ণনার মাধ্যমে লেখিকা কিভাবে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রসমূহকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা ফুলমণির গৃহে লেখিকার প্রথম আবির্ভাবের বর্ণনা থেকে বুঝতে পারা যাবে : "আমার আগমনের সংবাদ শুনিয়া একজন অর্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক বাহিরে আসিল। তাহার মাথার চুল সুন্দররূপে বাঁধা ও তাহার পরিধেয় শাড়ি অতিশয় পরিস্কার।" তারপর লেখিকা তার বাড়ির বর্ণনা দিচ্ছেন—"তাহার চতুর্দিকের বেড়া নূতন দরমা ও নূতন বাঁশ দিয়া বাঁধা ছিল, এবং তদুপরি একটি সুন্দর ঝিঙালতা উঠিয়াছিল। উঠানের এক পার্শ্বে গোরুর একখানা ঘর দেখা গেল। তাহার মধ্যে একটি গাভী ও বৎস ধীরে ধীরে জাওনা খাইতেছে। গোশালার ছাদের উপরে, অনেক পাকা লাউ দেখিলাম। উঠানের অন্যদিকে পাকশালা ছিল এবং তাহার দ্বার খোলা থাকাতে আমি দেখিতে পাইলাম তন্মধ্যে তিন চারিটি সুমার্জিত থালা ও ঘটি এবং ক'একখান পরিস্কার পাথরও রাশীকৃত আছে। উঠান সুন্দররূপে পরিস্কৃত ছিল, তাহাতে যেমন প্রায় সকল ঘরে রীতি আছে তেমন কোন জঞ্জালের রাশি দেখিতে পাইলাম না; সকল সমান পরিস্কার ছিল। দাবার সম্মুখে ঘরের ছাঁচির নীচে দশ বারটি চারাগাছ গামলাতে সাজান দেখিলাম, তাহার মধ্যে তিন চারিটি ঔষধের গাছ ছিল, অন্য সকল গাঁদা, তুলসী, গন্ধরাজ ইত্যাদি। একটি অতি সুন্দর চীন গোলাপের চারাও ছিল, তাহাতে কুঁড়ি ও ফুল ধরিয়াছিল।"

এই বর্ণনাটি আমাদের চোখের সামনে যে মাত্র ফুলমণির বাড়ির ছবিটাই তুলে ধরে, তা নয়, ফুলমণিকেও। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ম্যালেন্সের প্রতিভা। মাত্র ২৫/২৬ বছর বয়সের এক বিদেশিনী মেয়ে শহরে বাস করে, কোন্ যাদুমন্ত্রের সাহায্যে পল্লীগ্রামের এক বাড়ির এরূপ নিখুঁত ছবি এঁকেছেন, তা ভেবে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই।

॥ পাঁচ ॥

আবার ফুলমণির প্রতি-চরিত্র করুণাকে তিনি কিভাবে পাঠকের কাছে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা দেখুন। লেখিকা ফুলমণির বাড়িতে বসে কথা বলছেন এমন সময় সশব্দে কপাট খুলে করুণা প্রবেশ করল। লেখিকা বলছেন—

"তাহার কাপড় বড় ময়লা এবং চুল বাঁধা না থাকাতে মস্তকেব চতুর্দিকে পড়িয়াছিল। সে আমার মুখপানে কিঞ্চিৎকাল অসভ্যরূপে তাকাইয়া ফুলমণির প্রতি ফুসফাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, উঁনি কে? ফুলমণি বলিল, ইঁনি নূতন মেজিস্ট্রেট সাহেবের বিবি। করুণা ফুলমণিকে বলিল: 'চড়চড়ি রন্ধন করিবার নিমিত্তে কিছু তৈল তোমার নিকট চাহিতে আসিয়াছি, ঘরে একটিও পয়সা নাই, আমার পুত্র এখনই কতকগুলিন চুনামাছ ধরিয়া আনিয়াছে, সেইগুলিন এই বেলার মত রন্ধন করিব। আমার স্বামিকে তো জান; সে আমাকে কিছু খরচ দেয় না, তথাপি খাইতে না পাইলে সমস্ত রাত্রি তিরস্কার করিতে থকে।"

লেখিকা একদিন করুণার বাড়ি গিয়ে তার সংগে কথা বলছেন "এমত সময়ে একটি ছোট বালক গৃহের ভিতরে দৌড়াইয়া আইল। তাহার বর্ণ অতিশয় কাল, এবং ধুলা ও কাদাতে খেলা করিয়া আসিয়াছিল, এইজন্য তাহাকে আরও মলিন বোধ হইল। সে প্রায় উলংগ, কেবল তাহার কোমরে একখানি ছেঁড়া কানি বাঁধা ছিল। ঐ ছেল্যাকে দেখিয়া তাহার মা তাহাকে হঠাৎ বলিল, নবীন এখানে আসিয়া মেম সাহেবকে সেলাম কর। এই মেম সাহেব অতি দয়ালু; ইনি কল্য তোমাকে রুটি ও মিসরী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু নবীন আপন মাতাকে উত্তর করিল, আমি মেম সাহেবকে কেন সেলাম করিব? তুমি তো তাঁহার রুটি ও মিসরী আমাকে খাইতে দিলে না। তাহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কেমন কথা। তবে সে রুটি কি হইল? নবীন তাড়াতাড়ি করিয়া কহিল, মেম সাহেব আমার নিকট শুন, আমি তোমাকে বলি। বকুল নামে একজন স্ত্রীলোক এই পাড়াতে থাকে, তাহার মেয়্যার ব্যামোহ হইয়াছে, এজন্য সে দুই পয়সা দিয়া মায়ের নিকটে ঐ রুটি কিনিয়া লইল; এবং মা সেই পয়সাতে তখনই তামাক কিনিয়া আনিল। ও মেম সাহেব তুমি যদি তাহার তামাক খাওয়া দেখ, তবে আশ্চর্য জ্ঞান করিবা। সমস্ত দিন তাহার আর কোন কর্ম নাই, এবং রাত্রির মধ্যে সে আমাকে এক শতবার জাগাইয়া বলে, তামাক সাজ্। এই কারণে পিতার নিকট কতবার মার খাইয়াছে, তবু তাহার জ্ঞান হয় নাই।"

এই সামান্য উদ্ধৃতি থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন যে, লেখিকা অতি স্বল্প কথায় কিভাবে তাঁর চরিত্রসমূহকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' বাংলা সাহিত্যের যে মাত্র প্রথম উপন্যাস তা নয়, বাংলা সাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ রচনা। ছাব্বিশ বৎসর বয়স্কা এই বিদেশিনী মেয়েটির কাছে বাংলা সাহিত্য বিশেষভাবে ঋণী।

বঙ্কিমের ইন্দিরা ও বিদ্যাধরী

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত বাংলার সাধারণ লোক বিদ্যাধরীর অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখত। যদি তা না হত, তা হলে বঙ্কিমচন্দ্র কখনই তাঁর 'ইন্দিরা' উপন্যাসে বিদ্যাধরীর প্রসঙ্গ তুলতেন না। বঙ্কিমের 'ইন্দিরা' প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে। পরের বছর এটা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। তখন বইখানার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৪৫। চারটি সংস্করণ নিঃশেষিত হবার পর, বঙ্কিম 'ইন্দিরা'র কলেবর বৃদ্ধি করে ১৭৭ পৃষ্ঠায় পরিণত করেন। এই বর্ধিত সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিম বলেন - 'ইন্দিরা ছোট ছিল—বড় হইয়াছে। ইহা যদি কেহ অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন, তবে ইন্দিরা বিনীতভাবে নিবেদন করিতে পারে যে, এমন অনেক ছোটই বড় হইয়া থাকে।' এ সব কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা যে আকারে ইন্দিরাকে পেয়েছি, তা বঙ্কিমের পরিণত চিন্তার ফসল। যদি তৎকালীন পাঠকসমাজ বিদ্যাধরীদের আজগুবী কিছু বলে মনে করত তা হলে বিদ্যাধরীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বঙ্কিম কখনই তাঁর উপন্যাসখানিকে অবাস্তবতার রূপ দিতেন না।

॥ দুই ॥

বঙ্কিমপাঠক সকলেই ইন্দিরার সঙ্গে পরিচিত। ইন্দিরা মহেশপুরের অসামান্য ঐশ্বর্যশালী জমিদার হরমোহন দত্তের মেয়ে। ইন্দিরা নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিল—'আমি রাজার দুলালী।' এগারো বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল। উনিশ বছর বয়সে সে প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল। পথে কালাদীঘিতে ডাকাতরা তার পালকির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বহুমূল্য বস্ত্র ও অলংকারসমূহ অপহরণ করে ও তাকে একখানা মলিন জীর্ণ বস্ত্র পরিয়ে ছেড়ে দেয়। এক ব্রাহ্মণ তাকে উদ্ধার করে তার যজমান কৃষ্ণদাস বসুর গৃহে নিয়ে যায়। ইন্দিরা নিজের পরিচয় গোপন রেখে বলে কলকাতায় তার কাকা থাকে। পরদিন কৃষ্ণদাসবাবু কালীঘাটে পূজা দেবার জন্য কলকাতা যাত্রা করেন। তার কাকার কাছে তাকে আপোষ করবার জন্য কৃষ্ণদাসবাবু ইন্দিরাকে সঙ্গে নিয়ে যান। সেখানে কাকার সন্ধান না পাওয়ায়, ও কৃষ্ণদাসবাবুর কাশী যাবার বরাত থাকায়, ইন্দিরাকে তাদের এক আত্মীয়ের

মেয়ে সুভাষিণীর কাছে দাসী হিসাবে রেখে যান। সুভাষিণীর শ্বশুর রামরাম দত্ত বড় মানুষ। তাঁর পুত্র রমণ (সুভাষিণীর স্বামী) ব্যবহারজীবী। ইন্দিরা নিজ নাম গোপন রেখে কুমুদিনী নামে সুভাষিণীদের বাড়ি পাচিকার কাজে নিযুক্ত হয়। সুভাষিণী ইন্দিরার হাতে, গলায় গহনার কালি দেখে বুঝতে পারে যে ইন্দিরা বড় মানুষের মেয়ে। সে তার সঙ্গে সখিত্ব পাতায়। কায়দা করে পরিচয় সংগ্রহ করে সুভাষিণী বুঝল যে, ইন্দিরার স্বামী উপেন্দ্র, রমণবাবুর মক্কেল। মকদ্দমার কারণে রমণবাবু উপেন্দ্রকে কলকাতায় আসতে বলে ও নিজ গৃহে তাকে নিমন্ত্রণ করে। সেখানে আহারের সময় উপেন্দ্র ইন্দিরাকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু তাকে নিজ স্ত্রী বলে জানতে পারে না। ইন্দিরা কিন্তু নিজ স্বামীকে চিনতে পারে। তারপর সুভাষিণীর চাতুর্যে রাত্রিকালে উপেন্দ্রর সঙ্গে ইন্দিরার সাক্ষাৎ হয়। উপেন্দ্রকে তার প্রতি আকৃষ্ট দেখে, কুমুদিনী কথোপথনে জেনে নেয় যে, ইন্দিরা অপহৃতা হবার পর উপেন্দ্র আর বিবাহ করে নি। আরও জানতে পারে যে, ইন্দিরাকে পাওয়া গেলে, ইন্দিরা ডাকাতস্পৃষ্টা বলে তার স্বামী ইন্দিরাকে আর গ্রহণ করবে না। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে অনবধানবশত কুমুদিনী একবার ইন্দিরার নাম উচ্চারণ করে ফেলে। তখন উপেন্দ্রর সন্দেহ হয় কুমুদিনী ইন্দিরা কী না? তারপর জেরা চলতে থাকে। জেরায় ইন্দিরার বিবাহের স্ত্রী-আচারের সময়ের ঘটনা, ফুলশয্যার রাত্তিরে স্বামীর সঙ্গে ইন্দিরার যে সব কথাবার্তা হয়েছিল, তা কুমুদিনীর মুখে প্রকাশ পাওয়ায় উপেন্দ্রর ধারণা হয় যে, কুমুদিনী মানুষী নয়, কোন মায়াবিনী হবে। ইন্দিরাও আত্মপ্রকাশ না করে বলে—'আমি মায়াবিনী। কামরূপে আমার অধিষ্ঠান। আমি আদ্যাশক্তির মহামন্দিরে তাঁহার পার্শ্বে থাকি। লোকে আমাদিগকে ডাকিনী বলে কিন্তু আমরা ডাকিনী নই। আমরা বিদ্যাধরী। আমি মহামায়ার নিকট কোন অপরাধ করেছিলাম, সেই জন্য অভিশাপগ্রস্ত হইয়া এই মানবীরূপ ধারণ করিয়াছি। পাচিকাবৃত্তি ও কুলটাবৃত্তি ভগবতীর শাপের ভিতর। তাই এই সকলও অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। এক্ষণে আমার শাপমুক্ত হইবার সময় হইয়াছে। আমি জগন্মাতাকে স্তবে প্রসন্ন করিলে, তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন যে, মহাভৈরবী দর্শন করিবামাত্র আমি মুক্তিলাভ করিব।' উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করে, 'সে কোথায়?' কুমুদিনী বলে, 'মহাভৈরবীর মন্দির মহেশপুরে তোমার শ্বশুরবাড়ির উত্তরে। সে তাদেরই ঠাকুরবাড়ি। বাড়ির গায়ে খিড়কি দিয়া যাতায়াতের পথ আছে। চল মহেশপুরে যাই।'

এদিকে উপেন্দ্র কুমুদিনীগতপ্রাণ হয়ে পড়ে। কিন্তু কুমুদিনীই কি সত্যি ইন্দিরা এ দ্বিধা তার মনে থেকে যায়। যা হোক, কুমুদিনীকে সে ছাড়তে পারল না। তাকে মহেশপুর নিয়ে গেল। সরাসরি আর সে শ্বশুরবাড়ি গেল না, মাত্র কুমুদিনীকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে নিজ বাড়িতে চলে গেল। বলে দিল, দুদিন পরে সে শ্বশুরবাড়ি যাবে।

দুদিন পরে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উপেন্দ্র তার শ্যালিকা কামিনীকে জিজ্ঞাসা করল, 'কুমুদিনী বলিয়া কোন স্ত্রীলোক আসিয়াছিল কি?' কামিনী বলিল, 'কুমুদিনী কি কে, তাহা বলিতে পারি না, একটা স্ত্রীলোক পরশুদিন পালকি করিয়া আসিয়াছিল বটে। সে বরাবর মহাভৈরবীর মন্দিরে গিয়া উঠিয়া দেবীকে প্রণাম করিল। অমনই একটা আশ্চর্য ব্যাপার উপস্থিত হইল। হঠাৎ মেঘে অন্ধকার হইয়া ঝড়বৃষ্টি হইল। সেই স্ত্রীলোকটা সেই সময় ত্রিশূল হাতে করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে আকাশে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গেল।'

সব শুনে উপেন্দ্র স্তব্ধ হয়ে গেল, বলল যে জায়গায় কুমুদিনী অন্তর্হিত হয়েছে, সে জায়গাটা কি আমি দেখতে পাই না? কামিনী বলল, 'পাও বৈ কি।' কামিনী আগে ইন্দিরাকে মন্দিরে পাঠিয়ে দিল। তারপর উপেন্দ্রকে সেখানে নিয়ে গেল। উপেন্দ্র সেখানে কুমুদিনীকে দেখতে পেয়ে তার পায়ে আছড়ে পড়ে বলল, 'কুমুদিনী, কুমুদিনী যদি আসিয়াছ—তা আর আমায় ত্যাগ করিও না।' কয়েকবার তাকে একথা বলতে শুনে কামিনী চটে উঠে বলল, 'আয় দিদি উঠে আয়। ও মিনসে কুমুদিনী চেনে, তোকে চেনে না।' উপেন্দ্র ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি। দিদি কে?' কামিনী রাগ করে বলল, 'আমার দিদি ইন্দিরে। কখনও নাম শোনোনি!'

। তিন ।

বঙ্কিমের 'ইন্দিরা' উপন্যাসের কাহিনী এখানে সংক্ষেপে বলা হল। এ থেকে বুঝতে পারা যাবে যে, 'ইন্দিরা' উপন্যাসের রচনাকাল পর্যন্ত বাঙালী বিদ্যাধরীতে বিশ্বাস রাখত। হয়ত, অনেকে বলবেন এটা রচনাকালের ঘটনা নয়, কাহিনী-কালের ঘটনা। 'ইন্দিরা'-র কাহিনীকালটা তবে কবেকার? উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে ইন্দিরা স্বামী সম্বন্ধে বলছে—'তিনি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। তখন রেইল হয় নাই—পশ্চিমের পথ অতি দুর্গম ছিল। তিনি পদব্রজে বিনা

অর্থে, বিনা সহায়ে, সেই পথ অতিবাহিত করিয়া পাঞ্জাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন।' সুতরাং কাহিনীটা রেলপথ স্থাপনের পূর্বেকার ঘটনা। হাওড়া হতে রেলপথ প্রথম স্থাপিত হয় ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে তা বিস্তৃত হয় মোগলসরাই পর্যন্ত। সুতরাং 'ইন্দিরা'-র কাহিনী উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নকালের কাছাকাছি সময়ের। তবে খুব বেশি আগেকার যে নয়, তা পঞ্চম অধ্যায়ে অমলা ও নির্মলার মল বাজিয়ে গান করতে করতে জল আনতে যাওয়া দেখে বসুজপত্নীর উক্তি—'ছুঁড়ীদের মরণ আর কি ? মল বাজানর আবার গান'—থেকে বুঝতে পারা যায় যে, বসুজপত্নী এমন যুগের লোক, যে যুগে মল বাজিয়ে গান করতে করতে জল আনতে যাওয়াটা আর বরদাস্ত করা হত না।

এদেশের লোক অতি প্রাচীন কাল হতেই বিদ্যাধরীতে বিশ্বাস করে এসেছেন বিদ্যাধরী কারা ? অভিধান খুলে দেখি মাত্র লেখা আছে, বিদ্যাধরীরা দেবযোনি বিশেষ। তবে অন্য সূত্র থেকে জানতে পারা যায়, এরা পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থলে বাস করে। সাধারণতঃ এরা মঙ্গলকামী, অনুচর হলেও এদের নিজেদের রাজা ছিল। এরা মনুষ্যজাতির সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করত। এদের কামরূপী বলা হত কারণ এরা ইচ্ছে মত নিজেদের চেহারা পরিবর্ত করতে সক্ষম হত। ভারতীয় ভাস্কর্যে উড়ন্ত বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীদের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীদের সম্বন্ধে বহু কাহিনী নিবদ্ধ আছে কাশ্মীরী কবি সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'-এ। 'কথাসরিৎসাগর'-এর রচনাকাল আনুমানিক ১০৬৩-৮১ খ্রীস্টাব্দ। সোমদেব তাঁর গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থরচনার যে ইতিহাস দিয়েছেন, তা থেকে জানতে পারা যায় যে জলন্ধর-রাজকন্যা কাশ্মীর-রাজ অনন্তের মহিষী সূর্যমতীর চিত্তবিনোদনের জন্য গুণাঢ্যরচিত পৈশাচী ভাষায় রচিত 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে সোমদেব তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'কথাসরিৎসাগর'-এর প্রথম তরঙ্গ থেকে জানতে পারা যায় যে, সিদ্ধ বিদ্যাধর ও প্রমথগণ কৈলাসচলে ভগবান মহাদেব ও পার্বতীর অনুচর হয়ে তাঁদের সেবা করে থাকেন।

॥ চার ॥

'কথাসরিৎসাগর'-এর ষষ্ঠ লম্বকে চতুস্ত্রিংশ তরঙ্গে মদনমঞ্জুকার উপাখ্যানে আমরা দেখি কি ভাবে বিদ্যাধর-রাজ বৎস রাজার রূপ ধারণ করে বৎস রাজার প্রণয়িনী কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণ করেছিল। সেখানে আমরা বঙ্কিমের প্রতিধ্বনিও দেখি—'পূর্বে তুমি অপ্সরা ছিলে, এখন দেবরাজ ইন্দ্রের অভিশাপে মানুষী যোনিপ্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি সতী হইয়াও কর্মফলে অসতী আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছ।'

'কথাসরিৎসাগর'-এর রত্নপ্রভানামক সপ্তম লম্বকের চতুশ্চত্বারিংশ তরঙ্গে কোন বিদ্যাধর অন্তরীক্ষ হতে ভূতলে নেমে বৎস-রাজকে বলে—'রাজন! হিমালয়ের অন্তর্বর্তী বজ্রকূট নগরে আমার বাস এবং আমার নাম বজ্রপ্রভ। ভগবান ভবানীপতি আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে শত্রুর অজেয় করিয়াছেন। আজ আমি ভগবানকে প্রণাম করিয়া আসিতে আসিতে নিজ বিদ্যাপ্রভাবে জানিতে পারি রাজকুমার নরবাহনদত্ত দেব উমাপতির একজন পরম ভক্ত, এবং কামদেবের অংশসম্ভূত, সেই ভগবানের কৃপায় তিনি স্বর্গ-মর্ত উভয় লোকে রাজত্ব করিবেন। পুরাকালে রাজা সূর্যপ্রভ মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া বিদ্যাধর সিংহাসনের দক্ষিণার্ধ আর শ্রুতশর্মা নামক রাজা উত্তরার্ধ প্রাপ্ত হন।'

শ্রুতশর্মা ও সূর্যপ্রভের উল্লেখ আমরা পাই পঞ্চচত্বারিংশ তরঙ্গে। সেখানে আছে—'অনন্তর একদিন দেবর্ষি নারদ রাজসভায় আসেন ও রাজদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, রাজন! দেবরাজ ইন্দ্র আপনাকে এই কথা বলিবার নিমিত্ত আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনারা যে মহাদেবের আদেশে ময়দানবের সাহায্যে মর্তবাসী সূর্যপ্রভকে বিদ্যাধরপদে প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহা অতিশয় অযোগ্য। যেহেতু আমরা শ্রুতশর্মাকে এই পদ প্রদান করিয়াছি, সেই পদ তাহার কুলক্রমাগত ভোগে থাকিবে, এইরূপ নির্ধারিত আছে। তবে যদি আপনারা আমাদিগের প্রতিকূল কার্য করিতে চেষ্টা করেন, তাহা কেবল আপনাদিগের আত্মবিশ্বাস হেতু জানিবেন। আপনাকে রুদ্রযজ্ঞ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাহার পরিবর্তে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে আদেশ করা হয়, আপনি তাহাও করেন নাই। এই প্রকার সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করতঃ একমাত্র মহাদেবের আরাধনা করিলে কখনই আপনাদিগের মঙ্গল হইবে না।'

বিদ্যাধর রাজ্যের অধিপতির পদ নিয়ে শ্রুতশর্মা ও সূর্যপ্রভের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা আমরা 'কথাসরিৎসাগর'-এর অষ্টম লম্বকের 'সংগ্রাম সমাপন' নামক অষ্টচত্বারিংশ তরঙ্গেও পাই।

এ সব থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে বিদ্যাধর চক্রবর্তীর পদ নিয়ে একসময় আর্য ও অনার্য সমাজের মধ্যে সংঘাত ঘটেছিল। কেননা মহাদেব ছিলেন অনার্য দেবতা ; আর দেবরাজ ইন্দ্র হচ্ছেন আর্যদের দেবতা এবং অশ্বমেধও আর্যীয় অনুষ্ঠান। 'কথসরিৎসাগর'-এ যে সব কাহিনী আছে, তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, বিদ্যাধরীরা অনার্যচিন্তার অবদান এবং তারা অনার্য ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াদিতে দক্ষ ছিল।

বিদেশী বণিক ও বাঙালী সমাজ

অতি প্রাচীন কাল থেকে বাঙলার বণিকগণ পৃথিবীর নানাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। সেই উপলক্ষে বিদেশী বণিকগণের বাঙলাদেশে যাতায়াত ছিল। কিন্তু আমরা যে বণিকদের কথা এখানে আলোচনা করছি, তারা স্বতন্ত্র। তারা বাংলাদেশে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল ও বাঙালী সমাজের ওপর গভীর প্রতিঘাত হেনেছিল। এ সকল বিদেশী বণিক প্রথম আসতে শুরু করেছিল খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে। যারা সবচেয়ে আগে এসেছিল, তারা হচ্ছে পর্তুগীজ।

পর্তুগীজরাই সমুদ্রপথে ভারতে আসবার পথের সন্ধান পেয়েছিল পর্তুগালের রাজা প্রথম ম্যানুয়েলের রাজত্বকালে ভাসকো-ডা- গামা নামে এক নাবিক উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে এসে পৌঁছান। কিন্তু ভারতে আসবার পথ তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। দৈবক্রমে এই সময় তাঁর সঙ্গে এক গুজরাটি মুসলমান নাবিকের সাক্ষাৎ ও বন্ধুত্ব হয়। এই গুজরাটি মুসলমান নাবিকই তাঁকে ভারতের পথ দেখিয়ে, ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে কপ্পাট নামক গ্রামে তাঁকে পৌঁছে দেয় (১৪৯৯ খ্রীস্টাব্দ)। এই গ্রামের পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরেই ছিল মালাবারের রাজধানী কালিকট। কালিকটের রাজা ছিলেন মুসলমান। তিনি পর্তুগীজদের সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করেন।

মালাবারের উপকূলে নিজেদের শক্তি সুদৃঢ় করে পর্তুগীজরা গোয়ায় তাদের শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করে। বাঙালী বণিকরা গোয়ার হাটে তাদের মাল বেচতে যেত। সেজন্য পর্তুগীজরা বাঙলার পণ্যদ্রব্য ও তার সুলভতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

সরাসরি বাঙলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করবার উদ্দেশ্যে ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে তারা বাঙলায় দু-একজন নাবিক পাঠিয়ে দেয়। প্রথম এসে চট্টগ্রামে উপস্থিত হয় যোয়াও কোয়েলহো (Joao Coelho) নামে একজন নাবিক। চট্টগ্রামই তখন ছিল বাঙলাদেশের বড় বন্দর। কেননা এখান থেকে মেঘনা নদীর জলপথে বাঙলার রাজধানী গৌড়ে পৌঁছান যেত।

যোয়াও কোয়েলহো নিজে কোন জাহাজ আনেন নি। তিনি মালাক্কা থেকে

এক মুসলমানী জাহাজে চেপে এসেছিলেন। পর্তুগীজ জাহাজ নিয়ে বাঙলায় প্রথম আসেন যোয়াও দ্য সিলভিরা (Joao de Silveira) ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে। তিনি বাঙলার সুলতান মামুদ শাহের কাছে প্রার্থনা জানান যে, পর্তুগীজরা যেন তাঁর রাজ্যে বাণিজ্য করতে পারে, এবং চট্টগ্রামে যেন তাদের একটা কুঠি নির্মাণ করতে দেওয়া হয়। মামুদ শাহ পর্তুগীজদের এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন।

পর্তুগীজরা কিন্তু দমবার পাত্র ছিল না। প্রতি বৎসরই তারা বাঙলাদেশে বাণিজ্য অভিযান পাঠাতে থাকে। এই কারণে মামুদ শাহের সংগে তাদের বিরোধ ঘটে।

। দুই ।

শীঘ্রই বাঙলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্তুগীজদের সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় বাঙলাদেশ শেরশাহ ও হুমায়ুনের মধ্যে যুদ্ধের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। পর্তুগীজরা এই যুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এটা ১৫৩৫-৩৭ খ্রীস্টাব্দের ব্যাপার। ঠিক এই সময় পশ্চিম বাঙলার শ্রেষ্ঠ ও অতি প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামে দিওগো রিবেলো নামে এক পর্তুগীজ বণিক এসে হাজির হয়। শেরশাহ বাঙলাদেশ আক্রমণ করবার উপক্রম করছে দেখে মামুদ শাহ পর্তুগীজদের প্রতি তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেন। তিনি দেশরক্ষার জন্য পর্তুগীজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে তার পরিবর্তে তিনি পর্তুগীজদের সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রাম এই উভয় জায়গাতেই কুঠি ও দুর্গ নির্মাণ করতে দেবেন। যদিও শেরশাহের সংগে যুদ্ধে মামুদ শাহ জয়ী হলেন না, তথাপি তিনি পর্তুগীজদের সাহায্য স্বীকার করে নিলেন। তিনি সপ্তগ্রামে ও চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের কুঠি নির্মাণ ও বাঁকশাল (custom house) স্থাপন করতে দিলেন, কিন্তু দুর্গ নির্মাণ করবার অনুমতি সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করলেন। মামুদ পর্তুগীজদের সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামে শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করতে দিলেন দেখে দেশবাসী অবাক্ হয়ে গেল। এইভাবে ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাঙলাদেশের লোক পর্তুগীজদের সংগে পরিচিত হয়ে উঠল। বাঙলাদেশের লোকেরা তাদের ফিরিঙ্গি (frank শব্দের অপভ্রংশ) বা হারমাদ (armada শব্দের অপভ্রংশ) বলে অভিহিত করতে লাগল।

। তিন ।

সপ্তগ্রামেই পর্তুগীজরা বাঙলার সংগে তাদের বাণিজ্যের মূল ঘাঁটি স্থাপন করল। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে সপ্তগ্রামের ছিল খুব সুনাম। সাতখানা গ্রামের সমষ্টি নিয়ে 'সপ্তগ্রাম' নামের উৎপত্তি। এই সাতখানা গ্রাম যথাক্রমে বংশবাটি (বা বাঁশবেড়িয়া), কৃষ্ণপুর, বাসুদেবপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সম্বোকায়া ও বলদঘাটি। এই সাত গ্রামের বণিকদের মিলনস্থান ছিল সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রাম ছিল সরস্বতী নদীর উপর অবস্থিত। সরস্বতীই এককালে ভাগীরথীর প্রধান খাত ছিল। সেজন্য সপ্তগ্রাম পূর্বভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর ও নগর হিসাবে পরিগণিত হত। উত্তর ভারতের নানাস্থান থেকে ব্যবসায়ীরা সপ্তগ্রামের হাটে মাল কেনাবেচা করতে আসত। পর্তুগীজরা যে সময় সপ্তগ্রামে আসে, তার অব্যবহিত পরেই শেরশাহ সপ্তগ্রাম থেকে দিল্লী পর্যন্ত এক প্রশস্ত রাজপথ তৈরি করে দিয়েছিলেন (এটাই পরবর্তীকালের গ্রান্ড টাঙ্ক রোড)। এর ফলে, উত্তর ভারতের ব্যবসায়ীদের সপ্তগ্রামের হাটে আসার পথ আরও সুগম হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে, পর্তুগীজদের সংগে বাণিজ্য করবার জন্য সপ্তগ্রামের বাজারে আরও অনেক ব্যাপারীর সমাগম হয়। সমসাময়িক সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, সপ্তগ্রামের বাজার সব সময়েই অগণিত জনগণের কলরবে মুখরিত থাকত।

পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামে আসবার পর তাদের সংগে ব্যবসা করবার জন্য আরও এগিয়ে এসেছিল বাঙালী বণিকের দল। এর ফলে, উভয় পক্ষই রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেল। সপ্তগ্রামের বণিকদের ধনাঢ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় সমসাময়িক বাঙলা সাহিত্যে। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মধ্যলীলায় লিখিত আছে—"হিরণ্য গোবর্ধন নামে দুই সহোদর। সপ্তগ্রামে বারো লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর।" সপ্তগ্রামের আরও দুই বণিকের নাম আমরা সমসাময়িক মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমংগল' কাব্যে পাই। এরা হচ্ছে শ্রীধর হাজরা ও রাম দা। অন্যান্য স্থানের যে সকল বণিকের নাম আমরা মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমংগল' কাব্যে পাই, তারা হচ্ছে—বর্ধমানের ধুস দত্ত, চম্পাইনগরের চাঁদ সদাগর ও লক্ষ্মী সদাগর, কর্জনার নীলাম্বর ও তার সাত সহোদর, গণেশপুরের সনাতন চন্দ ও তার দুই সহোদর গোপাল ও গোবিন্দ, দশঘরার বাশুলা, সাঁকোরের বিষ্ণুদত্ত ও তার সাত সহোদর, সাঁকোরের শঙ্খ দত্ত, কয়েতির যাদবেন্দ্র দাস, ঝাড়গ্রামের রঘু দত্ত, তেথরার গোপাল দত্ত, ত্রিবেণীর রাম রায় ও তার দশ সহোদর, লাউগায়ের

রাম দত্ত, পাঁচড়ার চণ্ডীদাস খাঁ, বিষ্ণুপুরের ভগবন্ত খাঁ, খণ্ডঘোষের বাসুদত্ত, ও গোতনের মধু দত্ত ও তাঁর পাঁচ সহোদর। বলা বাহুল্য যে, এ'রা সকলেই ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। আর পর্তুগীজদের ধনাঢ্যতা সম্বন্ধে হ্যামিলটন লিখে গেছেন যে পর্তুগীজ বণিকরা যে ঘোড়ায় চেপে বাঙলার হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়াত, সেই সকল ঘোড়ার লাগাম ছিল সোনার চুমকি বসানো ও এদেশের রেশম দিয়ে তৈরি। আর চাবুক ছিল নানা রঙের মিনে করা রুপার পাতের। আর তাদের পরনে থাকত বহুমূল্য বর্ণাঢ্য পোশাক।

পরবর্তীকালের অন্যান্য ইওরোপীয় বণিকরা দালাল মারফত আগে থাকতে দাদন দিয়ে নমুনা অনুযায়ী মাল সংগ্রহ করত। পর্তুগীজরা কিন্তু তা করত না। তারা বাজার থেকে নগদ দামে সরাসরি মাল কিনে নিত। এজন্য প্রথম প্রথম (১৫৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত) তাদের স্থায়ীভাবে থাকবার কোন প্রয়োজন হত না। প্রতি বছর তারা নতুন করে আসত, এবং সপ্তগ্রামের কাছাকাছি জায়গায় চালাঘর তৈরি করে বাস করত। তারপর কেনাবেচা শেষ হয়ে গেলে চালাঘরগুলো পুড়িয়ে দিয়ে আবার ফিরে যেত।

॥ চার ॥

পরবর্তী ৪০ বৎসরের রাজনৈতিক চঞ্চলতা ও নদীপ্রবাহের পরিবর্তন পর্তুগীজদের বাণিজ্যপ্রসারকে বিব্রত করে তোলে। তারা বিশেষ করে মুশকিলে পড়ে সরস্বতী নদীর জল শুকিয়ে যাওয়ার কারণে। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া থেকেই সরস্বতী নদী শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করেছিল। ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দে দিওগো রিবেলো যখন সপ্তগ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তখনও বড় জাহাজ সপ্তগ্রাম পর্যন্ত এসে হাজির হত। তারপর জল ক্রমশ শুকিয়ে যাওয়ার ফলে পর্তুগীজদের পক্ষে বড় জাহাজ সপ্তগ্রাম পর্যন্ত নিয়ে আসা সম্ভবপর হত না। তখন তারা বড় জাহাজ শিবপুরের (কলকাতার অপর পারে) নিকট বেতোড়ে নোঙর করত ও ছোট নৌকয় সপ্তগ্রাম যেত। সরস্বতীর নাব্যতা যখন একেবারে নষ্ট হয়ে গেল, তখন তারা ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দে আগরায় গিয়ে সম্রাট আকবরকে বহু উপঢৌকন দিয়ে সন্তুষ্ট করে তার কাছ থেকে সপ্তগ্রামের নিকট হুগলীতে কুঠি নির্মাণ করবার নিমিত্ত একখানা ফারমান সংগ্রহ করে। এরপর তারা হুগলীতে একটা স্থায়ী নগর স্থাপন করবার জন্য আগরায় ক্যাপটেন ট্যাভারেজকে পাঠায়। আকবর তাদের প্রতি সদয় হয়ে অনুমতি দেন যে, তারা হুগলীর

নিকট এক স্থায়ী নগর স্থাপন করতে পারবে, এবং সেখানে গীর্জা তৈরি করে খ্রীস্টের সুসমাচার প্রচার করতে পারবে। হুগলী তখন একটা নগণ্য স্থান ছিল। মাত্র দশ-বারো খানা মেটে বাড়ি ছাড়া, আর কিছুই ছিল না। কিন্তু পর্তুগীজরা এখানে রীতিমত চিরস্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করে এটাকে নগরে পরিণত করে। ব্যবসার সুবিধার জন্য সপ্তগ্রামের বণিকরা হুগলীতে উঠে আসে। এইভাবে সম্রাট আকবরের আনুকুল্যে পর্তুগীজরা হুগলীকে বাঙলাদেশের শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত করে। আবদুল হামিদ লাহোরী তাঁর 'বাদশাহনামা'য় লিখে গেছেন যে, পর্তুগীজরা হুগলীতে এসে সুদৃঢ় ঘরবাড়ি নির্মাণ করে ও সেগুলি তারা কামান ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করে। নদীর দিক ছাড়া, বাকী তিনদিক তারা পরিখা খনন করে জায়গাটাকে সুরক্ষিত করে। মোট কথা, এখন থেকে পর্তুগীজরা প্রতিবৎসর আর যাওয়া-আসা না করে, বাঙলায় স্থায়ী বসবাস শুরু করে (১৫৮০ খ্রীস্টাব্দ থেকে)।

॥ পাঁচ ॥

অত্যন্ত বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পর্তুগীজরা হুগলীতে তাদের শক্তি বিস্তার করে। বহু পর্তুগীজ এসে হুগলীতে বসবাস শুরু করে। এ ছাড়া, পর্তুগীজ পাদরীরা এ দেশের বহু লোককে ধর্মান্তরিত করে। পর্তুগীজরা ছাড়া, বহু বাঙালী, হিন্দুস্থানী, মোগল, পারসিয়ান ও আর্মেনিয়ান বণিকরা এসেও হুগলীতে বসবাস শুরু করে। হুগলী একটা জনবহুল নগরে পরিণত হয়। হুগলীর বন্দরে নোঙর করতে আরম্ভ করল চীন, মালাক্কা, মানিলা ও ভারতের বিভিন্ন বন্দরের পণ্যবাহী জাহাজসমূহ। মোট কথা, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার সমস্ত বাণিজ্য পর্তুগীজদের হাতে গিয়ে পড়ে। এ ছাড়া, লবণ তৈরির একচেটিয়া অধিকারও তারা পায়।

ক্রমশ পর্তুগীজরা তাদের বসতি বাড়াতে লাগল, বহু পতিত জমিতে চাষ করবার অধিকারও তারা পেল। হুগলী থেকে দুশো মাইল অভ্যন্তরস্থ অঞ্চল সমূহ পর্তুগীজদের প্রভাবে এসে পড়ল। এ ছাড়া, ভাগীরথীর উভয় তীরে, তারা আরও জমিজমা কিনল। ক্রমশ তারা এমন শক্তিশালী হয়ে পড়ল যে, এই সকল জমিজমা থেকে তারা নিজেরাই রাজস্ব আদায় করতে লাগল, এবং মোগলদের অধীনতার নিদর্শন স্বরূপ যে নামমাত্র কর তাদের মোগল-রাজকোষে দেবার কথা ছিল, তাও দিতে অস্বীকার করল। এক কথায়, তারা আর

মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করল না। হুগলীতে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই শাসন আরম্ভ করল। এমন কি পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে মোগলরা পর্তুগীজদের নগরমধ্যে প্রবেশ করতেও পারত না। বন্দরে জাহাজ প্রবেশ সম্বন্ধে পর্তুগীজরা যে সকল নিয়ন্ত্রণ-বিধি প্রবর্তন করেছিল, সেগুলো মোগলদের জাহাজের ওপরও প্রয়োগ করল। তাদের জোর, জুলুম, অত্যাচার, শোষণ, বলপূর্বক ছেলেমেয়েদের ধরে ধর্মান্তরিতকরণ ও নারীধর্ষণ বঙ্গবাসীকে সন্ত্রস্ত করে তুলল।

॥ ছয় ॥

এদিকে পূর্ববাঙলার লোকেরাও পর্তুগীজদের নামে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। পাঠান রাজত্বের দুর্বলতার সময় পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে অনেক জমিদার স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করতে আরম্ভ করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে মোগলরা যখন পূর্ববঙ্গ জয় করে, মোগলদের তখন এদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। এদের বারভুঁইয়া বলা হত। এঁরা পর্তুগীজদের বরকন্দাজ হিসাবে রাখতেন। পরে পর্তুগীজরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, বিশেষ করে আরাকানের রাজার সঙ্গে যুদ্ধের সময়। ঢাকা থেকে শ্রীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল পর্তুগীজ দ্বারা ছেয়ে গিয়েছিল, এবং যখন স্থানীয় লোকেরা পর্তুগীজদের ওপর রুষ্ট হল, তখন সম্রাট আকবর আদেশ পাঠিয়ে দিলেন যে, পর্তুগীজদের ওপর যেন কোন রকম হামলা করা না হয়। পর্তুগীজরা ঢাকায় গীর্জা স্থাপন করে, এবং স্থানীয় লোকদের ধর্মান্তরিত করে।

ঢাকার নবাবের সঙ্গে মিত্রতাই পর্তুগীজদের পূর্ব বাঙলায় অগ্রগতির কারণ। শায়েস্তা খাঁর আমলে তারা বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করে, এবং ইছামতী নদীর তীরে প্রায় ১২ মাইল বিস্তৃত এলাকায় ফিরিঙ্গি বাজার স্থাপন করে। এ ছাড়া, ঢাকা, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলায় পর্তুগীজরা আরও বসতি স্থাপন করে। এগুলি ক্রীশ্চান অঞ্চলে পরিণত হয়। যে-সব জায়গায় পর্তুগীজরা তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তার অন্তর্ভুক্ত ছিল শ্রীপুর, চন্দেকান, বাকলা, কাট্রাকো, লরিকুল ও ভুলুয়া।

পশ্চিমবঙ্গেও তারা তমলুক, হিজলি, পিপলি ও বালেশ্বর পর্যন্ত বসতি স্থাপন করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল ও বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার পেয়েছিল। বলা বাহুল্য, এ সব জায়গায় তারা গীর্জা স্থাপন করে

বহু স্থানীয় লোককে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করেছিল।

কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন থেকে আরম্ভ হয় পর্তুগীজদের অবনতি। বাঙলাদেশ থেকে মাল কিনে, বিদেশের হাটে দশবিশ গুণ চড়া দামে বেচে তারা অতি ধনী হয়ে পড়েছিল। ধনী সমাজের যে সকল গুণাগুণ দেখতে পাওয়া যায়, তা তাদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। বাঙলায় তারা বিলাসিতা ও লাম্পট্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং শীঘ্রই আগন্তুক ওলন্দাজ ও ইংরেজদের কাছে তারা বাণিজ্যে পরাহত হয়ে যায়।

॥ সাত ॥

পর্তুগীজ আধিপত্যের প্রভাবে বাঙালী সমাজ বিশেষ ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল। অবশ্য বাঙালী সমাজের বিপর্যয় অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল—হিন্দু রাজত্বের অবসানের পর থেকে। ১২০৩ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাঙলা বিজিত হবার পর, মুসলমান পীর, দরবেশ ও মোল্লা কর্তৃক বাঙলায় ধর্মান্তরিতকরণের এক অভিযান চলেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতান জালালুদ্দিনের সময় এই ধর্মান্তরিত করার অভিযান তুঙ্গে উঠেছিল। দুর্বল নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের কাছে দুটি প্রস্তাব রাখা হয়েছিল—'হয় কোরান গ্রহণ কর, আর তা নয় তো মৃত্যু বরণ কর।' প্রাণভয়ে অনেকেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। যারা অস্বীকৃত হয়েছিল, তারা কামরূপ, আসাম ও কাছাড়ের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। কেবল জোর, জুলুম করেই যে মুসলমান করা হত, তা নয়। অনেক হিন্দু স্বেচ্ছায়ও মুসলমান হত। হিন্দু সমাজের কঠোর সংরক্ষণনীতি ও জাতি-বিভেদই এর মূল কারণ ছিল। যারা মুসলমান ধর্মগ্রহণ করেছিল তাদের অধিকাংশই হিন্দু সমাজের অবহেলিত নিম্নসম্প্রদায়ের লোক। নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ তাদের হেয় চক্ষে দেখতেন। এ সকল সম্প্রদায় ইসলামের সাম্যনীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। তারা মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'খানকা' দ্বারাও আকৃষ্ট হত। খানকাগুলি ছিল মসজিদ ও দরগার সংলগ্ন প্রতিষ্ঠান, যেখানে আশ্রয় ও খাওয়া-দাওয়া দুই-ই পাওয়া যেত। এ ছাড়া ছিল বলপূর্বক অপহৃতা ও পদস্খলিতা হিন্দু সধবা ও বিধবা। হিন্দু সমাজে এদের কোন স্থান ছিল না। যদি হিন্দুরমণী মুসলমানের সহিত ভ্রষ্টা হত, তা হলে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তার মুসলমান উপপতির পরিবারে বিবির স্থান পেত। এ ছাড়া ছিল দেশে দাসদাসীর হাট। অসময়ে দুঃস্থ

জনসাধারণ তাদের ছেলে-মেয়ে বেচে দিত। যখন মুসলমানরা কিনত, তখন তারা তাদের ধর্মান্তরিত করত।

হিন্দু সমাজ যখন এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, তখন আবির্ভূত হন দুই মহাপুরুষ—স্মার্ত রঘুনন্দন ও শ্রীচৈতন্য। মুসলমানগণ কর্তৃক অপহৃতা নারীকে অল্প প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা হিন্দুসমাজে আবার গ্রহণ করবার বিধান দেন রঘুনন্দন। হিন্দুসমাজে কিন্তু সাম্যনীতির অভাব ও জাতিভেদ প্রথা রয়ে যায়। তাছাড়া, এ সময়ে হিন্দুসমাজে তন্ত্র-ধর্ম বিকৃতি লাভ করে বহু আনাচারমূলক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সমাজের কঠোরতাও চরমশীর্ষে উঠেছিল। ধর্মে মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম-প্রীতির লেশমাত্র ছিল না। এই সব দূর করতে প্রয়াসী হন শ্রীচৈতন্যদেব। পরস্পরের প্রতি প্রেম ও প্রীতি স্থাপন করাই ছিল চৈতন্য-প্রবর্তিত গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল ভিত্তি। এই ধর্মে জাতির প্রতি জাতির বিদ্বেষ ও অবিচার এবং এক ধর্মের সহিত অপর ধর্মের বিভেদের কোন স্থানই ছিল না। চৈতন্য বিশ্বাস করতেন যে, প্রেম ও ভক্তিমূলক নৃত্যগীতের মাধ্যমে মানুষ এমন এক আনন্দময় স্তরে পৌঁছতে পারে যেখানে সে ভগবানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারে। চৈতন্যের ধর্ম জনতাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেক মুসলমানও ছিল।

১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের তিরোভাব হয়। বাঙলায় তখন চলছিল এক রাজনৈতিক বিশৃংখলা। ঠিক সেই সময় পর্তুগীজরা বাঙলা দেশে এসে উপস্থিত হয়। প্রায় একশ বছর ধরে চলে বাঙলার বুকে পর্তুগীজদের শোষণলীলা, অত্যাচার, ধর্মান্তরিতকরণ, লাম্পট্য, নারীধর্ষণ ও দস্যুতা। পর্তুগীজদের নামে সাধারণ বাঙালী সন্ত্রস্ত হয়—শুধু ধনবান ও ঐশ্বর্যশালী হয় বাঙালী বণিকের দল। সম্রাট আকবর যখন (১৫৮০ খ্রীস্টাব্দ) পর্তুগীজদের হুগলীতে একটা স্থায়ী নগর স্থাপন, গীর্জা নির্মাণ ও খ্রীস্টের সুসমাচার প্রচার করবার অনুমতি দেন, তখন তিনি নির্দেশ দেন যে, তার পরিবর্তে পর্তুগীজরা বাঙলাদেশকে লুণ্ঠন ও বর্বরোচিত অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ লোকদের ওপর পর্তুগীজদের অত্যাচার, জুলুম ও নিগ্রহ কমে নি। পর্তুগীজ দস্যুরা প্রায়ই বাঙলার দক্ষিণ উপকূলস্থ গ্রামগুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, গ্রামবাসীদের যথাসর্বস্ব লুঠ করত, এবং মেয়েদের ধর্ষণ করে তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিত। স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-মেয়ে সকলকে বন্দী করে

বলপূর্বক নৌকায় তুলে নিয়ে চালান দিত দূরদূরান্তরের দাসদাসীর হাটে বেচবার জন্য। দু'শ বছর পরে উইলসন সাহেব গঙ্গার মোহনায় সুন্দর সুন্দর দ্বীপ দেখে অনুমান করেছিলেন যে, এগুলি এক সময় সমৃদ্ধশালী ও জনবহুল গ্রাম ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, পর্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচারের ফলেই সেগুলো তাঁর সময় পরিত্যক্ত ও শূন্য অবস্থায় ছিল।

মেয়েদের ধর্ষণ করা ও জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করা বা রক্ষিতা হিসাবে রাখা পর্তুগীজদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এমন কি তারা সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে এক ফারমানও সংগ্রহ করেছিল যার বলে তারা বাঙালী মেয়েদের রক্ষিতা হিসাবে রাখবার অধিকার পেয়েছিল। বাঙালী মেয়েদের কমনীয়তা ও কৌতুকরসবোধই তাদের প্রতি পর্তুগীজদের আকৃষ্ট করেছিল। বোধ হয় অনেক ক্ষেত্রে পর্তুগীজদের প্রতি বাঙালী মেয়েদেরও অনুরাগ ছিল। এই অনুরাগ অত্যন্ত সজীবতার সঙ্গে চিত্রিত হয়ে রয়েছে কাঁচারাপাড়ার এক মন্দিরে পোড়ামাটির এক মৃৎফলকে। এই সকল বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে পর্তুগীজদের যৌনমিলনের ফসলই হচ্ছে ফিরিঙ্গি বা দো-আঁশলা জাতি।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (১৬২৮-৫৬ খ্রী.) বার্নিয়ার এদেশে এসেছিলেন। তিনি বলে গেছেন হুগলীতে তখন আট-নয় হাজার পর্তুগীজ বাস করত। সমগ্র বাঙলাদেশে পর্তুগীজদের সংখ্যা ছিল পঁচিশ হাজার। এদের প্রত্যেকেরই বহু ধর্মান্তরিত দাসদাসী ছিল। এদের জীবনযাত্রা-প্রণালী অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল।

নৃতত্ত্বের ছাত্র হিসাবে এখানে একটা কথা বলতে চাই। হুগলী জেলায় বহুলোকের চোখের রঙ নীল দেখা যায়। এদের ধমনীতে যে পর্তুগীজ রক্ত বিলাসময় ও আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হুগলী ও চব্বিশ পরগনা জেলায় বহু কৃষিভূমি পর্তুগীজদের অধিকারভুক্ত ছিল। এই সকল কৃষিভূমিতে তারা বিদেশীয় ফসলের চাষ করত। এই সকল বিদেশীয় ফসলের মধ্যে ছিল আলু, তামাক, বজরা, সাগু, কাজুবাদাম, আনারস, আতা, আমড়া, পেঁপে, পেয়ারা ও লেবু। গোড়ার দিকে নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ এগুলো গ্রহণ করে নি, কিন্তু পরে এগুলো বাঙালীর নিত্য খাদ্যে পরিণত হয়েছিল। তা ছাড়া, তামাক খাওয়ার প্রথাও বাঙালীরা পর্তুগীজদের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিল। জরদা, সুরতি, নস্য, গুণ্ডি ইত্যাদি তামাকেরই সহোদর

ভাই। পর্তুগীজগণ কর্তৃক আনীত তামাক থেকেই এগুলো উদ্ভূত।

কৃষি, বাণিজ্য ও যৌনমিলন যে বাঙালী সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল, তা বাংলাভাষার অন্তর্ভুক্ত পর্তুগীজ শব্দসমূহ থেকে প্রকাশ পায়। যে সকল পর্তুগীজ শব্দ বাঙলাভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে সেগুলো হচ্ছে আচার, আয়া, আলমিরা, আমরা, আনারস, আরক, বালতি, ভাঙ, বাট্টা, বুঞ্জল, বুটিক, কাজু, কামরা, কামিজ, চা, চাবি, কোকো, গুদাম, গীর্জা, ঝিলিমিলি, লস্কর, নিলাম, মিস্ত্রি, পাদ্রি, পালকি, পমফ্রেট, পেঁপে, পিওন, রসিদ, সাগু, বারাণ্ডা, কাবাব, আলকাতরা, আতা, বাসন, ভাপ, বজরা, বিসকুট, বয়া, বোতাম, বোতল, কেদারা, কাফি, কাফ্রি, কাকাতুয়া, কামান, ছাপ, কোচ, কম্পাস, খ্রীস্টান, ইসপাত, ইস্ত্রি, ফিতা, ফর্মা, গারদ, জোলাপ, জানালা, লানটার্ন, লেবু, মাস্তুল, মেজ, পেয়ারা, পিপা, পিরিচ, পিস্তল, পেরেক, রেস্ত, সাবান, তামাক, টোকা, তুফান, তোয়ালে, বরগা, বেহালা, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এসব জিনিসের ব্যবহার পর্তুগীজদের প্রভাবেই বাঙালী সমাজে প্রবেশ করেছে।

॥ আট ॥

পর্তুগীজদের পতনের ইতিহাসটা বলা দরকার। যতদিন সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রী.) ও তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৮ খ্রী.) বেঁচে ছিলেন, ততদিন পর্তুগীজরা মোগল দরবারের অনুগ্রহে পুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহানের (১৬২৮-১৬৫৮ খ্রী.) সঙ্গে পর্তুগীজদের বিরোধ ঘটে। শাহজাহান যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন তখন তিনি পর্তুগীজদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। পর্তুগীজরা তা দিতে অস্বীকার করেছিল। সেজন্য পর্তুগীজদের ওপর শাহজাহানের পুরানো রাগ ছিল। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে, তিনি তাঁর বন্ধু কাসিম খানকে বাঙলায় শাসনকর্তা নিযুক্ত করে, হুগলী থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করবার ছুতা অন্বেষণের জন্য নজর রাখতে বলেন। ছুতা পেতে দেরি হল না, তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে বিভিন্ন রকমের বিবরণ পাওয়া যায়। এক বিবরণ অনুযায়ী একজন পর্তুগীজ কাপ্তেন চট্টগ্রাম থেকে এক সুন্দরী মোগল যুবতীকে অপহরণ করেছিল। অপর কাহিনী অনুযায়ী তারা সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের দুই বাঁদীকে অপহরণ করেছিল, এবং সেই ছুতা অবলম্বন করে মোগলরা হুগলীতে পর্তুগীজদের অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করেছিল। অপর আর এক কাহিনী

অনুযায়ী কাসিম খান সম্রাট শাহজাহানকে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, 'হুগলীতে পতুর্গীজরা বাঙলা দখল করবার জন্য সুসজ্জিত হচ্ছে, এবং শুধু যে এ দেশবাসীর ওপর নানারকম জুলুম নির্যাতন করছে তা নয়, তারা বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিদেশের হাটে দাসদাসী হিসাবে বিক্রি করছে। এ ছাড়া, তাদের বসতির সামনে দিয়ে যত জাহাজ ও নৌকা যায়, তাদের কাছ থেকে জোর করে শুল্ক আদায় করছে।' যাই হোক, ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে তারা বাদশাহী মহলের ওপর হামলা করে। শীঘ্রই তারা মোগলদের কাছে পরাজিত হয়। ১,৫৬০ জন পতুর্গীজ যুদ্ধে নিহত হয়, ও ৩,০০০ পতুর্গীজ পালিয়ে গিয়ে সাগর দ্বীপে আশ্রয় নেয়। বহু পতুর্গীজকে বন্দী করে আগরায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের মধ্যে পুরুষদের দাস করা হয়, আর মেয়েদের উপভোগের জন্য হয় বাদশাহী হারেমে, নয়তো ওমরাহদের হারেমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু পতুর্গীজরা শীঘ্রই আবার সম্রাট শাহাজাহানের অনুগ্রহ লাভ করে, এবং ১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে ৭৭৭ বিঘা নিষ্কর জমি পায়। ওই জমি পেয়েই তারা ব্যাণ্ডেলে এক নতুন নগর প্রতিষ্ঠা করে, এবং সেখানে একটি গীর্জা নির্মাণ করে। এছাড়া, তারা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার অধিকার পায়। সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার এই যে, তারা যে ফারমান লাভ করে তাতে উল্লিখিত হয় যে যদি কোন পতুর্গীজ কোন বাঙালী মেয়েকে রক্ষিতা রাখে, তা হলে মোগল দরবার তাতে হস্তক্ষেপ করবে না। এই সকল অনুগ্রহ লাভের ফলে পতুর্গীজদের অধিকৃত অঞ্চলে ব্যাণ্ডেল-কনভেন্ট গড়ে ওঠে। কিন্তু ইংরেজ ও ওলন্দাজরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ানোর ফলে, তারা আর তাদের পূর্বশক্তি ফিরে পায় না।

ইংরেজরা যখন কলকাতা শহরের পত্তন করে, পতুর্গীজরা তখন চীনাবাজার অঞ্চলে বাস করত। পুরুষরা ইংরেজদের অধীনে হয় দোভাষী, আর তা নয়তো কেরানীর কাজ করত। আর মেয়েরা আয়া বা রক্ষিতার পেশা অবলম্বন করেছিল। ব্যাণ্ডেল তখন এই সকল মেয়েছেলে পাঠাবার আড়তে পরিণত হয়েছিল। সেখানে আর কোন পণ্যের ব্যবসা হত না।

জোব চার্নক যখন প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন, তখন কলকাতার জমিদার মজুমদারদের পর্তুগীজ বরকন্দাজ ছিল। ওঁদের অ্যান্টনি নামে এক পর্তুগীজ বরকন্দাজকে জোব চার্নক চাবুক মেরেছিলেন। অপমানিত হয়ে সে কাঁচরাপাড়ার কাছে এক গ্রামে গিয়ে বাস করে। তারই বংশধর অ্যান্টনি এক বিধবা বামুনের

মেয়েকে বিয়ে করে কবিওয়ালা হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এই অ্যান্টনীই কলকাতার বৌবাজারে ফিরিঙ্গি কালীর মন্দির স্থাপন করেন।)

১৫৩২ খ্রীস্টাব্দে হুগলী থেকে পর্তুগীজরা বিতাড়িত হবার পর, তাদের শূন্যস্থান এসে দখল করে ইংরেজরা। ইংরেজরা এদেশে এসেছিল পর্তুগীজদের অনেক পরে, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ওলন্দাজরা ঠিক ওই একই সময়ে এদেশে আসে। পরে এসেছিল দিনেমার ও ফরাসীরা। সকলেই এদেশে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজরাই জয়ী হয়।

হুগলী ছাড়া, ইংরেজরা কাশিমবাজার ও পাটনাতেও কুঠি স্থাপন করে। যুগটা ছিল ঘুষের যুগ। দিল্লীর বাদশাহকে দেওয়া হত উপঢৌকন, আর বাঙলার নবাবকে ইনাম। এই উপঢৌকন ও ইনাম দিয়ে ইংরেজরা নিজেদের বাণিজ্যের অনেক সুযোগ-সুবিধা করে নেয়। ইনাম পেয়ে পেয়ে নবাবের লোভ বেড়ে যায়। এর ফলে, নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ ঘটে। ইংরেজরা পাটনার কুঠির অধ্যক্ষ জোব চার্নককে কাশিমবাজারে ডেকে পাঠায়। ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে চার্নকের বিরুদ্ধে দেশীয় ব্যবসাদারগণ কর্তৃক আনীত এক মামলায় হুগলীর কাজী ইংরেজদের বিরুদ্ধে ৪৩,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার রায় দেন। চার্নক ওই টাকা দিতে অস্বীকার করেন। নবাবের সৈন্য কাশিমবাজার অবরোধ করে। কিন্তু চার্নক কৌশল অবলম্বন করে কাশিমবাজার থেকে পালিয়ে একেবারে হুগলীতে এসে হাজির হন। চার্নক দেখেন যে, ইংরেজকে যদি বাঙলায় কায়েমী ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপন করতে হয়, তা'হলে মাত্র ব্যবসায়ীর তুলাদণ্ড হাতে নিয়ে থাকলে চলবে না। তাদের অসিধারণ করতে হবে।

শীঘ্রই ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের বিরোধ ঘটে। ইংরেজদের নৌবহর ও সৈন্যসামন্ত হুগলীতে এসে হাজির হল। ইংরেজরা নবাবকে পরাজিত করে হুগলী তছনছ করে দিল। কিন্তু হুগলীতে থাকা ইংরেজরা আর নিরাপদ মনে করল না। সেজন্য চার্নক বেরুলেন ইংরেজদের এক শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমির সন্ধানে। ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চার্নক সুতানটি গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। এটাকেই তিনি ইংরেজদের শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলে মনে করলেন। এরপর হিজলিতে মোগলদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই হয়। চার্নক সেখানে যান। লড়াইয়ের শেষে চার্নক সুতানটিতে আবার ফিরে

আসেন। তারপর মাদ্রাজে যান। কিন্তু ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে ২৪ অগস্ট তারিখে আবার সুতানটিতে ফিরে আসেন এবং এখানেই ইংরেজদের শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করেন।

১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে ইংরেজরা মাত্র ষোল হাজার টাকায় কলিকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কিনে নেয়। এখানেই তাদের প্রথম দুর্গ ফোর্ট-উইলিয়াম নির্মাণ করে। এইভাবে ইংরেজ শাসনকালের ভাবী রাজধানী কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠিত হয়।

তারপর ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২২ জুন তারিখে ইংরেজরা ভাগীরথীর তীরে পলাশীর মাঠে নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করে। কিছুদিন পরে তারা বাঙলার দেওয়ানী পদও আদায় করে নেয়। তারপর চলে ইংরেজদের শাসন ও শোষণ-লীলা। কোম্পানির বিলাতের লোকেরা মোটা অঙ্কের মুনাফা পেলেই সন্তুষ্ট থাকত। আর এদিকে কোম্পানির কর্মচারীরা অসৎ উপায়ে হাজার হাজার টাকা উপায় করত। টাকা উপায়ের জন্য তারা চালাতে লাগল এদেশের লোকের ওপর অত্যাচার ও প্রতিহিংসা। একবার তাদের কোপে পড়লে কারুরই রেহাই ছিল না। বিচার বলে কোন বস্তুই ছিল না। নির্দোষ নন্দকুমারের ফাঁসিই তার প্রমাণ।

॥ নয় ॥

দেওয়ানী পাবার পর ইংরেজরা বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল বাঙলার শিল্পসমূহকে ধ্বংস করে এ দেশকে কাঁচামালের আড়তে পরিণত করতে। দেওয়ানী পাবার মাত্র চার বছর পরে ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই মার্চ তারিখে কোম্পানির বিলাতে অবস্থিত ডিরেকটররা এখানকার কাউনসিলকে আদেশ দিল—'বাঙলার রেশম-বয়ন শিল্পকে নিরুৎসাহ করে মাত্র রেশম তৈরির ব্যবসায়কে উৎসাহিত করা হোক।' শীঘ্রই অনুরূপ নীতি তুলাজাত বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা হল। ইংরেজ এখান থেকে কাঁচামাল কিনে বিলাতে পাঠাতে লাগল। আর সেই কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত দ্রব্য বাঙলায় এনে বেচতে লাগল। বাঙলা ক্রমশ গরীব হয়ে পড়ল। বাঙলার শিল্পসমূহ জাহান্নামে গেল। বাঙলা কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ল।

কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ায় বাঙলার জনগণের জীবন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়াল। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও বন্যা তো এখানে লেগেই আছে, সুতরাং যে বৎসর

ফল শস্য উৎপাদন হত না, সে বৎসর লোককে হয় অনশন, আর তা নয় তো দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে হত।

সেদিন ইংরেজ একদিকে যেমন বাঙলার গ্রামগুলিকে হীন ও দীন করে তুলেছিল, অপর দিকে তেমনই নগরে এবং তার আশেপাশে গড়ে তুলেছিল এক নতুন সমাজ। সে সমাজের অংগ ছিল দেওয়ান, বেনিয়ান, ব্যবসাদার, ঠিকাদার দালাল, মহাজন, দোকানদার, মুনসী, কেরানী প্রভৃতি শ্রেণী। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার সমাজজীবনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। শহরে গড়ে ওঠে এক নতুন সমাজ, যার নাম হয় মধ্যবিত্ত সমাজ। কলকাতা শহরই এই সমাজের কেন্দ্রমণি হয়ে দাঁড়ায়। শহরটা এই রূপান্তরিত সমাজের যাদুঘরে পরিণত হয়। এই সমাজের শীর্ষে আবির্ভূত হয় মুষ্টিমেয় ধনী, আর নীচের দিকে সাধারণ লোক—সাহেবরা যাদের বলত "ভদ্দর লোক"। এই সমাজের শীর্ষে বিলাসিতা ও জাঁকজমকে মত্ত হয়ে থাকল ধনীরা, আর সাধারণ লোক মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার ও শিক্ষাবিস্তারের সংগে সংগে শহরে শিক্ষিত শ্রেণী হয়ে দাঁড়াল। এই শিক্ষিত শ্রেণীই প্রতিবাদ জানাল সামাজিক বিকৃতি, ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধ মূঢ়তার বিরুদ্ধে। সহমরণ বন্ধ হয়ে গেল, বিধবাবিবাহ পেল আইনের স্বীকৃতি, সাগরমেলায় শিশুবলি দেওয়া রুদ্ধ হয়ে গেল, দাসদাসীর হাট উঠে গেল, ও নানারূপ সামাজিক সংস্কার ও উন্নতি-সাধনের ফলে সমাজ মুক্ত হল নানারূপ অপপ্রথা ও কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে। সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসমাজের 'পাতি' দেওয়ার অধিকার বন্ধ হয়ে গেল, এবং 'পাতি' দেওয়া বিধানসভার একচেটিয়া অধিকারে দাঁড়াল। নানান জাতের লোক বিধান-সভার সদস্য নির্বাচিত হল, এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসমাজকে তা মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হল। মোটকথা, ইংরেজ আমলে বাঙালী সমাজ আদ্যোপান্ত রূপান্তরিত হল।

বাঙলায় প্রথম ব্রহ্মহত্যা

১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৫ আগস্ট। কলকাতার ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন। ওই দিন ইংরেজগণ কর্তৃক কলকাতায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্রহ্মহত্যা। হিন্দুর দৃষ্টিতে ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ। পাছে ব্রহ্মহত্যার পাপ তাদের স্পর্শ করে, সেজন্য ৫ আগস্ট তারিখে প্রত্যুষেই কলকাতার লোকেরা শহর ছেড়ে গঙ্গার অপর পারে চলে গিয়েছিল।

যাকে নিয়ে এই ব্রহ্মহত্যা ঘটেছিল, তিনি হচ্ছেন মহারাজা নন্দকুমার রায়। সকলেরই জানা আছে যে ওয়ারেন হেস্টিংস ষড়যন্ত্র করে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে ব্যাপারটা বিশদভাবে অনেকেরই জানা নেই। সেটাই এখানে বলছি।

নন্দকুমারের পৈতৃক বাসস্থান ছিল বীরভূম জেলার ভদ্রপুর গ্রামে। পিতার নাম পদ্মনাভ রায়। তিনি ছিলেন মুরশিদকুলী খাঁর আমিন। নন্দকুমার ফারসী, সংস্কৃত, বাংলা ও পিতার রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজ শিখে আলিবর্দী খাঁর আমলে প্রথমে হিজলি ও মহিষাদল পরগনার রাজস্ব আদায়ের আমিন ও পরে হুগলীর ফৌজদারের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। পলাশী যুদ্ধের পর নন্দকুমার নানা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময় বর্ধমানের খাজনা আদায়ের কর্তৃত্ব নিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সঙ্গে তাঁর বিরোধের সূত্রপাত হয়। হেস্টিংস তখন কোম্পানির রেসিডেন্ট ছিলেন।

উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে পরে নন্দকুমার কলকাতায় আসেন। কলকাতায় তিনি একজন খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ান। তিনি প্রতিভাশালী ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁর নানা রকম গুণে মুগ্ধ হয়ে বাদশাহ শাহ আলম তাঁকে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। দেশের লোককে রেজা খাঁর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য দেশের লোকেরও তিনি প্রিয় হয়ে ছিলেন। তিনি কোনরূপ অত্যাচার সহ্য করতে পারতেন না, এবং সব সময় অত্যাচারিতের পক্ষ নিয়ে দণ্ডধারণ করতেন। তা ছাড়া, বীডন স্কোয়ারের নিকট তাঁর বাড়ি দ্বার সব সময়েই দরিদ্র দেশবাসীর জন্য উন্মুক্ত থাকত। প্রত্যহ এক বির জনতা তাঁর বাড়িতে ভোজন করত।

। দুই ।

এহেন নন্দকুমারের মত ব্যক্তির বিচার পৃথিবীর নবম আশ্চর্যরূপে পরিগণিত হয়েছিল। হেস্টিংস ও তাঁর কাউনসিলের সঙ্গে নন্দকুমারের বনিবনা ছিল না। তিনি হেস্টিংস-এর রোহিলা যুদ্ধ ও ফৈজাবাদের সন্ধির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। হেস্টিংস-এর সঙ্গে তাঁর বিরোধ চরমে ওঠে যখন ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানের রানী অভিযোগ করেন যে হেস্টিংস তাঁর কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছেন। ওই ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দেই নন্দকুমার অভিযোগ করেন যে, হেস্টিংস মুন্নি বেগমের কাছ থেকে ৩,৫৪,১০৫ টাকা ঘুষ নিয়ে তাঁকে নাবালক নবাবের অভিভাবক নিযুক্ত করেছেন। হেস্টিংস প্রত্যভিযোগ আনলেন যে, নন্দকুমার কমালউদ্দিন নামে (কমালউদ্দিন হেস্টিংস-এরই আশ্রিত লোক) এক ব্যক্তিকে প্ররোচিত করেছেন হেস্টিংস-এর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনবার জন্য। নন্দকুমার এ মামলায় সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হন। তখন হেস্টিংস কমালউদ্দিন ও মোহনপ্রসাদ নামক আর এক ব্যক্তি দ্বারা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক জালিয়াতির মামলা আনেন। এই মামলাতেই নন্দকুমারের ফাঁসি হয়।

মামলার বিষয়বস্তু ছিল একগাছা মোতির মালা ও কয়েকটি অন্যান্য অলঙ্কার। ১১৬৫ বঙ্গাব্দের (ইংরেজী ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের) আষাঢ় মাসে মহারাজা নন্দকুমার এই মোতির হার ও অলঙ্কারগুলি মুরশিদাবাদে বলাকীদাস নামে এক ব্যক্তির কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন বিক্রয়ের জন্য। মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের সময় মুরশিদাবাদে যে বিশৃঙ্খল অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, সে সময় বলাকীদাসের বাড়ি থেকে এগুলি লুণ্ঠিত হয়। ১১৭২ বঙ্গাব্দে (১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে) বলাকীদাস যখন কলকাতায় আসেন, নন্দকুমার তখন এগুলি তাঁর কাছ থেকে ফেরত চান। বলাকীদাস এগুলি ফেরত দিতে অসমর্থ হয়ে, নন্দকুমারের আনুকূল্যে একখানা দলিল তৈরি করে দেন। বলাকীদাস ওই দলিলে লিখে দেন যে, কোম্পানির ঢাকায় অবস্থিত খাজাঞ্চিখানায় তাঁর যে রোক টাকা আছে, তা ফেরত পেলে তিনি নন্দকুমারের ওই মোতির হার প্রভৃতির মূল্য বাবদ ৪৮,০২১ সিক্কা টাকা মূল হিসাবে এবং তার ওপর টাকায় চার আনা হিসাবে অতিরিক্ত ব্যাজ দেবে। এই দলিল সম্পাদনের চার বছর পরে ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে বলাকীদাসের মৃত্যু ঘটে। বলাকীদাস তাঁর মৃত্যুশয্যায় নন্দকুমারকে ডেকে বলেন—'আমি আমার স্ত্রী ও কন্যার ভার আপনার ওপর সমর্পণ করে যাচ্ছি। আমি আশা করি এতদিন আপনি আমার

প্রতি যেরূপ আচরণ করেছেন, আমার স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গেও সেরূপ আচর করবেন।' এর কিছুদিন পরে যখন বলাকীদাসের বিষয়সম্পত্তি ও দেনা পাওনার নিষ্পত্তি হয়, তখন নিষ্পত্তিকারীরা নন্দকুমারের প্রাপ্য টাকাও তাঁ দিয়ে দেন। তখন বলাকীদাসের উক্ত দলিল বাতিল করা অবস্থায় কলকাতা মেয়র আদালতের ফেজখানায় জমা পড়ে এবং সেখানা সেখানেই থেকে যায়।

হেস্টিংস নন্দকুমারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য, মেয়র আদালতে ফেজখানা থেকে ওই দলিলটা উদ্ধার করেন এবং ওরই ভিত্তিতে এক মামল রুজু ক'রে বলেন যে দলিলখানা জাল।

১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৬ মে তারিখে কলকাতাবাসীরা স্তম্ভিত হয়ে গেল যখ তারা শুনল যে নন্দকুমারের ন্যায় ব্যক্তির বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা আন হয়েছে, এবং তাঁকে সাধারণ কয়েদীদের রাখার জন্য নির্দিষ্ট জেলখানায় রাখ হয়েছে। সরকারের কাছে আরজি পেশ করা হল যে, নন্দকুমারের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে সাধারণ জেলখানায় রাখলে তাঁর ধর্ম নষ্ট হবে। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। হেস্টিংস-এর প্ররোচনায় বিচারকরা সকলে একমত হয়ে রায় দিলেন যে 'শেরিফ যেন নন্দকুমারকে সাধারণ জেলখানাতেই রাখে।'

৮ মে তারিখে নন্দকুমার প্রধান বিচারপতির কাছে এক আবেদন পত্রে বলেন যে, 'তাঁকে যদি সাধারণ জেলখানায় রাখা হয়, তা হলে তাঁকে জাতিচ্যুত হবার আশঙ্কায় আহার-স্নান প্রভৃতি পরিহার করতে হবে। সেজন্য তাঁকে এমন কোন বাড়িতে বন্দী করে রাখা হোক যা কোনদিন খ্রীশ্চান বা মুসলমান কর্তৃক কলুষিত হয়নি, এবং তাঁকে প্রতিদিন একবার করে গঙ্গায় স্নান করতে যেতে দেওয়া হোক।' কিন্তু বিচারকরা আবার একবাক্যে বললেন—'কয়েদী এরকম আব্দার কখনই মেনে নেওয়া যেতে পারে না।'

॥ তিন ॥

নন্দকুমার গোড়া থেকেই জেলখানায় আহার ত্যাগ করেছিলেন। সেজন্য ১০ মে তারিখে প্রধান বিচারপতি ইমপে (হেস্টিংস-এর প্রাণের বন্ধু) নন্দকুমারে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবার জন্য একজন চিকিৎসককে পাঠিয়ে দেন। চিকিৎসব মন্তব্য করলেন, 'অনশন হেতু নন্দকুমারের এরূপ শারীরিক অবনতি ঘটেছে যে পরদিন প্রাতের পূর্বেই নন্দকুমারকে খাওয়ান দরকার।' সেজন্য বিচারকর অনুমতি দিলেন যে, প্রতিদিন প্রাতে একবার করে তাঁকে যেন জেলখানা

বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু নন্দকুমার সে অনুমতি প্রত্যাখ্যান করেন। সেজন্য জেলখানার প্রাঙ্গণে একটা তাঁবু খাটিয়ে সেখানে নন্দকুমারের অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। নন্দকুমার সেখানে মিষ্টান্ন ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করতেন না।

বর্তমান রাইটার্স-বিলডিংস-এর পূর্ব দিকে এখন যেখানে সেন্ট এন্ড্রুজ গির্জা অবস্থিত, সেখানেই তখন সুপ্রিম কোর্ট ছিল। এখানেই ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৮ জুন তারিখে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচার শুরু হয়। যে বিচারকমণ্ডলী নন্দকুমারের বিচার করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইমপে, হাইড, চ্যাম্বারস্ ও লেমেস্টার। সরকারী পক্ষের উকিল ছিলেন ডারহাম, আর নন্দকুমারের পক্ষে ফাবার। এই মামলায় দশজন ইওরোপীয় ও দুজন ইওরেশিয়ান জুরি নিযুক্ত হয়। দোভাষী ছিলেন হেস্টিংস ও ইমপে র বন্ধু আলেকজান্ডার ইলিয়ট। তাঁর নাম প্রস্তাবিত হওয়া মাত্রই, ফারার আপত্তি তুলে বলেন যে, তাঁর মক্কেল একে তাঁর শত্রুপক্ষের লোক বলে মনে করেন। কিন্তু ফারারের এ আপত্তি নাকচ হয়ে যায়। তারপর ফারার বলেন যে, তাঁর মক্কেলকে কাঠগড়ায় না পুরে যেন তাঁর উকিলের কাছে বসতে দেওয়া হয়, এবং তাঁকে যেন হাতজোড় করে দাঁড়ানো থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু আদালত ফারারের এসব আবেদনও নাকচ করে দেয়।

তারপর আইনের লড়াই চলে। বিচারক চ্যাম্বারস্ মত প্রকাশ করেন যে বিলাতের আইন কলকাতায় চলতে পারে না। সুতরাং এ মামলা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের এলাকার বাইরে। কিন্তু প্রধান বিচারপতি (ইমপে) ও অন্য বিচারকরা এর বিপরীত মত প্রকাশ করেন। সুতরাং মামলা চলতে থাকে।

নন্দকুমারকে তখন সওয়াল করতে বলা হয়। নন্দকুমার আনুষ্ঠানিক-ভাবে নিজেকে 'নির্দোষ' বলে ঘোষণা করেন। তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কার দ্বারা আপনি আপনার বিচার হওয়া উচিৎ মনে করেন?' নন্দকুমার উত্তর দেন—'ঈশ্বর ও তাঁর সমতুল্য ব্যক্তি দ্বারা।' বিচারকরা নন্দকুমারকে জিজ্ঞাসা করেন—'কাকে আপনি সমতুল্য মনে করেন?' ফারার উত্তরে বলেন—'এটা তিনি আদালতের বিবেকের ওপর ছেড়ে দিতে চান।'

॥ চার ॥

সমস্ত বিচারটাই হল একটা প্রহসন মাত্র। মীর আসাদ আলি, শেখ ইয়ার

মহম্মদ ও কৃষ্ণজীবন দাস প্রভৃতি অনেকে নন্দকুমারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বললেন যে, তাঁরা স্বচক্ষে বলাকী দাসের ওই দলিল সম্পাদন হতে দেখেছেন। কিন্তু তা সত্বেও ১৮ জুন তারিখে আদালত জুরিদের প্রতি তাঁদের অভিমত প্রকাশ করতে বলে। তাঁরা সকলেই একবাক্যে বললেন—'নন্দকুমার দোষী, এবং তাঁর প্রতি কোনরূপ দয়া প্রদর্শন করবার সুপারিশ আমরা করতে পারি না।' আদালত নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিল (তখনকার বিলাতী আইন অনুযায়ী জালিয়াতি অপরাধে প্রাণদণ্ড হত)। শুধু তাই নয়। নন্দকুমারের সমর্থনে যারা সাক্ষী দিয়েছিল, তাদের অভিযুক্ত করবারও আদেশ দিল।

॥ পাঁচ ॥

কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে নন্দকুমারকে বাঁচাবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। কেন না, বিলাতে রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার আবেদনে জুরিদের অনুমোদন থাকা চাই। জুরিরা সে অনুমোদন দিলেন না।

১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৫ অগস্ট তারিখে খিদিরপুরের কাছে কুলিবাজারের ফাঁসিমঞ্চে নন্দকুমারকে তোলা হল। অত্যন্ত প্রশান্ত মুখে ইষ্টদেবতার নাম করতে করতে নন্দকুমার ফাঁসিমঞ্চে উঠলেন। ইংরেজ-বিচারের যূপকাষ্ঠে বলি হলেন বাঙলার একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সব শেষ হয়ে গেলে গঙ্গার অপর পারে সমবেত হিন্দু নরনারী 'বাপরে বাপ' বলে চীৎকার করে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের পাপক্ষালনের জন্য।

তিন ফিরিঙ্গি অ্যান্টনি

আমরা মাত্র একজন অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির কথাই জানি। তিনি হচ্ছেন কবিওয়ালা অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি। কিন্তু কলকাতার ইতিহাসে আরও দুজন অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি তাঁদের নামের ছাপ রেখে গেছেন। অ্যান্টনিরা ছিলেন পর্তুগীজ। অ্যান্টনি হচ্ছে এঁদের পদবী। এঁদের পদবীর আগে সকলেরই আলাদা আলাদা নাম ছিল। যেমন কবিওয়ালা অ্যান্টনির আসল নাম ছিল হেন্সম্যান।

কবিওয়ালা অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির পিতা ও পিতামহ দুজনেই ছিলেন কলকাতার বড় ব্যবসাদার। পিতা বাস করতেন চন্দননগরে, আর পিতামহ প্রথম কলকাতায়, পরে কাঁকিনাড়ায়। দু পুরুষ ব্যবসা করে এঁরা অনেক পয়সা উপার্জন করেছিলেন। সে সব টাকা-পয়সা দু ভাই ক্যালী অ্যান্টনি ও হেন্সম্যান অ্যান্টনি পান। ক্যালী তাঁর অর্ধেক অংশ নিয়ে পর্তুগালে চলে যান। আর হেন্সম্যান চন্দননগরে থেকে যান। জীবনটা ছিল তাঁর বিলাসময়। সৌদামিনী (মতান্তরে নিরুপমা) নামে এক বামুনের মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে, তাকে নিয়ে তিনি বাস করতে থাকেন চন্দননগরে গোঁদলপাড়ার কাছে ঘেরেটির বাগানবাড়িতে। ব্রাহ্মণীর ছিল বার মাসে তের পার্বণের ঘটা। এন্টনি জীবনসঙ্গিনীর এ সব আশা মেটাতেন। তা ছাড়া, ওই বামুনের মেয়ের সহবাসে থেকে তিনি বাঙালীর আহারই করতেন, এবং ধুতি-চাদর পরতেন। ভাল বাংলাও তিনি শিখেছিলেন। নিজের বাড়িতে তিনি যাত্রা ও কবির গানের আসর বসাতেন। বিলাসিতা করে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। তখন তিনি নিজেই একটা কবির দল তৈরি করবার মতলব করেন। ব্রাহ্মণী তো হেসেই খুন, সাহেব করবে কবির দল? কিন্তু গোরক্ষনাথ যোগী নামে একজনকে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে বাঁধনদার নিযুক্ত করে তিনি এক কবির দলের পত্তন করেন। তখন থেকে অ্যান্টনি 'কবিওয়ালা অ্যান্টনি' নামে পরিচিত হন।

কবির আসরে অ্যান্টনি লড়তেন সেযুগের বড় বড় কবিওয়ালাদের সঙ্গে। যেমন ভোলা ময়রা, রাম বসু, রামসুন্দর স্বর্ণকার, ঠাকুরদাস সিংহ প্রভৃতি। ভোলা ময়রা ছিলেন, সেযুগের বড় কবিওয়ালা। বাগবাজারে তাঁর ময়রার দোকান ছিল। অবসর বিনোদনের জন্য তিনি তৈরি করেছিলেন এক কবির দল।

সেযুগের কবির লড়াইয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, প্রতিপক্ষ যখন অপর পক্ষের

সংগে পেরে উঠতেন না তখন গানের মাধ্যমে খিস্তি-খেউড় ও 'শালা' ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করতেন। এছাড়া আদিরসাত্মক ও অশ্লীল শ্লেষপূর্ণ উক্তি তাদের গানের মধ্যে থাকতই। সেযুগের লোক খুব আমোদের সংগে এগুলো উপভোগ করত। সেযুগের কবিওয়ালাদের অশ্লীল গান আমার বহু জানা আছে, তবে সেগুলো এখনকার শিষ্টসমাজে পরিবেশনযোগ্য নয়।

সেদিক থেকে অ্যান্টনি ছিলেন অত্যন্ত সংযত ও শিষ্টরুচিসম্পন্ন কবি। একবার ঠাকুরদাস সিংহ এক বড়লোকের বাড়িতে অনুষ্ঠিত কবির লড়াইয়ে অ্যান্টনিকে আক্রমণ করে প্রশ্ন করলেন—'বল হে অ্যান্টনি, আমি একটি কথা জানতে চাই/এসে এদেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই।' এরূপ প্রশ্নে অ্যান্টনি বিন্দুমাত্র হতচকিত হলেন না। সংগে সংগে উত্তর দিলেন—'এই বাংলায় বাঙালীর বেশে আনন্দে আছি। হয়ে ঠাকরে সিংহের বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি।' এরূপ ক্ষেত্রে ভোলা ময়রা 'বোনাই' শব্দ ব্যবহার করতেন। কিন্তু অ্যান্টনি তাঁর প্রখর বুদ্ধি, রসিকতা ও ব্যংগের সংগে প্রতিপক্ষকে এক স্মরণীয় উত্তর দিলেন। অ্যান্টনি কোন গানে কখনও কোন ধর্মের প্রতি কটাক্ষ করতেন না। তিনি কালীভক্ত ছিলেন, এবং বউবাজারের ফিরিংগি কালী তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একবার ভোলা ময়রার সংগে দ্বন্দ্বে তিনি শিবজায়াকে স্মরণ করে গাইলেন—'আমি ভজনসাধন জানিনে মা, নিজে তো ফিরিংগি/ যদি দয়া করে কৃপা কর, হে শিব মাতংগী।' ভোলা ময়রা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অশিষ্টভাষায় উত্তর দিলেন—'তুই জাত ফিরিংগি জবরজংগী, পারবে না মা তরাতে / যীশুখ্রীস্ট ভজগে বেটা শ্রীরামপুরের গীর্জাতে।'

এছাড়া, অ্যান্টনির ছিল অদ্ভুত উদারতা। একবার এক গানের আসরে ভোলা ময়রার সংগে তাঁর বহুক্ষণ লড়াইয়ের পরও যখন কেউ কারুকে হারাতে পারল না, অ্যান্টনি তখন নিজের গলা থেকে মালাগাছাটা খুলে ভোলা ময়রার গলায় পরিয়ে দিলেন। ভোলা ময়রা তাঁর নিজস্ব ভাষায় উত্তর দিলেন—'ওরে শালা / কি জ্বালা, এ মালা দিল রে আমায় / মনে কি হয় না উদয় / ভোলা কভু ভোলবার নয়।'

অ্যান্টনি ১২৪৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

। দুই ।

এবার তাঁর পিতামহ অ্যান্টনির কথা বলি। তিনি জোব চার্নকের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। লবণের ব্যবসায়ে প্রভূত পয়সা উপার্জন করেছিলেন। তাঁর গদিবাড়ি ও তৎসংলগ্ন বাগান ছিল কলকাতার বর্তমান দপ্তরীপাড়ায়। ওই অঞ্চলে অ্যান্টনীবাগান লেনটা ওঁরই নামে অভিহিত। ব্যবসা ছাড়া, তিনি কলকাতার তৎকালীন জমিদার মজুমদারদের বাড়িতে বিষয়কর্ম দেখাশোনাও করতেন। এখানে একটু চিত্তবিক্ষেপের প্রয়োজন আছে। পর্তুগীজরা প্রথম বাঙলাদেশে আসে ষোড়শ শতাব্দীতে সুলতান হুসেন শাহের সময়। তাদের মূল ঘাঁটি ছিল ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত গোয়াতে। যে সকল দুর্বৃত্ত গোয়া থেকে বিতাড়িত হত তারা পর্তুগীজ বণিকদের পিছনে পিছনে এসে আশ্রয় নিত আরাকান ও চট্টগ্রামে। দস্যুতাই ছিল তাদের প্রধান পেশা। তবে অনেকে নাম লিখিয়েছিল বারভুঁইয়া জমিদারদের বরকন্দাজ হিসাবে। মোগলদের বিরুদ্ধে বারভুঁইয়াদের বিদ্রোহ দমিত হবার পর, মানসিংহ বাঙলার সুবেদার নিযুক্ত হন। বিদ্রোহ দমনের সময় তিনি যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন, তাদের তিনি নতুন জমিদারী দিয়ে পুরস্কৃত করেন। যারা নতুন জমিদারী পেয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল ভবানন্দ মজুমদার ও লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার। লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের বংশধররাই ছিলেন কলকাতার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীরা। বড়শে-বেহালায় তাঁদের বসতি ছিল, কিন্তু কলকাতায় তাঁদের একটা কাছারিবাড়ি ছিল। জোব চার্নক যখন কলকাতায় আসেন, তখন মজুমদারদের কাছারিবাড়ির একটা অংশ ভাড়া নিয়েছিলেন কোম্পানির শেরেস্তা স্থাপনের জন্য।

মজুমদাররা জমিদার হলে, হবে কি? তাঁদের চেয়ে অনেক ধনী লোক ছিল শেঠ-বসাকরা। সরস্বতী নদী শুকিয়ে যাবার পর তাঁরা শিবপুরের কাছে বেতোরে পর্তুগীজদের সংগে ব্যবসা করবার জন্য বেতোরের অপর পারে বনজংগল কেটে একটা গ্রাম পত্তন করেন। তাঁদের গৃহদেবতা গোবিন্দজীর নামে এই গ্রামের নাম হয় গোবিন্দপুর। অনেকে মনে করেন গোবিন্দ দত্তের নাম অনুযায়ী এর নাম গোবিন্দপুর হয়েছিল। সেটা ঠিক নয়। কেননা, গোবিন্দ দত্ত এখানে আসবার অনেক আগে থেকেই এর নাম গোবিন্দপুর ছিল। গোবিন্দপুরের একক্রোশ উত্তরে হাটতলায় তাঁরা সুতার লুটির কেনাবেচা করতেন। এ জন্যই জায়গাটার নাম হয় 'সুতানুটি' ও হাটতলার নাম হয়

'হাটখোলা'। শেঠদের প্রথম যিনি এসেছিলেন তাঁর নাম ছিল মুকুন্দরাম। মুকুন্দরামের ছেলে লালমোহন বিদেশী বণিকদের কাছে একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী বলে পরিচিত ছিলেন। তিনিই লালদীঘি খনন করান ও ওর মাটিতে ইঁট তৈরি করে লালদীঘির পশ্চিমে একটা ভদ্রাসন নির্মাণ করেন। লালমোহন একটা বাজারও স্থাপন করেছিলেন। সেটাই লালবাজার নামে খ্যাত।

শেঠেরা খুব জাঁকজমক করে লালদীঘিতে দোলযাত্রা করত। লালদীঘির উত্তর-দক্ষিণে দুটো দোলমঞ্চ স্থাপন করা হত। দক্ষিণের দোলমঞ্চে স্থাপন করা হত গোবিন্দজীউকে, আর উত্তরের দোলমঞ্চে রাধারানীকে। আবির বিক্রির জন্য এখানে একটা বাজার বসত। সেটা পরবর্তীকালের রাধাবাজার।

মজুমদাররাও তাঁদের কাছারিবাড়িতে তাঁদের গৃহদেবতা শ্যামরায়ের দোলযাত্রা উৎসব করতেন। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকের ঘটনা। দোল-যাত্রার সময় কোম্পানির কয়েকজন কর্মচারী মজুমদারদের দোল-বাটির মধ্যে উৎসব দেখবার জন্য প্রবেশের চেষ্টা করে। কবিওয়ালা অ্যান্টনির পিতামহ ছিলেন মজুমদারদের একজন প্রধান কর্মচারী। তিনি ইংরেজ কর্মচারীদের বাধা দেন। এর ফলে একটা সংঘর্ষ হয়। খবর চলে যায় চার্নকের কাছে। চার্নক সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন। হাতে ছিল তাঁর ঘোড়ার চাবুক। ওই চাবুক দিয়ে তিনি অ্যান্টনিকে প্রহার করেন। অ্যান্টনি এ অপমান সহ্য করতে না পেরে, কাঁচরাপাড়ায় গিয়ে বাস করেন।

॥ তিন ॥

তৃতীয় অ্যান্টনিকে আমরা পাই কলকাতার কুমোরটুলিতে। অদ্ভুত ছিল তাঁর শিল্পপ্রতিভা। প্রতিমা নির্মাণ করতে পারতেন তিনি অসাধারণ।

তখনকার দিনে ভাল ভাল প্রতিমা তৈরি করা হত কলকাতার অভিজাত পরিবার সমূহের জন্য—যেমন রানী রাসমণি, শোভাবাজারের রাজবাটি (একাধিক), জোড়াসাঁকোর রাজবাটি ইত্যাদি। বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত প্রতিমা এনে হাজির করা হত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার মহাশয়ের বর্তমান আবাসবাটির কিছু দক্ষিণে। রঙমশালের আলোতে সমস্ত প্রতিমা ঝলমল করত। ওখানে বিচার করা হত, সে বছরের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা কোনখানা। যেখানা বিচারে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হত, সেখানা

যে বাড়ির, তাদের বুক ফুলে দশ হাত হত। আর যে কুমোর সেখানা তৈরি করত সে পেত পুরস্কার।

একবার এক রাজবাড়ি থেকে ডাক পড়ল অ্যান্টনি সাহেবের। রাজা তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন—'এমন একখানা ঠাকুর তৈরি করে দিতে হবে, যেখানা সে বছরের শ্রেষ্ঠ প্রতিমা বলে স্বীকৃত হবে।' মন প্রাণ দিয়ে ঠাকুর গড়লেন অ্যান্টনি সাহেব। ঠাকুর গড়া শেষ হয়ে গেলে তিনি শোলার (ডাকের) সাজের ওপর জার্মানি থেকে আমদানিকৃত পিতলের কাজকরা লতাপাতা, ফুল ইত্যাদি দিয়ে সাজালেন প্রতিমাখানাকে। সে বৎসর বিচারে অ্যান্টনি সাহেবের প্রতিমাই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হল। উৎফুল্ল হয়ে রাজা বাহাদুর নিজের গলা থেকে মুক্তা বসানো হারটা খুলে অ্যান্টনি সাহেবের গলায় পরিয়ে দিলেন। রাজার জয়জয়কার হল, আর শিল্পী পেলেন তাঁর যোগ্য পুরস্কার। তিন ফিরিংগি অ্যান্টনির কথা এখানেই শেষ হল।

কলকাতার ব্যবসায় বাঙালীর ভূমিকা

ইংরেজরা যখন প্রথম কলকাতায় এসে বসতি স্থাপন করল, তখন শেঠ-বসাকদের সংগেই তাদের ব্যবসা চলত। শেঠ-বসাকরা তন্তুবায় সমাজভুক্ত লোক ছিল। কিন্তু শীঘ্রই অন্য জাতির লোকদের সংগেও ইংরেজরা ব্যবসা শুরু করে। বনমালী সরকার ইংরেজদের ডেপুটি ট্রেডার নিযুক্ত হন। বনমালী সরকার ছিলেন সদগোপকুলোদ্ভূত। শেঠ-বসাকরা এটা খুব ভাল চক্ষে দেখেনি। তাদের মনোভাব তারা প্রকাশ করে ফেলল ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে। ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা চারজন ভিন্নজাতির লোককে দাদন দেয়। ইংরেজদের সমসাময়িক 'কনসালটেশনস্ বুক' অনুযায়ী এ চারজনের নাম হচ্ছে ফিল্লিকচাঁদ, গোসারেন, ওক্কোর ও ওত্তিরাম। মনে হয় এ চারটে নাম হচ্ছে ফটিক চাঁদ, গোঁসাই, অক্রুর ও আত্মারাম শব্দসমূহের বিকৃত রূপ। তাদের কৌলিক পরিচয় সম্বন্ধে অবশ্য ইতিহাস নীরব। কিন্তু শেঠ-বসাকদের আপত্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে তারা ভিন্নজাতের লোক ছিল। সেখানেই ছিল শেঠ-বসাকদের আপত্তি। তারা তাদের আপত্তিতে জানিয়েছিল যে, ইংরেজরা যদি ভিন্নজাতের লোককে দাদন দেয়, তাহলে তারা আর কোম্পানির কাছ থেকে দাদন নেবে না। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কলকাতায় ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে, বাঙালীরা তাদের জাতি-গত বৃত্তি হারিয়ে ফেলছিল, কেননা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই আমরা তন্তুবায় জাতিভুক্ত বৈষ্ণবচরণ শেঠ ছাড়া, কায়স্থ বংশোদ্ভুত গোকুল মিত্র ও মদন মোহন দত্ত, গোবর্ধন রক্ষিত ও গৌরী সেন ও রামদুলাল সরকারের নাম শুনি। বৈষ্ণবচরণ বড়বাজারের বাসিন্দা ছিলেন এবং বড়বাজারেই তাঁর ব্যবসা ছিল। গৌরী সেন তাঁর ব্যবসার অংশীদার ছিলেন। একবার বৈষ্ণবচরণ, গৌরী সেনের নামে কিছু দস্তা কেনেন। কিন্তু এই দস্তার সাথে বেশ কিছু পরিমাণ রূপা মিশ্রিত ছিল। বৈষ্ণবচরণ অত্যন্ত সৎ ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি দস্তা রূপায় রূপান্তরের ব্যাপারটা গৌরী সেনের অদৃষ্টের সুপ্রসন্নতা বলে মনে করেন এবং এ থেকে অর্জিত সমুদায় লাভ গৌরী সেনকে দেন। এর ফলে গৌরী সেন রাতারাতি খুব বড়লোক হয়ে যান। তিনি তাঁর অর্থ মুক্তহস্তে আদালতে অভিযুক্ত আসামীদের জরিমানা প্রদানের কাজে ব্যয় করতেন। তা থেকেই বাঙলাদেশে প্রবচনের সৃষ্টি হয়েছে, 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।' আর

একবার বৈষ্ণবচরণ গোবর্ধন রক্ষিত (তাম্বলী জাতিভুক্ত) নামে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে ৩০,০০০ মন চিনি সরবরাহের চুক্তি করেন। চিনি যখন বড়বাজারের কদমতলার ঘাটে এসে পেঁছায়, তখন বৈষ্ণবচরণের কর্মচারীরা গোবর্ধনের কাছ থেকে উৎকোচ না পেয়ে, সমুদায় চিনিই নিম্নমানের বলে ঘোষণা করে। সেজন্য বৈষ্ণবচরণ গোবর্ধনকে ওই চিনির মূল্য হ্রাস করতে বলেন। গোবর্ধন বৈষ্ণবচরণের কর্মচারীদের এই অসৎ আচরণে আত্মসমর্পণ করে নিজ কপালে অসৎ ব্যবসায়ীর কলঙ্ক চিহ্ন বহন করতে অসম্মত হন ও নিজ কর্মচারীদের আদেশ দেন যে সমস্ত চিনি ভাগীরথীর জলে নিক্ষেপ করে দাও। এই আদেশ যখন আংশিকভাবে কার্যকর হল, তখন ঘটনাটার সমস্ত বিবরণ বৈষ্ণবচরণের কানে যায়। সৎ ব্যবসায়ী হিসাবে বৈষ্ণবচরণ এটা বরদাস্ত করতে পারলেন না। তিনি অবশিষ্ট চিনি গ্রহণ করে, সমুদায় ৩০,০০০ মণ চিনির দাম গোবর্ধনকে দিয়ে দেন।

সে যুগে বাঙালী ব্যবসায়ীদের এরূপই সততা ছিল। অপর উদাহরণ আমরা দেখি মদনমোহন দত্তের আচরণে। এই মদনমোহন দত্তের আলয়েই আশ্রয় পেয়েছিলেন রামদুলাল দে-র দুঃস্থা বিধবা দিদিমা। পরে মদনমোহন রামদুলালকে নিজ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে সরকারের কর্ম দেন। মদনমোহনের হয়ে রামদুলাল একবার এক নীলামে ডাক দিতে যান। কিন্তু তিনি সেখানে পেঁছাবার পূর্বেই নীলামের ডাক শেষ হয়ে যাওয়ায়, তিনি চোখের সামনে এক ডুবন্ত জাহাজের ডাক হচ্ছে দেখতে পান। তিনি ওই ডুবন্ত জাহাজটা কিনে নিয়ে, এক লক্ষ টাকা লাভ করেন ও ওই টাকা এনে মনিবের হাতে দেন। কর্মচারীর এই সততায় মুগ্ধ হয়ে, মদনমোহন ওই এক লক্ষ টাকা রামদুলালকে দান করেন। সেই টাকাটা পেয়ে রামদুলাল ব্যবসা শুরু করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রধানত তাঁর মাধ্যমেই আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বহির্বাণিজ্যের যোগাযোগ ঘটে। চীনদেশের সঙ্গেও তাঁর বাণিজ্য সংযোগ ছিল। বস্তুতঃ চীন থেকে ইংলন্ড-আমেরিকা পর্যন্ত বণিকমহলে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

। দুই ।

বৈষ্ণবচরণ ছিলেন তন্তুবায় গোষ্ঠীর লোক। দুর্গাচরণ ছিলেন তাম্বুলী। গৌরী সেন ছিলেন সুবর্ণবণিক-সম্প্রদায়ভুক্ত। আর গোকুল মিত্র, মদন

দত্ত ও রামদুলাল ছিলেন কায়স্থ। ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ীর সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাৎ হয়। বস্তুতঃ বাঙলার জাতিসমূহের বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি ঘটেছিল। যে ব্রাহ্মণ বণিকের কথা বলছিলাম, তিনি হচ্ছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। পাথুরিয়াঘাটার হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে দ্বারকানাথের জন্ম। পিতার নাম রামমণি ঠাকুর, কিন্তু তিনি ছিলেন জ্যেষ্টতাত রামলোচনের দত্তক পুত্র। তিনি ইংরেজী ও ফারসী ভাষা ও ব্যবহারশাস্ত্র আয়ত্ত করেন। তাঁর ভাষা ও আইন জ্ঞানের জন্য ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে ২৪-পরগনার নিমকমহলের কালেকটর-দেওয়ান নিযুক্ত করে। পরে তিনি শুল্ক, লবণ ও আহিফেন বোর্ডের দেওয়ানের পদও লাভ করেন। দেওয়ানের পদে নিযুক্ত থাকা কালে তিনি স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। তিনি কলকাতার তৎকালীন প্রসিদ্ধ ইংরেজী ফার্ম ম্যাকিনটশ অ্যান্ড কোম্পানির অন্যতম শেয়ারহোল্ডার ও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ছিলেন। তারপর রাজকৃষ্ণ দত্তের জালিয়াতির দরুণ ব্যবসা-মহলে যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তাতে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের জানুআরি মাসে ম্যাকিনটশ অ্যান্ড কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যায়। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে তৎকালীন ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের অনুপ্রেরণায় তিনি 'কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানির' নামে ভারতে প্রথম ইঙ্গ-ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের চারজন অংশীদার ছিল—দ্বারকানাথ ঠাকুর, ডবলিউ. কার, ডবলিউ. প্রিনসেপ ও ডি. এম. গর্ডন। দ্বারকানাথ তৎকালীন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর ও হোপ রিভার ইনসিওরেন্স কোম্পানি, অ্যালায়েন্স ইনসিওরেন্স কোম্পানিরও অংশীদার ছিলেন। ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানিরও তিনি প্রবর্তক ছিলেন। বিদেশী কর্তৃক শোষিত হয়ে দেশের ধনাদি যাতে না বাইরে নিস্কাষিত হয় এবং ভারতবাসীরা যাতে সম্পূর্ণভাবে কৃষি-নির্ভর না হয়ে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তারই দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য দ্বারকানাথ 'কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি' স্থাপিত করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি নীল ও রেশম রপ্তানি, কয়লা খনি ক্রয়, জাহাজী ব্যবসা পত্তন ও চিনির কল স্থাপন করেছিলেন। ইংরেজের সঙ্গে যুগ্ম মালিকানায় বিলাতী কেতায় ব্যবসা করে তিনি তাঁর সময়ের একজন বিখ্যাত ধনী শিল্পপতি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আলেকজান্ডার অ্যান্ড কোম্পানি দেউলিয়া হবার পর, তিনি তাদের কাছ থেকে চিনাকুরির কয়লাখনি কিনে নিয়ে পরে তাকে 'বেঙ্গল কোল কোম্পানি'তে রূপান্তরিত

করেছিলেন। এ দেশে চিনি উৎপাদনে বাষ্পীয় যন্ত্র ব্যবহারের তিনিই প্রবর্তক। জাহাজী ব্যবসায় শুরু করে বহু মালবাহী জাহাজ ও 'দ্বারকানাথ' নামে যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করেন। তাঁর উদ্যোগের একমাত্র দুর্বলতা ছিল যে তিনি বহু ব্যাপারে একসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি মারা যান এবং তার দু'বৎসর পরে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক যখন বিপাকে পড়ে, তখন 'কার-টেগোর কোম্পানি'র পক্ষে সর্বদিক সামলানো খুব দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়ে। ফলে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে 'কার-টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি' উঠে যায়।

॥ তিন ॥

দ্বারকানাথের সমসাময়িক কালে আর একজন বাঙালী সামান্য অবস্থা থেকে ধনশীল ব্যবসাপতি হয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন কলুটোলার চৈতন্যলাল শীলের ছেলে মতিলাল শীল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক বিভাগে কিছুদিন ঠিকাদারী কাজ করবার পর, তিনি শিশি বোতল ও ছিপির ব্যবসা শুরু করেন। এর মধ্যে কিছুদিন বালি খালের কাস্টমস্ দারোগার কাজও করেছিলেন। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানে মুৎসুদ্দির কাজ করবার পর তিনি অসওয়ালড শীল অ্যান্ড কোম্পানির বেনিয়ান হন। দ্বারকানাথের মত তিনিও ইংরেজের শোষক চরিত্রের স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন। জাহাজী শিল্পে আত্মনিয়োগ করে বিদেশীদের সঙ্গে তিনি প্রতিযোগিতা করেন। আন্তর্জাতিক জাহাজী ব্যবসায়ে তিনিই প্রথম বাষ্পীয় পোত ব্যবহার করেন। দ্বারকানাথের ন্যায় তিনিও প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন ও বহু জনহিতকর কাজে অর্থ ব্যয় করে গেছেন। এ সময় ইংরেজের সঙ্গে যুগ্ম মালিকানায় আর যাঁরা ব্যবসা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সেকালের বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ। তিনিও মতিলাল শীলের মত সামান্য অবস্থা থেকে বড় হয়েছিলেন। সামান্য বেতনে জোসেফ নামে এক ভদ্রলোকের অফিসে চাকরি নিয়ে তিনি তাঁর জীবন শুরু করেন। জোসেফ যখন কেলসন নামে অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে নতুন ব্যবসা শুরু করেন, রামগোপাল তখন এই নতুন কারবারে মুৎসুদ্দি হন। পরে জোসেফের সঙ্গে কেলসনের বিচ্ছেদ ঘটলে, রামগোপাল কেলসন ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানি নামে ব্যবসা স্থাপন করে স্বাধীন

ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি প্রভূত ধনশালী হয়ে ওঠেন। পরে কেলসনের সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটায় তিনি নিজেই আর. জি. ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানি নামে এক সওদাগরী কারবার স্থাপন করেন। এসব ঘটনা ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ঘটেছিল। শেষোক্ত তাঁর নিজ সওদাগরী কারবার থেকেও তাঁর প্রভূত অর্থাগম হয়েছিল। এ সময় আর যে-সব বাঙালী ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ বসুমল্লিক, দ্বারিকানাথ গুপ্ত, পিতাম্বর মুখোপাধ্যায়, জয়গোপাল মল্লিক, রামকিনু সরকার, জয়নারায়ণ সাঁতরা, কালিকুমার কুণ্ডু, তারকনাথ প্রামাণিক, রাধামোহন প্রামাণিক, রাখালদাস প্রামাণিক প্রভৃতি। ইংরেজের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এবং তিনি বহু কোম্পানির অংশীদার ছিলেন। রাধামাধব বসুমল্লিক ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে 'উইলিয়াম ওয়ালেস' নামে এক বাষ্পীয় জাহাজ কিনে জাহাজী ব্যবসা শুরু করেন। পরে তিনি এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে সালকিয়ায় হুগলী ডকইয়ার্ড স্থাপন করেন। দ্বারিকানাথ গুপ্ত নেটিভ ডাক্তার হিসাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মেডিকেল অফিসার ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ডি. গুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি নামে এক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বিলাতী ঔষধ আমদানি করা শুরু করেন। পিতাম্বর মুখোপাধ্যায়, জয়গোপাল মল্লিক, রামকিনু সরকার, জয়নারায়ণ সাঁতরা, কালিকুমার কুণ্ডু, তারকনাথ প্রামাণিক, রাধামোহন প্রামাণিক, রাখালদাস প্রামাণিক—এঁরা সকলেই ইংরেজের সঙ্গে যুক্ত মালিকানায় ডকের কারবার শুরু করেন

। চার ।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে দ্বারকানাথ ঠাকুরের কারবারের যখন পতন ঘটল, সে-সময় থেকে অন্যান্য বাঙালী প্রতিষ্ঠানসমূহও একই দশাপ্রাপ্ত হল। এর প্রথম কারণ ছিল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া। আর দ্বিতীয়, বাঙলার ব্যবসায়ে অবাঙালী ব্যাবসায়ীদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ। এরপর যে-সকল বাঙালী প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল, তাদের কথাই বলি। মাত্র দু'চারটে ছাড়া পরবর্তীকালের বাঙালী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহ দোকান বা আড়তদারী কারবার ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে ২৪-পরগনার ধান্যকুড়িয়ার পতিতপাবন সাউ ও গোবিন্দচন্দ্র গুঁইয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় স্থাপিত হল ঘি,

ময়দা, গুড়, পাট ইত্যাদির ব্যবসা। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে পতিতপাবন তাঁর ভগ্নিপতি শ্যামাচরণ বল্লভকে তাঁর প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করে নেন। পরে বল্লভরা শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর সামনে ঔষধের কারবার করেছিলেন, কিন্তু এখন তা উঠে গেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নের পূর্বেই কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল প্রাণকৃষ্ণ লাহার সওদাগরী অফিস। ইনিও জীবন আরম্ভ করেছিলেন খুব সামান্যভাবে। কাজ করতেন চুঁচুড়ার এন্ড্রুস সাহেবের বইয়ের দোকানে। এন্ড্রুস সাহেবের বইয়ের দোকান উঠে যাবার পর এদিক-ওদিক কয়েক জায়গায় কেরানীর কাজ করবার পর তিনি কলকাতায় কোম্পানির কাগজ কেনাবেচা ও আফিম ও লবণের ব্যবসা করে প্রভুত অর্থ উপার্জন করেন। এইসময় মতিলাল শীলের আনুকূল্যে তিনি সন্ডার কোম্পানি ও আরও কয়েকটি সওদাগরী অফিসের মুৎসুদ্দি হন। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিজস্ব সওদাগরী অফিস স্থাপন করে দেশ-বিদেশে বিখ্যাত সওদাগর বলে পরিচিত হন। তাঁর ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এখনও জীবিত আছে।

প্রসাদদাস বড়ালও কলকাতায় কোম্পানির কাগজের ও সোনারূপার ব্যবসা করে বিখ্যাত হন। এঁদের প্রতিষ্ঠান এখনও জীবিত।

এ সময় চন্দননগরের দুর্গাচরণ রক্ষিত কলকাতায় এসে দুর্গাচরণ রক্ষিত অ্যান্ড কোম্পানি নামে এক সওদাগরী অফিস স্থাপন করে অস্ট্রেলিয়ার সহিত বাণিজ্য করে প্রভুত অর্থ উপার্জন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আর যে-সব বাঙালী কলকাতায় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে জবাকুসুম তৈল প্রস্তুতকারক সি. কে. সেন, বিখ্যাত ঔষধ-ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণ পাল, দর্জিপাড়া কেমিকেল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা পি. এম. বাগচী, কে. বি. সেন অ্যান্ড কোম্পানি, বিলাতী কাগজ আমদানিকারক চন্দ্রমোহন সুর, পিয়ারীচরণ সুর ও পান্নালাল শীল, জরীপ-যন্ত্র আমদানিকারক যজ্ঞেশ্বর সুর (জে. সুর অ্যান্ড কোম্পানি), স্টেশনারী দ্রব্যের আমদানিকারক নীলমণি হালদার, বন্দুক ও টোটা আমদানিকারক কালীকুমার বিশ্বাস ও দ্বারিকানাথ বিশ্বাস প্রমুখ।

। পাঁচ ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে স্থাপিত হয় এইচ. বোস অ্যান্ড কোম্পানির পারফিউমারি ওয়ার্কস। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠা করেন বেঙ্গল কেমিকেল অ্যান্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক বিরাট প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসাবে আবির্ভূত হন রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ভারতে মার্টিন কোম্পানির রেলপথসমূহ স্থাপনের কৃতিত্ব তাঁরই। পরে তিনি বার্ন কোম্পানিরও অংশীদার হন। মার্টিন-বার্ন একত্রিত হবার পর ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি নামে বিখ্যাত লোহ ও ইস্পাত নির্মাণ কোম্পানির পরিচালনার ভার তার পুত্র স্যর বীরেন মুখার্জীর ওপর পড়ে। সরকারী রোষে পড়ায় তাঁর বড় বড় কোম্পানিসমূহ ভারত সরকার কর্তৃক অধিকৃত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে আরও স্থাপিত হয়েছিল বাঙালী কর্তৃক হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স, বঙ্গলক্ষ্মী মিল, মোহিনী মিল, ঢাকেশ্বরী মিল, ক্যালকাটা কেমিকেল, বেঙ্গল ইমিউনিটি, বাসন্তী মিল, সুলেখা কালি প্রভৃতি।

বিংশ শতাব্দীর আর কয়েকজন বাঙালী ব্যবসায়ীর কথা বলে এ-প্রসঙ্গ শেষ করব। ৩০ বৎসর পূর্বে করুণাকুমার কর স্থাপন করেন কে. কে. কর অ্যান্ড কোম্পানি। এঁরা প্রায় ৮০টি কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্ট ছিলেন। এখন এঁদের কোম্পানিগুলো সবই উঠে গেছে, একমাত্র কেবল নাগা হিল টি কোম্পানি জীবিত, তবে অবাঙালীর হাতে। সমসাময়িক কালে এন. সি. সরকার অ্যান্ড কোম্পানি বহু কয়লাখনি কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্ট ছিল। সেগুলোও সব উঠে গেছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে গিয়ে বাঙালী জনসমাজের সর্বনাশ করে। পরে স্থাপিত হয় বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশন ও হুগলী ব্যাঙ্ক। এগুলি একত্রিত হয়ে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অভ্ ইন্ডিয়া নাম ধারণ ক'রে এখন এদেশে সরকার-পরিচালিত অন্যতম বড় ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করছে। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালে ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে গিয়ে আবার বাঙালী সমাজকে বিপর্যস্ত করে।

মধ্যে সামান্য অবস্থা থেকে উঠে আলামোহন দাশও এক বিরাট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু আজ আর তাঁর সে বিরাটত্ব নেই।

শেষ যে বাঙালী ব্যবসায়ীরা যৌথ মূলধনী কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে

অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল, সে হচ্ছে কে. এন. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি। কিন্তু আজ তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ শ্রমিকবিরোধে বিপর্যস্ত।

সকলের শেষে আরও একটি বাঙালী-প্রতিষ্ঠানের কথা বলব। সে হচ্ছে সেন র‍্যালে অ্যান্ড কোম্পানি। এঁরা সাইকেল নির্মাণ করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

তবে আজ বাঙালী ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও, অবাঙালী রুই-কাৎলার মধ্যে সে চুনোপুঁটি হিসাবেই তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

বাঙালী-জীবনে জুয়ার ঢেউ

প্রথম মহাযুদ্ধের দু-তিন বছর আগের কথা। তখন আমাদের বাড়ি ছিল শ্যামবাজার স্ট্রীটের উপর, পাঁচমাথার অতি সন্নিকটে। আমাদের বাড়ির বিপরীত দিকের ফুটপাথের সামনে কতকগুলি খোলার চালবিশিষ্ট দোকানঘর ছিল। দোকানঘরগুলির পর একটা সরু গলি। ওই গলির ভিতর ছিল একটা তুলোর দোকান। দোকানের নিশানাস্বরূপ গলির মুখে বড় রাস্তার উপর তুলোওয়ালা ঝুলিয়ে রাখত একটা তুলো-ভরা ঝুড়ি। আমরা ওই গলিটাকে তুলোর গলি বলতাম। আর ওই খোলার চালের ঘরগুলির মধ্যে একখানা ঘরে ছিল এক ভদ্রলোকের দোকান। নানা জায়গার নিলাম থেকে তিনি নানা রকমের জিনিস কিনে এনে, গাদা করতেন ওই দোকানঘরটিতে। আমি তখন ছেলেমানুষ। ছোট ছেলের কৌতূহলী মন নিয়ে ওই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতাম তাঁর নানারকমের বিচিত্র পণ্যসম্ভার।

একদিন দেখি, তাঁর দোকানের সামনে ঝুলছে একখানা সাইনবোর্ড—মাপে এক হাত চওড়া ও দু হাত খাড়াই। বোর্ডটির মাথায় লেখা 'আমেরিকান কটন ফিগার'। আর তার নিচে দশটা লাইন, প্রত্যেক লাইনের গোড়ায় লেখা আছে যথাক্রমে ওয়ান, টু, থ্রি ইত্যাদি—এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা।

যেদিন ওই সাইনবোর্ডটা প্রথম দেখলুম, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম সেটার দিকে। জিনিসটা কী, তা বুঝবার চেষ্টা করলুম। ওটার মাথায় লেখা 'আমেরিকান কটন ফিগার' শব্দ ক'টার অর্থ করতে লাগলুম। ভূগোলের বইয়ে পড়েছিলুম যে, আটলানটিক মহাসাগরের অপর পারে আমেরিকা নামে একটা দেশ আছে। সুতরাং অর্থ করলুম 'আমেরিকান' মানে আমেরিকা দেশ সংক্রান্ত কোন ব্যাপার। ওয়ার্ডবুকে পড়েছিলুম 'কটন' মানে তুলো, আর 'ফিগার' মানে সংখ্যা। 'ফিগার' সম্বন্ধে কোন গোলমালই হল না, কেননা চোখের সামনেই বোর্ডের উপর তো দেখলুম এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা। এখন সমস্যা হল, এটা আমেরিকা দেশের তুলোর কী সংখ্যা? প্রথম ভাবলুম, বোধ হয় এটা তুলোর দামের সংখ্যা। মনে মনে ভাবলুম, তবে কি ইনি ওই পাশের গলির দেশী তুলো-ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিদেশী তুলোর প্রতি-যোগিতামূলক ব্যবসা শুরু করলেন? লোকটার প্রতি বেশ রুষ্ট হলুম, ও

ওই তুলোর গলির তুলোওয়ালার উপর সহানুভূতি হল। তারপর দোকানের ভিতরটায় ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম। না, কোন জায়গায় তো তুলোর নামগন্ধ নেই। তখন ভাবলুম বোধ হয় ভদ্রলোক কোন নিলাম থেকে বোর্ড-খানা কিনে এনেছেন ও দোকানের সামনে টাঙিয়ে দিয়েছেন। এই কথা ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাড়ি ফিরে গেলুম।

কিন্তু এই স্বস্তি মাত্র এক রাত্তির স্থায়ী হল। পরের দিন দেখি যে, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপর মল্লিকদের পাকা ঘরে যে সকল স্টীল ট্রাঙ্কের দোকান ছিল, সে গুলির প্রত্যেক দোকানের সামনে ঝুলছে অনুরূপ সাইন বোর্ড। তখন আবার ভাবলুম, না, এরা সকলে জোট বেঁধে তুলোর ব্যবসাই শুরু করছে। তুলোর গলির তুলোওয়ালা বেচারীর কী হাল হবে, ভেবে মনে মনে খুব কষ্ট পেলুম।

আমার বাবা ছিলেন চিকিৎসক। তাঁর ডাক্তারখানা ছিল ঠিক শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর বিপরীত দিকে ফুটপাথের ওপর সামনের ঘরে। বাবার ডাক্তার-খানায় যাবার পথে রোজই ওই দোকানঘরগুলির ভিতর উঁকি মেরে দেখতুম, ওদের তুলো এল কিনা। তুলোর কোন হদিশ না পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলুম, যাক, যে কদিন ওদের তুলো না আসে, সে কদিন বেচারী তুলোওয়ালা বেঁচে যাবে।

এরপর যখন আরও দোকানঘরের সামনে 'আমেরিকান কটন ফিগার'-এর সাইন বোর্ড ঝুলতে দেখলুম তখন কৌতূহলী হয়ে একদিন আমার বড়দাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'বড়দা, দেখেছ বেচারী তুলোওয়ালাকে মারবার জন্য কত তুলোর দোকান হয়েছে। কিন্তু ওদের দোকানে তুলো নেই কেন?' আমার কথা শুনে বড়দা তো হেসেই খুন। বললেন, 'আরে পাগল, ওগুলো তুলোর দোকান নয়! ওগুলো 'তুলোর খেলা' নামে একরকম জুয়ার দোকান।' বড়দাকে জিজ্ঞাসা করতে বড়দা আমাকে জুয়াটা বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, 'দেখেছিস তো, ওই বোর্ডগুলিতে এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা আছে। আজ যদি কেউ কোন সংখ্যায় এক আনা পয়সা লাগায় আর সামনে কাল যদি সেই সংখ্যা ওঠে, তা হলে সে কাল আট আনা পয়সা পাবে। পয়সা লাগা-বার সময় ওরা একটা রসিদ দেয়, আর কাল ওই রসিদটা দেখালেই ওরা আট আনা পয়সা দিয়ে দেয়।' বড়দাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আচ্ছা, প্রত্যেক দোকানে কি আলাদা আলাদা নম্বর ওঠে?' বড়দা বললেন, 'না; সব দোকানে একই

নম্বর ওঠে। নম্বরটা ঠিক করে দেয় বড়বাজারের মারবাড়ী জুয়াড়ীরা। সেখানেই তুলোর খেলার স্নায়ুকেন্দ্র। সকল দোকানকেই সেই নম্বর মানতে হয়। কেননা, এরা সকলেই হচ্ছে তাদের 'বুকী'। 'বুকী' শব্দটার অর্থ কী, তাও বড়দা বুঝিয়ে দিলেন।

তখনকার দিনের স্কুল-কলেজের ছেলেদের একটা অভ্যাস ছিল। বিকাল বেলায় তারা হয় হেদুয়ায়, আর তা নয়তো গোলদীঘিতে বেড়াতে যেত। আমার বড়দাও যেতেন। একদিন বড়দার সংগে আমিও বেড়াতে গেলুম। দেখি, শ্যামবাজারের মোড় থেকে শুরু করে কলেজ স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত রাস্তার দুধারে অসংখ্য দোকানের সামনে ঝুলছে সেই একই সাইন বোড'—'আমেরিকান কটন ফিগার'।

॥ দুই ॥

এক কথায় রাতারাতি কলকাতা শহরে গজিয়ে উঠল হাজার হাজার তুলোর খেলার দোকান। খেলাটা শহরের লোককে এমনভাবে আকৃষ্ট করল যে সারা শহরে জুয়ার বন্যা বয়ে গেল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বাড়ির কর্তা খেলেন, গিন্নী খেলেন। বৌ খেলে, মেয়ে খেলে। ছেলে খেলে, জামাই খেলে। রাঁধুনী বামুন খেলে, ঝি-চাকব খেলে। মুটে খেলে, মজুর খেলে। দোকানদার খেলে, ব্যবসাপতি খেলে। এককথায় শহরের সকল শ্রেণী, সম্প্রদায় ও স্তরের লোকই তুলোর খেলায় মত্ত হয়ে উঠল। এমন কী স্কুলের ছেলেরাও মারবেল-গুলি নিয়ে ওই খেলা খেলতে শুরু করে দিল।

তুলোর খেলায় যে নম্বরটা উঠত, সেটা আমেরিকার নিউ অরলীন্স শহরের তুলোর ফাটকা-বাজারের দরের ভিত্তিতে নির্ধারিত হত। তুলোর খেলার যে বোর্ডগুলি দোকানের সামনে টাঙানো থাকত, তাতে এক থেকে দশ নম্বর ছাড়া আরও দু-তিনটি বহু-অঙ্ক-বিশিষ্ট সংখ্যা থাকত। সকলেরই ধান্ধা ছিল ওই সংখ্যাগুলি থেকে পরদিনের নম্বর আবিষ্কার করা।

আমার বাবার ডাক্তারখানায় বিকাল বেলায় তিন বৃদ্ধ মিলিত হতেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম জন ছিলেন গোপালচন্দ্র দাস মশায়। তিনি বাংলা ভাষার অভিধান সংকলক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মশায়ের জ্যাঠামশায়। জ্ঞানেন্দ্রবাবু প্রায়ই তাঁর জ্যাঠা মহাশয়ের সংগে দেখা করতে আসতেন। সেজন্য জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে আমি ছেলেবেলা থেকেই জানতুম। বোধ হয় গোপালবাবুই শহরের একমাত্র

লোক যিনি তুলোর খেলা খেলতেন না। অপর দুজন ছিলেন সিংগী মশায় ও মিত্তির মশায়। জ্যোতিষী হিসাবে সিংগী মশায়ের বেশ নামডাক ছিল। তিনি একবার আমার হাত দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, লেখা-পড়া আমার মোটেই হবে না, আমি ভবিষ্যতে ছুতোরের কাজে বিশেষ দক্ষ হব। সিংগী মশায় জ্যোতিষের সাহায্যে নম্বর বের করে তুলোর খেলা খেলতেন। মাঝে মাঝে তিনি সফল হতেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই অকৃতকার্য হতেন।

মিত্তির মশায় আগে অ্যাকাউনটেন্ট-জেনারেলের অফিসে চাকরি করতেন। তুলোর খেলার সময় তিনি অবসরপ্রাপ্ত বেকার। তিনি সারাদিন ধরে ওই বহু-সংখ্যাবিশিষ্ট রাশিগুলি নিয়ে অঙ্ক কষতেন, আর পরের দিনের সংখ্যা বের করবার চেষ্টা করতেন। একদিন বিকাল বেলায় মিত্তির মশায় বেশ উৎফুল্ল হয়ে এসে বাবাকে বললেন, 'ডাক্তার, কেল্লাফতে, শালা অমুকের বাচ্চারা আর কতদিন আমাদের ঠকাবে। অঙ্ক কষে নম্বরের সূত্র বের করে ফেলেছি। কালকের নম্বর হচ্ছে ছয়।" আমার বাবা, সিংগী মশায় ও মিত্তির মশায়—এই তিন জনেই সেদিন ৬ নম্বরে এক টাকা করে লাগিয়ে দিলেন। সে-রাতটা আমার ঘুম হল না, পরদিনের জন্য খুব উৎসুক হয়ে রইলুম। পরদিন দেখি'—'ভোঁ কাট্টা।' উঠল ৯ নম্বর। ছয় নম্বরের বদলে নয় নম্বর ওঠায় তিন জনের টাকাই নয়-ছয় হয়ে গেল।

এই রকমভাবে সমস্ত শহরের লোকই সেদিন, কালকের নম্বর কী আসবে, তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা, অঙ্ক কষাকষি ও জ্যোতিষের শ্রাদ্ধ করতে লাগল। কিন্তু কেউ কারুকে বলতে চাইত না, সে সেদিন কোন্ নম্বরে বাজি লাগিয়েছে, পাছে আর কেউ সেটা জানতে পেরে লাভবান হয়। যার নম্বর উঠত, সে সেদিন বুক ফুলিয়ে হাঁটত। আর যার উঠত না, সে আবার বেপরোয়া হয়ে 'যুদ্ধং দেহি' বলে পরের দিনের জন্য প্রস্তুত হত।

॥ তিন ॥

সেদিন আমাদের বাড়ির সংলগ্ন মল্লিকদের বাড়ির ঝি একথালা সন্দেশ এনে মার সামনে রাখল। বলল, 'মা পাঠিয়ে দিলেন।' তখনকার দিনে কোন সুসংবাদ থাকলে প্রতিবেশীরা পরস্পরের বাড়ি সন্দেশ পাঠিয়ে সংবাদটা দিতেন। (শব্দতাত্ত্বিকদের এটা গবেষণার বিষয় যে 'সন্দেশ' শব্দের অর্থ 'সংবাদ', এই প্রথা থেকে উদ্ভূত হয়েছে কি না)। মা মল্লিক বাড়ির ঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'কী সংবাদ গো ?' ঝি উত্তরে বলল, 'মা আজ বাজিমাৎ করেছেন কি না, তাই এই সন্দেশ পাঠিয়ে দিলেন।' মল্লিক বাড়ির ছাদের পাঁচিলের ধারে দাঁড়ালেই আমাদের বাড়ির লোকেদের সংগে কথাবার্তা বলা যেত। কিছু পরেই পাঁচিলের ধারে মল্লিক-গিন্নীর আবির্ভাব। উচ্চকণ্ঠে তিনি ডাকছেন, 'ও দিদি, ও দিদি, একটা সুসংবাদ শোন। পরশু রাত্তিরে স্বপ্নে দেখি যে মা চণ্ডী স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে বলছেন, 'কাল তুই পাঁচ নম্বরে পাঁচ টাকা লাগা।' তাই কাল পাঁচ নম্বরে পাঁচ টাকা লাগিয়েছিলুম। আজ চল্লিশ টাকা পেয়েছি।' তারপর এক গাল হেসে বললেন, 'বুঝেছ, কর্তার এক মাসের মাইনের চেয়েও বেশি।' মা ক্লিষ্ট মনে কথাটা শুনলেন, কেন না মায়ের নম্বর ওঠেনি। মা মল্লিক বাড়ির ঝিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যারে, তুই তো গিন্নীমার নম্বর দোকানে লাগিয়ে আসিস, তা তুই পাঁচ নম্বরে কিছু লাগাস নি ?' মল্লিক বাড়ির ঝি বলল, 'তা আর কী করে লাগাই বল মা, গিন্নী যে ছেলের দিব্যি দিয়ে দেয়। একটা ছেলে নিয়ে ঘর করি, কী করে ওই দিব্যি অমান্যি করি বল।' বস্তুত, এই সময় মানুষের মনে স্বার্থপরতা খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। কেউ চাইত না যে, তার নম্বরের সাহায্যে অপরে লাভবান হয়। সকলের একই চিন্তা। কালকের নম্বর কী ভাবে আবিষ্কার করা যাবে। মল্লিক-গিন্নীর সাফল্যের কথা শুনে, আমাদের পাড়ার অনেকেই কালীঘাটে গিয়ে মানত করল, 'মা, আমাকে কিছু টাকা পাইয়ে দাও, আমি টাকায় এক আনা হারে তোমার পুজো দিয়ে যাব।' অনেকে আবার অন্যান্য কালীতলায় গিয়ে গণনা করাতে লাগল।

॥ চার ॥

এইভাবে সারা শহরে প্রবাহিত হল জুয়ার বন্যা। লোক এক আনা লাগিয়ে আট আনা পেলে, আগেকার নষ্টধন উদ্ধারের জন্য, আট আনাই লাগিয়ে দিত পরের দিনের জন্য অন্য নম্বরে। সকলেরই এক আকাঙ্ক্ষা, অপরকে টেক্কা দেওয়া। এই টেক্কা দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা এমন তীব্রভাবে লোককে আক্রান্ত করল যে, লোকে দশ আনা পয়সা খরচ করে দুখানা রসিদ কাটাতে লাগল—একখানা জোড় সংখ্যার আর একখানা বিজোড় সংখ্যার। নম্বর-এর আর পালাবার উপায় নেই। জোড় নম্বর উঠলে, লোক মাত্র জোড় নম্বরের রসিদখানা অপরকে দেখিয়ে গর্ববোধ করত। আর যদি বিজোড় নম্বর উঠত, তাহলে বিজোড় সংখ্যার রসিদখানাই দেখাত। আশ্চর্য হয়ে গিয়ে লোক পরস্পর বলাবলি করত, 'দেখ,

অমুকের বরাত কী, রোজই বাজিমাৎ করছে।' প্রথম যারা এটা করত, তারা এটাকে গোপন রাখত। কিন্তু যখন রহস্যটা ফাঁস হয়ে গেল, তখন সকলেই ওই একই পন্থা অবলম্বন করল। ফলে, দশ আনা লাগিয়ে, লোকে আট আনা পেতে লাগল। আজকের দিনের লোক বুঝতে পারবে না যে, সেদিনে এই দু আনা ক্ষতির পরিমাণ কত বড়। কেন না, তখনকার দিনে যে-কোন মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনিক বাজার খরচ হত মোট চার আনা। সেদিনকার দিনে বাজারে পারশে, ট্যাংরা, বাগদা চিংড়ি, ভেটকি প্রভৃতি মাছের দর ছিল তিন আনা থেকে চার আনা সের, আর কাটা বড় রুই মাছের দর ছিল ছয় আনা সের। তিনটা বড় বড় বেগুন পাওয়া যেত এক পয়সায়, আলুর সের ছিল দু পয়সা থেকে চার পয়সা, আধ পয়সায় এক আঁটি নটে কিংবা কলমী শাক পাওয়া যেত, যার ওজন হবে আধ সেরের কাছাকাছি। মাংস ছয় আনা সের ছিল, আর হাঁসের ডিমের দাম ছিল এক পয়সায় একটা।

সুতরাং শেষের দিকে যখন পরস্পরকে টেক্কা দেওয়ার জেদ মানুষকে গ্রাস করল, তখন বহুলোক ও পরিবার তুলোর খেলার প্রকোপে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। সংবাদপত্রে এই নিয়ে আন্দোলন হতে লাগল। খেলার সূচনা থেকে প্রায় আট দশ মাস উত্তীর্ণ হবার পর, সরকার খেলাটা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু যারা সর্বস্বান্ত হল, তাদের প্রায় সবাই বাঙালী, আর যাদের সিন্দুকে বাঙালীর পয়সাটা গিয়ে পৌঁছাল তারা মারবাড়ি।

॥ পাঁচ ॥

খেলাটা উঠে যাবার পর আবার রাতারাতি পটপরিবর্তন হল। কেউ তুলোর খেলার দোকানকে রূপান্তরিত করল খাবারের দোকানে, কেউ ডাইং ক্লিনিং-এর দোকানে, কেউ ছাতার দোকানে, কেউ ঘড়ির দোকানে, কেউ স্টীল ট্রাঙ্কের দোকানে, কেউ বা আবার চপ-কাটলেটের দোকানে।

শহরের বুকের উপর প্রকাশ্যভাবে দিনের আলোয় এরূপ ব্যাপক জুয়ার স্রোত পূর্বে বা পরে আর কখনও হয়নি।

শেয়ার-বাজারে বাঙালী

১৯৩৬ সালের অকটোবর মাস। সবেমাত্র স্টক একসচেঞ্জের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত হয়েছি। পথে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধু বললেন, 'কী, শেষকালে ভবের তরী এমন এক ঘাটে ভেড়ালেন, যেখানে ধনস্থানে শনি-লাভ ঘটে।' বন্ধু যে সত্যের অপলাপ করেছিলেন, তা নয়। তবে, শেয়ার-বাজারের সংস্পর্শে এলে, লোকে যেমন শনির কোপে পড়ে, তেমনই আবার একাদশ বৃহস্পতির যোগও ঘটে। শেয়ার-বাজারে লোকে যেমন সর্বস্বান্ত হয়, তেমনই আবার রাতারাতি বড়লোকও হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক বাঙালীই শেয়ার-বাজার থেকে পয়সা কামিয়েছেন। তাদের মধ্যে দুজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হচ্ছেন রাজা রামমোহন রায় ও রানী রাসমণি।

তার মানে, শেয়ার-বাজার হচ্ছে শাঁখের করাত। অদৃষ্টের চাকা এখানে দুদিকেই ঘোরে। শেয়ার-বাজারে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা আমার চোখের সামনেই ঘটল। আমি ১৯৩৬ সালের অকটোবর মাসে যেদিন স্টক একস-চেঞ্জের চাকরিতে ঢুকলাম, সেদিন ইনডিয়ান আয়রন শেয়ারের দাম ছিল ছ টাকা বার আনা। তখন ইনডিয়ান আয়রনের প্রতি লোকের দারুণ আকর্ষণ। সকলেই ইনডিয়ান আয়রন কিনছে। দামও ধীরে ধীরে উঠছে। বড়দিনের ছুটির আগে দাম উঠে দাঁড়াল আঠার টাকা আট আনায়। তার মানে, তিন মাসে দাম বার টাকা এগিয়ে গেল।

কিন্তু পরের তিন মাসে যা ঘটল তা অভূতপূর্ব। প্রত্যহই ইনডিয়ান আয়রন-এর দাম লাফাতে লাগল। দুনিয়ার সকলের কাছেই সেদিন ইনডিয়ান আয়রন স্বর্ণতরু বলে মনে হয়েছিল—যা মাত্র নাড়া দিলেই টাকা ঝরে পড়বে। সেদিন দেখেছি, পথচারী অন্য কাজে ব্যবসা-পাড়ায় এসে যাবার পথে দু-চারশ আয়রন কিনছে, আর ফেরবার পথে পাঁচ-সাতশ টাকা মুনাফা নিয়ে ঘরে যাচ্ছে। পানওয়ালা, বিড়িওয়ালা, ফেরিওয়ালা, কেউ সেদিন বাদ যায়নি। সকলেই ইনডিয়ান আয়রন কিনে রোজ দু-চারশ টাকা কামিয়েছে।

১৯৩৭ সালের প্রথম তিন মাস এইভাবেই কাটল। সকলের কাছেই সেদিন ইনডিয়ান আয়রন পরশমণি। তারপর এপ্রিল মাসের চার তারিখের কথা। বেলা সাড়ে বারোটার সময় আমার ঘরে একজন দালাল ঢুকলেন, কী একটা

পরামর্শের জন্য। জিজ্ঞেস করলাম, 'জী, আয়রনকা ভাও ক্যায়া ?' বললেন, ৭৯ টাকা ১২ আনা। সংগে সংগে বিশেষ উৎসাহ ও উত্তেজনার সংগে বললেন, 'দেখিয়ে না, পনর দিনকা বীচমে আয়রনকা ভাও সো রূপিয়াসে জিয়াদা হো যায়েগা।' এই কথা উনি বলবার পরমূহূর্তেই শুনতে পেলাম, বাজার থেকে উত্থিত হল এক আর্তনাদ। শব্দ শুনেই দালালটি বাজারের দিকে ছুটলেন। আমি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কী ?' উত্তর এল, 'নেপালের এক রানা ৮০,০০০ আয়রন বেচেছেন, আয়রনের দাম পড়ছে।' পড়তে পড়তে কয়েক লহমার মধ্যেই আয়রন-এর দাম নেমে এল ৬০ টাকায়। যারা আয়রন কিনেছিল, তাদের প্রত্যেকেরই শেয়ার প্রতি বিশ টাকা করে লোকসান হল। সেদিনের কেনাবেচার ফলে, মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াল আঠার কোটি টাকা। অনেকেই সর্বস্বান্ত হল। সাধারণ লোক পালিয়ে গেল। সমস্ত লোকসানের বোঝাটা বাজারের দালালদের ঘাড়ে চাপল। কর্তৃপক্ষ লেনদেনের হিসাব চুকাবার জন্য বাজার দুদিনের জন্য বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু এই দুদিনের মধ্যেই বাজারের দালালরা ওই আঠার কোটি টাকার ঘাটতি এমন সুষ্ঠুভাবে মেটালেন যে, 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা এক প্রবন্ধ লিখে স্টক একসচেঞ্জকে অভিনন্দন জানালেন।

॥ দুই ॥

শেয়ার-বাজার চিড়িয়াখানা নয়, কিন্তু চিড়িয়াখানার অনেক জন্তুজানোয়ারের নাম শেয়ার-বাজারের দালালরা বহন করে। যেমন 'বুল' বা ষাঁড়, 'বেয়ার' বা ভল্লুক। এরা হচ্ছে যথাক্রমে 'তেজীওয়ালা' ও 'মন্দীওয়ালা'। একই ঘটনা বা সংবাদকে অবলম্বন করে, কেউ 'তেজী' ধ্যান করে, আবার কেউ 'মন্দী' ধ্যান করে। এরই ফলে হয় তেজী-মন্দীর লড়াই। তেজীওয়ালাদের সংগে মন্দী-ওয়ালাদের লড়াই অনেক সময় সত্যিকারের ষাঁড়ের লড়াইকেও ম্লান করে দেয়। কলকাতার শেয়ার-বাজারে সবচেয়ে বড় তেজী-মন্দীর লড়াই ঘটেছিল, আজ থেকে ৬০ বছর আগে—দুই ভাইয়ের মধ্যে। এ'রা হচ্ছেন কলকাতার মারবাড়ী সমাজের বিখ্যাত 'নাথানী'-পরিবারের বলদেওদাস ও রামেশ্বরলাল। সেদিন বাজারে দাঁড়িয়ে এক ভাই ক্রমাগত হাওড়া জুট মিলের শেয়ার বেচে গেলেন, আর আরেক ভাই তা কিনে গেলেন। দিনের শেষে দেখা গেল এক ভাইয়ের কাছে অপর ভাইয়ের লোকসান দাঁড়িয়েছে ৯৪ লক্ষ টাকা। এক ভাই যখন অপর

ভাইকে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ওপর ৯৪ লক্ষ টাকার চেক দিল, তখন ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের তো চক্ষু ছানাবড়া। তিনি টেলিফোন করে জেনে নিলেন চেকখানা ঠিক কিনা।

নাথানীরা 'দুধওয়ালা' নামে পরিচিত। এঁরা শেয়ার বাজার থেকে অনেক পয়সা কামিয়েছিলেন। টাকার সদ্ব্যয়ও করে গেছেন। ভারতের নানা স্থানে যে 'দুধওয়ালার ধরমশালা' আছে, সেগুলি তাঁদেরই অবদান। কিন্তু উত্তর-কালে লক্ষ্মী তাঁদের চঞ্চলা হলেন। ধনাঢ্যতা তাঁদের ম্লান হয়ে গেল।

শেয়ার-বাজারে এককালের অনেক আমীরই, পরবর্তী কালে ফকির হয়েছেন। এ রকম একজন দালাল, আমার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। নাম ভাদরমল ঝুনঝুনওয়ালা। ভাদরমলের পিতামহ ছিলেন সিউদতরায়, আর পিতা প্রেমসুক। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলকাতার মারবাড়ী সমাজে এঁদের স্থান ছিল সবার শীর্ষে।

এঁদের প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধি একটা ঘটনা থেকে বোঝা যাবে। ১৯০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর বেলা তিনটের সময় ভাদরমলের বাবা ঘোড়ার গাড়ি (তখনও কলকাতায় মোটরগাড়ি আমদানি হয়নি) করে নিজ আপিস থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। মাত্র দু-একদিন হল হ্যারিসন রোডে ট্রামের প্রবর্তন হয়েছে। প্রেমসুকবাবুর গাড়ি ক্লাইভ স্ট্রীট অতিক্রম করে, যেমনি হ্যারিসন রোডে এসে পড়েছে, হঠাৎ ট্রামের টুং টুং শব্দ শুনে ঘোড়াটা গেল বিগড়ে। ট্রামের সঙ্গে লাগল সংঘর্ষ। ঘোড়া জোতবার ব্যোমটা গাড়ির দরজার ভিতরে গিয়ে আঘাত হানল প্রেমসুকবাবুর বুকে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমসুকবাবুর মৃত্যু হল। কলকাতার মারবাড়ী সমাজ শোকবিক্ষুব্ধ চিত্তে ছুটে এল ঘটনাস্থলে। নিষ্ঠাবান মারবাড়ী প্রধানরা বিধান দিলেন, প্রেমসুকবাবুর ময়না-তদন্ত হতে পারে না, বা মড়া বাসিও থাকতে পারে না। অবিলম্বেই সংকার করা দরকার। সেদিন ঘোড়দৌড়ের মাঠে 'ভাইসরয় কাপ' বাজী খেলার দিন। বড়লাট লর্ড কার্জন স্বয়ং ঘোড়দৌড়ের মাঠে। সকলে ছুটল ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে, সরাসরি লর্ড কার্জনের কাছে দরবার করবার জন্য। লর্ড কার্জন আদেশ দিলেন, 'অবিলম্বে নিমতলার ঘাটে করোনারস্ কোর্ট বসুক ও প্রেমসুকের লাশ খালাস করে দিক।' নিমতলার ঘাটে 'করোনারস্ কোর্ট' বসা, কলকাতার ইতিহাসে সেই প্রথম ও শেষ। এ থেকেই ভাদরমলদের প্রতিপত্তির আভাস পাওয়া যাবে।

। তিন

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন শেয়ার-বাজারে মহাধুম পড়ে গিয়েছিল, তখন শেয়ার-বাজার থেকে অনেকেই মোটা টাকা কামিয়েছিলেন। আজ সেনট্রাল অ্যাভেনিউর দু'ধারে যে সব প্রাসাদসম সৌধ শহরের শোভাবর্ধন করছে, তার প্রায় সবই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শেয়ার-বাজার থেকে অর্জিত অর্থে তৈরি।

সে সময় ভাদরমলও অনেক পয়সা কামিয়েছিলেন। কিন্তু ভাদরমলের ঘাড়ে চেপেছিল কতকগুলি বদ্ নেশা। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া কেনা। এক সময় ঘোড়দৌড়ের মাঠে ভাদরমলের সতেরোটা ঘোড়া দৌড়াত। মেয়েছেলের সখও তাঁর বিলক্ষণ ছিল। দেশীয় রাজপরিবারের এক রাজ-কুমারীকে ভাদরমল রক্ষিতা হিসাবে রেখেছিলেন বলে শুনেছি। এ সব বৈভব শেয়ার-বাজার থেকে অর্জিত অর্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সামনে বিশ-পনেরো বছরের মধ্যে ভাদরমল একেবারে কাহিল হয়ে গেল। বাজারে যা কিছু কেনা-বেচা করে, সবেতেই তার লোকসান। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চোট আর ভাদরমল সামলাতে পারল না। একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। এককালের বাদশাহ ভাদরমল আশ্রয় নিল দর্মাহাটা স্ট্রীটে প্রকাশ্য রাজপথের সামনে এক বাড়ির রোয়াকে। ওই রোয়াকের ওপরেই ভাদরমল একদিন তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

সমসাময়িককালে ভাদরমলের ঠিক বিপরীতটা ঘটেছে বাংগুর পরিবারের ইতিহাসে। শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক সুদর্শন তরুণ রিক্তহস্তে পাড়ি মেরে-ছিল সুদূর রাজস্থান থেকে কলকাতা শহরে—ভাগ্যান্বেষণে। সংগে ছিল একটা লোটা ও একখানা কম্বল। আর ছিল তার অসাধারণ আত্মবিশ্বাস ও বৃহস্পতির আশীর্বাদ। থাকবার আশ্রয় না পেয়ে নিমতলার ঘাটের সিঁড়ির ওপরেই দু'তিন রাত কাটালেন। নিমতলাঘাটে তখন প্রত্যহ সকালে স্নান করতে আসতেন, তখনকার দিনের কলকাতার শেয়ার-বাজারের বড় দালাল শ্রীনারায়ণ সোনী। ছেলেটি তাঁর নজরে পড়ল। জিজ্ঞাসাবাদে জানলেন, ছেলেটি তাঁদেরই মাহেশ্বরী সম্প্রদায়ভুক্ত। ছেলেটিকে বাড়ি নিয়ে গেলেন এবং নিজের মেয়ের সংগে বিয়ে দিলেন। যৌতুকস্বরূপ দিলেন বেংগল কোল কোম্পানির ৫০০ শেয়ার। এই ৫০০ শেয়ারই ছেলেটির অদৃষ্ট ফিরিয়ে দিল। এই শেয়ারগুলির সংগে বাঁধা ছিল লক্ষ্মীর অঞ্চল। ধুলোমুঠি ধরে,

তো কড়িমঠিতে পরিণত হয়। মাগনীরাম, রামকুমার, গোবিন্দলাল, নরসিংদাস এঁরা পরবর্তিকালে বাজারের প্রথম পর্যায়ের দালালের স্থান অধিকার করলেন। শেয়ার বাজারে তাঁদের দালালী ব্যবসায় এখনও আছে। কিন্তু নরসিংদাসের আমলে বাংগুররা হয়েছেন ভারতের শিল্পসাম্রাজ্যের অন্যতম অধিপতি।

॥ চার ॥

শেয়ার বাজার থেকে যে শুধু মারবাড়ীরাই পয়সা করেছেন, তা নয়। অতীত-কালে অনেক বাঙালীও পয়সা করেছেন। তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে প্রসাদদাস বড়াল, তুলসীদাস রায়, শ্যামলাল লাহা, নন্দলাল রায়, গিরীন্দ্রমোহন পাইন, নবকৃষ্ণ দে, সুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

দীর্ঘ ৩৪ বছর শেয়ার বাজারে কাটিয়েছি। কিন্তু বুঝতে পারিনি কিসের জোরে, লোক সেখানে পয়সা উপার্জন করে—ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা, না মনের বল, না অদৃষ্টের সুপ্রসন্নতা? অনেক সময় টাকা হাতের মধ্যে এসেও পালিয়ে যায়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা তাই বলে। ১৯৪৫ সাল। এক-দিন বার্ড-হিলজারস কোম্পানির চীফ অ্যাকাউনট্যানট আমার ঘরে এসেছেন। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলেন, 'সুর, এতদিন শেয়ার-বাজারে রয়েছ, কিছু পয়সা কি কামিয়েছ?' বললাম, 'না, আমি কখনও শেয়ারের কেনাবেচা করি না।' সাহেব বললেন, 'রাতারাতি বড়লোক হতে চাও তো কিছু সাউথ করনপুরা কোল কোম্পানির শেয়ার কিনে ফেল। দাম শেয়ার প্রতি কমসে কম বিশ টাকা বাড়বে। যদি ৫,০০০ শেয়ার কেন, তাহলে লাখ টাকা কামাতে পারবে।' তখনকার দিনের লাখ টাকা আজকের দিনের কোটি টাকারও বেশি। লোভ সামলাতে পারলুম না। তার পরের দিনই ৩০ টাকা দরে ৫,০০০ সাউথ করনপুরা শেয়ার কিনে ফেললুম। কিন্তু আমি কেনবার পরই দাম পড়তে শুরু করল। ২৬ টাকায় এসে ঠেকল। তার মানে ৫,০০০ শেয়ারে ২৫,০০০ টাকা লোকসান। এর বেশি টাকা আমার ব্যাঙ্কে ছিল না। সুতরাং ২৬ টাকাতেই শেয়ারগুলো বেচে দিলাম। কিন্তু আমি বেচবার পরের দিন থেকেই সাউথ করনপুরার দাম উঠতে লাগল। কয়েক দিনের মধ্যে দাম গিয়ে পৌঁছাল ৫৬ টাকায়। মনে মনে আক্ষেপ করতে লাগলাম, 'আহা শেয়ারগুলো যদি একদিন আগে না বেচতাম, তাহলে আজ আমি লাখ টাকার মালিক হতাম।'

আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি, এ বিপর্যয় কেন ঘটেছিল—আমার মনের দুর্বলতা ? না সঙ্গতির সংকীর্ণতা ? না অদৃষ্টের অপ্রসন্নতা ?

॥ পাঁচ ॥

এবার বাজার সম্বন্ধে কিছু বলে এই নিবন্ধ শেষ করবো। কলকাতায় শেয়ারের কেনাবেচার সূচনা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে। পুরো একশ বছরের উপর দালালরা কেনাবেচা করতেন একটা খোলা মাঠের উপর এক নিমগাছের তলায়। ১৯০৪ সালে ওখানে যখন বাড়ি তৈরি হয়, তখন দালালরা আশ্রয় নিলেন প্রকাশ্য রাজপথে। দালালদের কোন সংগঠনও ছিল না, নিয়মকানুনও ছিল না। ফলে সওদার নিষ্পত্তি নিয়ে প্রায়ই তাঁদের মধ্যে বচসা হতো। এরূপ বচসা একদিন এক বিরাট দাঙ্গায় পরিণত হল, মারবাড়ী ও চোবেদের মধ্যে। এই ঘটনার পরেই সাহেব দালালরা সংগঠন তৈরি করে নিয়মকানুন প্রণয়ন করতে চাইলেন। ফলে, ১৯০৮ সালে বর্তমান 'ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অ্যাসোসিয়েশনের সমৃদ্ধি বাড়ল। তখন স্টক এক্সচেঞ্জের আস্তানা ছিল ২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসে। ১৯২৭ সালে স্টক এক্সচেঞ্জ নিজের বাড়ি তৈরি করবার জন্য ৭নং লায়নস রেঞ্জের জমিটা কিনল। জমিটা ছিল বিডন স্ট্রীটের ছাতুবাবু-লাটুবাবুদের। চারজন শরিক ছিলেন, তাঁদের অন্যতমা ছিলেন শ্রীমতী চন্দ্রপ্রভা দেবী। শীঘ্রই সেই জমিতে বর্তমান পাঁচ-তলা বাড়ি তৈরি করা হয়। বাংলার তদানীন্তন শাসনকর্তা স্যার স্টানলি জ্যাকসন ১৯২৮ সালের ২ জুলাই তারিখে নতুন ভবনের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। স্টক এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং-এর মত এত মজবুত বাড়ি ব্যবসা-পাড়ায় খুব কমই আছে। এর দোতলার দেওয়ালই হচ্ছে চওড়ায় পাঁচ ফুট। এর উপরতলায় হচ্ছে দালালদের আপিস ও নীচের তলায় হচ্ছে বাজারের কেনাবেচার স্থান ও স্টক এক্সচেঞ্জের নিজ আপিস। সমস্ত বাড়িটা লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের অনুকরণে তৈরি।

আগে শেয়ার বাজার স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু ১৯৫৭ সালের ১০ অক্টোবর তারিখের পর থেকে, শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত 'সিকিউরিটিজ কনট্রাকটস্ রেগুলেশন অ্যাক্ট' অনুযায়ী। এছাড়া আরও এক পরিবর্তন স্টক এক্সচেঞ্জের ইতিহাসে ঘটেছে। আমি যখন স্টক এক্সচেঞ্জে চাকরি নিয়েছিলাম, তখন বেশির ভাগ দালালই ইংরেজ ও বাঙালী। আজ তাঁদের স্থান অধিকার করছে মারবাড়ী, গুজরাতী ও উত্তরপ্রদেশের লোকেরা।

নববর্ষ কবে শুরু হত ?

কাল-এর অন্ত নেই। অথচ কাল-কে আমরা ভাগ করে নিয়েছি, আমাদের মনগড়া নানা অংশে। এরকম এক অংশের নাম হচ্ছে 'বর্ষ'। বারো মাস পূর্ণ হলেই আমরা শুরু করি আর এক নববর্ষ।

কাল-কে এভাবে আমরা ভাগ করি, আমাদের এক সহজাত প্রবৃত্তি থেকে—পুরাতনের প্রতি বিতৃষ্ণা ও নতুনের প্রতি মোহাসক্তি থেকে। আমরা ভুলে যেতে চাই পুরানো বছরের লজ্জা, কলঙ্ক ও গ্লানি। গড়ে তুলতে চাই নববর্ষে জীবনকে নতুন করে—নতুন আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ঈপ্সা নিয়ে। জীর্ণতার পরিবর্তে চাই সজীবতা। তাই নববর্ষকে আমরা জানাই আমাদের স্বাগত আবাহন।

স্বাধীনতার পর নববর্ষ পেয়েছে এক নতুন স্বীকৃতি। নববর্ষের প্রথম দিনটাকে চিহ্নিত করা হয়েছে উৎসব বা ছুটির দিন হিসাবে। শুধু তাই নয়। নববর্ষ পালনের ভঙ্গীটাও পালটে গেছে। আজ নববর্ষের উৎসব পালন করে মেয়েরা নানা রঙের ও নানা ডিজাইনের শাড়ি পরে, ছেলেরা কুচকাওয়াজ করে, নাচগান ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়ে। এসবেরই প্রচলন হয়েছে সাম্প্রতিককালে।

আগেকার দিনে নববর্ষ বলতে বোঝাত হালখাতার দিন। আজকালও দোকানদাররা হালখাতা করে বটে, কিন্তু আগেকার দিনের সে রেশ নেই। আমরা ছেলেবেলায় যে হালখাতা দেখেছি, তার দৃশ্য এখনও দেখতে পাওয়া যাবে পঞ্জিকার পৃষ্ঠার ছবিতে। বাস্তব জগতে তার আর কোন অস্তিত্ব নেই। তাছাড়া হালখাতার দিনে ময়রারা একরকম মিঠাই তৈরি করত, যার নাম ছিল 'হালখাতার মিঠাই'। সে মিঠাই তারা বছরে মাত্র একদিনই তৈরি করত। এখন আর সে মিঠাই তৈরি হয় না।

আজকের দিনে দোকানদাররা হয় কালীঘাটে, আর তা নয়তো দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরে তাঁদের নতুন খাতা পূজা করিয়ে নিয়ে আসে। আগেকার দিনে তা করত না। দোকানেই সকালবেলা গণেশ পূজা ও খাতা মহরত হত। খাতা মহরত মানে, নতুন খাতায় সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা ও দেবতার নাম লেখা। কোন কোন দোকানে হয়তো আজও গণেশ পূজা হয়, কিন্তু আগেকার সে জাঁকজমক নেই। বিকালে দোকানে নিমন্ত্রণ

করা হত খরিদ্দারদের। দোকানে সেদিন ফরাস পেতে আসর তৈরি করে নিমন্ত্রিতদের আদর-আপ্যায়ন করা হত। সকলের গায়ে গোলাপ জল ছড়ানো হত। আসরের মাঝখানে বসানো থাকত রূপার তৈরি হুকাদানের ওপর দু-তিনটে রূপো দিয়ে বাঁধানো হুকা, খরিদ্দারদের তামাক খাবার জন্য। সকলকেই দেওয়া হত মিঠাইয়ের চেঙারি, বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য।

নতুন খাতা নিয়ে আসরের একধারে বসত দোকানের এক কর্মচারী। খরিদ্দাররা দিত তাদের বাকি টাকা, হয় সম্পূর্ণ, আর তা নয়তো আংশিক। আর যাদের বাকির বালাই থাকত না, নতুন খাতায় তাদের নামে টাকা জমা করে নেওয়া হত। এভাবে বছরের প্রথম দিনেই দোকানদারের হাতে এসে পড়ত একটা মোটা অংকের মূলধন।

সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে কোন কোন জায়গায় পুরোহিত ঠাকুর এসে নতুন পঞ্জিকা পড়ে মেয়েদের বর্ষফল শোনাত। কিন্তু নববর্ষ উপলক্ষে কোন ব্যাপক অনুষ্ঠান ছিল না। সেজন্যই চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মশায় বলেছেন যে 'বাঙালী সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে পয়লা বৈশাখ নববর্ষের সূচনায় বিশেষ কোন শাস্ত্রীয় বা লৌকিক অনুষ্ঠানের প্রচলন নেই।' আমার সামনে রয়েছে দুশো বছরের হিন্দুপর্বের এক তালিকা। ও তালিকায় নববর্ষের কোন উল্লেখই নেই। এখন পঞ্জিকায় ওদিন মাত্র ধ্বজারোপণের বিধান লেখা আছে। কিন্তু বাঙলাদেশে ধ্বজারোপণের বিশেষ কোন লক্ষণ দেখি না। উত্তর ভারতেই নববর্ষে ধ্বজারোপণ দেখা যায়। তবে সেখানে বর্ষারম্ভ হয়ে চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদে।

বাঙলায় পয়লা বৈশাখে কোন লৌকিক বা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের অভাব দেখে মনে হয়, অতীতকালে বাঙলায় নববর্ষটা অন্য কোন সময় হত। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মশায় বলেছেন যে, 'প্রাচীনকালে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে নববর্ষ উৎসবের অনুষ্ঠান হত। দোলযাত্রা বা হোলি সেই উৎসবেরই স্মারক।'

তাহলে পয়লা বৈশাখ থেকে বাঙলায় নববর্ষের সূচনা কবে থেকে হল ? নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী মশায় বলেন যে, মুসলমান আমলে রাজকার্যে হিজরা অব্দ ব্যবহৃত হত। হিজরা অব্দ ৩৫৪ দিনে পূর্ণ হয়। এর ফলে নববর্ষের তারিখ বছরে বছরে পালটে যেত। রাজকার্যের এই অসুবিধা দেখে সম্রাট আকবরের সময় হিজরাকেই ৩৬৫ দিনে গণনা করে ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের হিজরা সংখ্যা ৯৩৬-র সঙ্গে তৎপরবর্তী সৌর বৎসর সংখ্যা যোগ করে বঙ্গাব্দের সৃষ্টি করা হয়। এটা একটা গোঁজামিল মাত্র। কেননা হিজরার জন্য যদি রাজকার্যের

অসুবিধা হত, তাহলে সেটা সাম্রাজ্যের সর্বত্রই হত। এ পরিবর্তন একমাত্র বাঙলাদেশের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল কেন?

মুসলমান আমলে উত্তর ভারতে ফসলী ও ওড়িশায় আমলী ও বিলায়তি অব্দ প্রচলিত ছিল। ফসলী বর্ষ শুরু হয় ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ থেকে আমলী ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী থেকে ও বিলায়তী আশ্বিন মাস থেকে।

বর্তমানে উত্তর ভারতে বিক্রম সংবত শুরু হয় চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ থেকে আর শকাব্দের চান্দ্র বর্ষ শুরু হয় চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ ও সৌরবর্ষ কৃষ্ণা প্রতিপদ থেকে। দক্ষিণ ভারতে বার্হস্পত্যবর্ষ প্রচলিত আছে। তা-ও শুরু হয় বৈশাখ কৃষ্ণা প্রতিপদ থেকে। কেরলে কোল্লাম বর্ষ প্রচলিত আছে। তা শুরু হয় ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা নবমী থেকে।

গুজরাটে নববর্ষ শুরু হয় দেওয়ালীর দিন থেকে। ওই দিন লোকের জুয়া খেলে নির্ণয় করে আগামী বছরে তাদের ভাগ্য। জানিনা, বাঙলা দেশে কোন সময় দেওয়ালীর দিন থেকে নববর্ষ শুরু হত কিনা। কেননা ওই দিন লক্ষ্মীপুজা ও অলক্ষ্মী বিদায় নববর্ষে সমৃদ্ধির আবাহন ও পুরানো বছরে দীনতার বিসর্জন বলে মনে হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন দিনে নববর্ষ শুরু হয়। আর পিছনে গেলে দেখা যাবে সত্যযুগে নববর্ষ শুরু হতো বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া (অক্ষয় তৃতীয়া) থেকে, ত্রেতাযুগে কার্তিকী শুক্লা নবমী থেকে, দ্বাপরে ভাদ্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী থেকে। শাস্ত্র অনুযায়ী কলিযুগে নববর্ষ শুরু হওয়া উচিত মাঘী পূর্ণিমা থেকে।